নবম দশম

১৬ জুলাই ১৯৮২

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : অনির্বাণ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুস্মিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শিলাদিত্য

নবপর্যায়ের 'শিলাদিত্য' মাসিকপত্রের দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হচ্ছে জুলাই সংখ্যা থেকে। এই সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন বিমল কর। তাঁর অভিজ্ঞ সম্পাদনায় 'শিলাদিত্য' একটি রুচিসম্মত, সুসম্পাদিত মাসিক-পত্র হিসেবে বাঙালী পাঠকসমাজে অধিকতর সমাদৃত হয়ে উঠবে।

পাঠকরা আজই স্টলে বা হকারকে বলে রাখুন।

২৩ জুলাই সংখ্যায়

খেলার আসর

বিশ্ব কাপ ফুটবল ফাইনালের ফটো অ্যালবাম এবং প্রতিযোগিতার অজানা নানা তথ্য।

লিখেছেন অতুল মুখার্জি ও অশোক চৌধুরী।
ছবি ঃ অমিয় তরফদার
লন্ডন থেকে ভারত ঃ ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের রিপোর্ট পাঠিয়েছেন সুব্রত সরকার
'আমার হিরো' পর্যায়ে পরিমল দে-র সাক্ষাৎকার।

এবং নিয়মিত সব ফিচার

প্রচ্ছদে রঙীন ছবি ঃ চ্যাম্পিয়ন ইতালি দলের

নবম দশম

প্রথম বর্ষ ● চতুর্দশ সংখ্যা ● ১৬ জুলাই ১৯৮২ ● দাম ৫ টাকা
বিমান মাশুল ঃ পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ৪০ পয়সা

সূচীপত্র

পাঠক্রম বিভাগ

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য

● **প্রথম পত্র/কুমার চট্টোপাধ্যায়**

পাঠ সংকলন (পদ্যাংশ) ঃ পুরাতন ভৃত্য/৫
অনুবাদ/৮
ভাবসম্প্রসারণ/১০
প্রবন্ধ রচনা ঃ একটি বনভোজন/১০
চিড়িয়াখানায় একদিন/১৩
কথা ও কাহিনী ঃ মানী/১৫
কবিতা সংকলন ঃ সুখ/১৮

● **দ্বিতীয় পত্র/নির্মল লাহিড়ী**

পাঠ সংকলন (গদ্যাংশ) ঃ মেজদা/২২
ব্যাকরণ ঃ প্রত্যয়/২৮
গল্প সংকলন ঃ অনধিকার প্রবেশ/৩১
পদার্থবিদ্যার নবযুগ ঃ ইলেকট্রনের জয়যাত্রা/৩৩

দ্বিতীয় ভাষা ঃ ইংরাজী

● **দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়**

Test : A Daily Drama/৩৭
Grammar : Active & Passive Voice/৪২
Translation/৪৪
Letter Writing/৪৬

ভারত ও ভারতবাসী

● **ইতিহাস/নারায়ণচন্দ্র চন্দ**

ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি (২)/৪৯

● **ভূগোল/গৌতম মল্লিক**

দাক্ষিণাত্য মালভূমি/৬৬

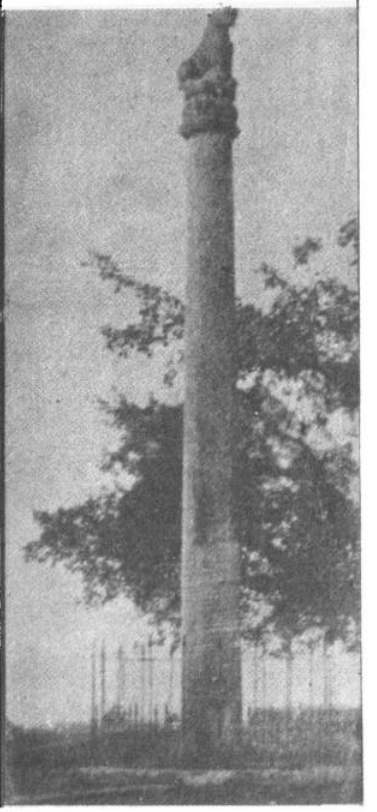

বিজ্ঞান পর্ব

● **গণিত/দীপক সেনশর্মা**

পাটিগণিত/মিশ্রণ/৮০

বীজগণিত/সরল সমীকরণ/৮৭

জ্যামিতি/উপপাদ্য/৯৪

● **ভৌত বিজ্ঞান/অমৃতসূ দাস**

পদার্থবিদ্যা ঃ আলোক বিজ্ঞান/৯৯

রসায়নবিদ্যা ঃ তড়িৎ বিশ্লেষণ/১০৩

● **জীবন বিজ্ঞান/দেবাশিস বিশ্বাস**

রক্তের গোষ্ঠীবিভাগ/১১০

কর্মশিক্ষা পর্ব

● **কর্মশিক্ষা/পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় / ১২০**

● **শারীর শিক্ষা/অমিয় সাহা/ ১২৫**

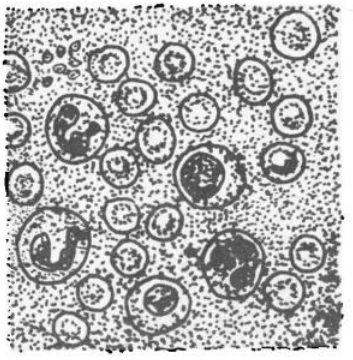

সহপাঠক্রম বিভাগ

গ্রহণের সূর্য/ডঃ অলোক সেন/১২৯

আজও সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার হয়নি/ মিহির মজুমদার/১৩৬

বিদ্যালয় পরিচিতি/হরিনাভি স্কুল/ সুহাস মজুমদার/১৩৯

বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র খাদ্য/সমীরণ মুখোপাধ্যায়/১৪৩

বুদ্ধির খেলা/১৪৬

জনজঙ্গল/বুদ্ধদেব গুহ/১৪৭

সন্ধানী প্রতিযোগিতা/১৫১

বিশ্ব কাপ ফুটবল অতুল মুখার্জি/১৫২

সাম্প্রতিক সংবাদ/১৫৫

এবং জবাব/১৫৮

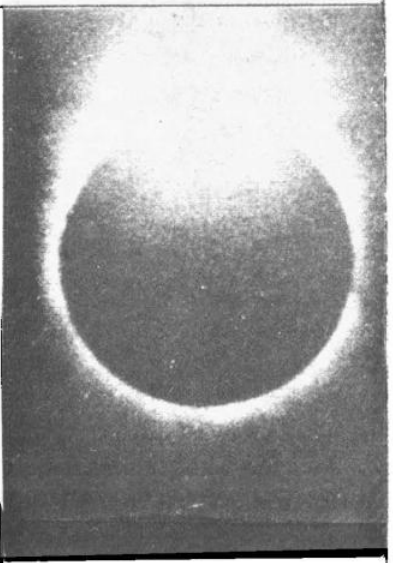

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সংযুক্ত সম্পাদক: ডঃ নীরদ হাজরা

শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রচ্ছদ ঃ সূর্যগ্রহণ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, ফোন ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে, শীর্ষস্থান অধিকারী একুশজনের নামও সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে। পর্ষদ সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় দাবী করেছেন যে কৃতী ছাত্র দেবার গৌরব এবার শুধু কলকাতার বিদ্যালয়গুলোর মধ্যেই সীমিত নেই। অর্থাৎ কলকাতার মৌরসীপাট্টা ভেঙেছে।

কিন্তু এবারের কৃতী বিদ্যালয়গুলোর কটি ছড়িয়ে আছে কলকাতার বাইরে ? সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিকেন্দ্রীকরণ কি পরিতৃপ্তিকর ? আসলে কৃতী বিদ্যালয়ের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায় আর তার কেউই পূর্ব ঐতিহ্যশূন্য নয়। আসলে ভাল ফল দেখানর আভিজাত্যের মৌরসীপাট্টা আজও অনড়ই আছে।

অধিকন্তু এই সব অভিজাত বিদ্যালয় এমন সব সুবিধা ভোগ করে যা পশ্চিমবঙ্গের শতকরা আশি ভাগের কাছাকাছি বিদ্যালয় কল্পনাও করতে পারে না। এইসব বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের পারিবারিক শিক্ষা-পরিবেশ ও আর্থিক দৃঢ়তারও সুযোগ পেয়ে থাকে। ফলত শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মনস্বিতা ঐ সব সহায়ক ব্যবস্থার আনুকূল্যে ঈর্ষণীয় কৃতিত্বের স্বর্ণপ্রভ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। এ বছরে যাঁরা এমন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন, এবং তাঁদের নেপথ্যে যে সব অভিভাবক-শিক্ষক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের সকলকে আমরা আমাদের উষ্ণতম আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কিন্তু অবশিষ্ট যে ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারে না, তা কি শুধু তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার অভাবে ? বহু ছাত্রছাত্রীই সুযোগের অপব্যবহার করে, পাঠে আত্মনিয়োগ করে না—তাদের অনুজ্জ্বল ফল বা অকৃতকার্যতা—যোগ্য পুরস্কার। কিন্তু এমন ছাত্রছাত্রীও আছে যারা পাঠ্যপুস্তক কটি কোনক্রমে সংগ্রহ করে—কোন নোট বই বা সহায়ক গ্রন্থ সংগ্রহের সামর্থ তাদের নেই, গৃহশিক্ষক ত দূরের কথা—কোন বিষয়ে সামান্যতম সাহায্য করার, বুঝিয়ে দেওয়ার বা নির্দেশ দেওয়ার কেউই নেই তার পরিবেশে—জীবনযাপনের নিষ্ঠুর তাগিদে যারা পড়তে বসবারও অবকাশ পায় না। সহপাঠী যখন দ্বিতীয় প্রাইভেট টিউটরের কাছ থেকে পড়ে তৃতীয় শিক্ষকের কাছে চলেছে, তখন সে চলেছে বাজারে, ডাক্তার ডাকতে, রেশনের লাইনে, গম ভাঙবার কলে বা নিজেই সওদা নিয়ে চলেছে রেলে-পথে বা মেলায় উপার্জনের তাগিদে। তবু নিজেকে প্রস্তুত করেছে, নাই বা থাকল সহায়, নাই বা থাকল সাহায্যের মানুষ—নাই বা থাকল উপযুক্ত অবকাশ। আছে যে জ্বলন্ত আগ্রহ, আছে যে মানুষ হবার প্রত্যয়, আছে যে শিক্ষালাভের অভিলাষ। তাই সে এই বিষম এবং অসম প্রতিযোগিতার আসরে নেমেও সাফল্যের যে সামান্য পরিচয়টুকু সংগ্রহ করেছে—মানবিকতার বিচারে তার মূল্য অসামান্য। না হক তার প্রতিকৃতি ছাপা, কোন সাংবাদিক তার জীবনরীতি বা আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নাই জানতে চাক, ভাল ফল না করায় কোন স্কুল বা কলেজের দরজা তার মুখের সামনে দিক না উচ্চ শিক্ষার দরজাটা অবরুদ্ধ করে—তবু, তবু এই মুহূর্তে আমরা তাদের ঐ কৃতিত্বকেও অবিস্মরণীয় মনে করছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের সর্বান্তঃকরণে।

বাঙলাভাষা ও সাহিত্য • প্রথম পত্র

পাঠ সংকলন ঃ পদ্যাংশ

পুরাতন ভৃত্যঃরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবারে আমরা কবিতাটির পাঠে মন দিতে পারি। প্রথমেই কবিতাটির আকার-প্রকার সম্পর্কে মনে একটা ধারণা গড়ে নাও। কবিতাটিতে আছে মাত্র পাঁচটি স্তবক। এর প্রথম চার স্তবকে বারটি করে চরণ আছে। শেষ স্তবকে আছে দশ চরণ। এই মোট (৪৮+১০=৫৮) আটান্ন চরণের কবিতা এটি।

এ কবিতাটি মুখস্থ করা একান্ত প্রয়োজন। যারা কবিতা উপপাঠ্য হিসাবে 'কথা ও কাহিনী' গ্রহণ করেছ, তাদের ত কবিতাটি মুখস্থ করতে হবেই, যারা কবিতা-সংকলনকে গ্রহণ করেছ, তারাও করবে। প্রথমত কবিতাটি মনোমুগ্ধকর, সুন্দর আবৃত্তিযোগ্য, এর বহু পংক্তি আজ প্রায় প্রবাদ প্রবচনে পরিণত হয়েছে। শেষত পরীক্ষায় উত্তর করবার সহায়তার জন্যও কবিতাটি মুখস্থ রাখা দরকার—এতে ভাষার প্রভূত সহায়তা পাবে। অতএব মুখস্থ কর।

এখন কবিতাটির পরিকল্পনাটি ভাল-ভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। প্রথম স্তবককে কাহিনীর অবতরণিকা বা ভূমিকা বলা যায়। এখানে কবি কেষ্টার একটা সাধারণ চিত্র এঁকেছেন মাত্র। দ্বিতীয় স্তবকে কবি একটিমাত্র ঘটনা বর্ণনা করে কেষ্টার ঐ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মূল কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে তৃতীয় স্তবক থেকে। এখনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা, স্ত্রীকে সঙ্গে না নেওয়া, কেষ্টাকেও উপেক্ষা এবং অবশেষে নাছোড়বান্দা কেষ্টার অপ্রত্যাশিত অথচ অভ্যস্ত সেবাদানে প্রভুর পরিতৃপ্ত মনের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে।

চতুর্থ স্তবকের প্রথমদিকে কেষ্টার কথা নেই। পথসাথীদের সঙ্গে সখ্যতা—সুখ সম্ভাবনার প্রত্যাশা ; সহসা বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়া—নতুন সাথীদের নিঃশব্দ পলায়ন কেষ্টার মাতৃসম সেবা। পঞ্চম স্তবকেও কেষ্টার সেবারই কথা। এখানেই আমরা প্রথম কেষ্টার মুখের কথা শুনি। কথাগুলো এমনই যে, সে যেন ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। প্রভুর সাধ পূরণ করতে সে যেন স্বেচ্ছায় প্রভুর রোগ ও মৃত্যু বরণ করে নিয়ে প্রভুকে মা-ঠাকরুণের কাছে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আত্মদানের ভিতর দিয়েই কেষ্টা নিজেকে চির উজ্জ্বল করে তুলেছে।

মূল কবিতার এই পরিকল্পনাটি সামনে রেখে আমরা কবিতা পাঠ ও বিশ্লেষণ শুরু করছি।

★

কদাকার চেহারাকেই ভূতের মতন চেহারা বলা হয়। সাধারণভাবে ভৌতিক চেহারার মধ্যে কঙ্কালের প্রাধান্য। তাই ভূতের মতন চেহারা বলতে আমরা শ্রীহীন এবং শীর্ণ চেহারা বুঝি। কিন্তু এ বর্ণনা আমরা সকলের সম্পর্কে প্রয়োগ করি না। লক্ষ্য করলে দেখবে হয় অতি বিদ্রূপ করতে বলি 'ভূতের মতন চেহারা' নতুবা তা হয় অন্তর্লীন স্নেহের উদ্ভাস। মা বললেন,

দেখেছ, হতভাগাটার যেমন ভূতের মতন চেহারা, ঠিক তেমনি বাঁদরের মত বুদ্ধি! সত্যিই কি মা তা বোঝালেন? না, ওটা মায়ের স্নেহেরই বাণী। বক্তব্যটা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়।

এখানে গল্প-কথক বা প্রভুটির (খবরদার! এ গল্পের আমিকে রবীন্দ্রনাথ বলে বর্ণনা কর না। হয় লিখবে গল্প-কথক, নয় প্রভু, কর্তা বা 'দালাল ভদ্রলোক' —এই জাতীয় একটা কিছু পরিচয়, যা গল্পে ফুটে উঠেছে।) মনের স্নেহই ফুটে উঠেছে কেষ্টার এই রূপ বর্ণনার ভিতর দিয়ে। গোটা কাহিনীর ভিতর দিয়ে কবি ত কেষ্টার বাহ্যরূপের বৈশিষ্ট্য শূন্যতার ও আপাত নির্বুদ্ধিতার খোলস ছিঁড়ে তার আত্মত্যাগী জ্যোতির্ময় দেবোপম মূর্তিটিই আঁকতে চেয়েছেন। বাড়ির চাকর আর কবে কোথায় বিশ্বসুন্দর হয়! যদি বা হয় রোদে পুড়ে, অনাদরে উপেক্ষায় তার জৌলুশ যায় মরে। আর সত্যি কথা বলতে কি চাকরের রূপের কথা নিয়ে ভাববারই বা সময় কোথায় প্রভুর! তাই চাকর মাত্রেই 'ভূতের মতন চেহারা'। এখানে গল্পকথক পুনর্জীবন লাভ করে ফিরে এসে এই গল্প বলছেন। মন তাঁর কেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরা। লক্ষ্য করলে দেখবে, এসব অংশে গল্প-কথক যেন কেষ্টা সম্পর্কে তাঁর প্রাক্তন ধারণাকে বিদ্রূপ-বিদ্ধ করতেই এমন সব নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন করবে, আপনি এমন সব কথা বলছেন কেন? আপনার বক্তব্য ত কোন নোট বই বা ব্যাখ্যাকারের সঙ্গে মিলছে না। না মিলুক, তুমি নিজে বুঝে নাও গল্প-কথকের কথা। দ্বিতীয় পংক্তি ধর। 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।' ব্যাপারটা 'গিন্নি বলেন' মাত্র। তাহলে গল্প-কথক এ কথা বিশ্বাস করেন বলে কি মনে হচ্ছে? এমন কি, গিন্নিও কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় এ বর্ণনা থেকে? না, ওটা ও বাড়ির রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। হারালেই বলা হয়, ওটা কেষ্টার কাজ। গিন্নিও জানেন সেটা প্রকৃত ব্যাপার নয়, কর্তাও বোঝেন, কেষ্টা ত জানেই। কেষ্টা যদি সত্যিই 'চোর হত, তবে গল্প-কথক কখনই বলতেন না 'গিন্নি বলেন'—তা হলে শুধুই

যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টাবেটাই চোর

চোর বলে উল্লেখ করা হত।

ব্যাপারটা পরের দুই পংক্তিতে আরও স্পষ্ট। কর্তা গিন্নি দু'জনেই উঠতে বসতে কেষ্টাকে 'বাপান্ত' করেন। বাপান্ত করা অর্থ গালি দেওয়া। 'বাপের জন্মে খাসনি, চোখে দেখিসনি', 'বাপ তোকে কি শিক্ষা দিয়েছে।' 'চাষার ছেলে চাষা' গোছের কথাকেই বাপান্ত করা বলে। এমন করে গালি দেন দুজনে—কেষ্টা এসব কথা গায়ে মাখে না। 'যত পায় বেত'—এ কথায় সত্যি সত্যি বেত দিয়ে মার না বোঝাতেও পারে। এখানে বেত অর্থ শাস্তি। কথাটার অর্থ কেষ্টা যে পরিমাণে শাস্তি পায়, সে পরিমাণে বেতন পায় না। অর্থাৎ তার মজুরির পরিবর্তে তর্জনা বেশি।

এর পরের অংশটাই গুরুত্বপূর্ণ—'তবু না চেতন মানে।' এত যে গালাগালি, এত যে তর্জনা, তার পরিবর্তে এত যে বেতনের ঊণতা, তবুও তার কোন চেতনার উন্মেষ হয় না। তাহলে গল্প-কথক কি তার চেতনার উন্মেষণ চাইছেন? চেতনা না জাগার জন্য তাঁর ক্ষোভ? আসলে গল্প-কথক ত কেষ্টার আত্মদানের কথা জেনেছেন। তাই বুঝেছেন যে বাহ্যরূপ দিয়ে মাপা যায় না কেষ্টার অপরূপ দিব্য চরিত্রকে, অর্থের মূল্যে শোধ করা যায় না তার সেবাকে, সংসারের স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে মাপা যায় না তার পরার্থপরতার বুদ্ধিকে —সেই অর্থেই সে ঘোর নির্বোধ।

এর পরের বর্ণনাগুলোর এমন ঠিক দু'টি অর্থ সৃষ্টি করা যায় না। তবে কর্তা গিন্নির সব ফরমাস যদি একা কেষ্টাকে সামলাতে হয়, তবে প্রয়োজনের সময় কেষ্টাকে খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে। কর্তা যখন বাইরে বেরুতে জুতো জোড়ার জন্য উতলা এবং কেষ্টাই বের করে দিতে পারে, ঠিক তখনই হয়ত গিন্নি তাকে পাঠিয়েছেন অন্য বাড়ি থেকে পাঁজিটা চেয়ে আনতে। ব্যাপারটা যাই হোক, গল্প কথক বলছেন, প্রায়ই প্রয়োজনের সময় কেষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায় না (তবে ঘুম থেকে না উঠতেই হুঁকো পান কি করে?) হাঁক ডাকেও সাড়া মেলে না। জিনিস হারাতে সে যেমন ওস্তাদ, তেমন ওস্তাদ জিনিস ভাঙতে। (গাড়িতে যাওয়া বা বৃন্দাবনের বাসায় থাকা বা সেবা করার ভেতর দিয়ে কি কেষ্টার এসব গুণ ফোটে? না বিপরীত কথাই মনে হয়?) যেখানে সেখানে যখন তখন সে ঘুমিয়ে প'ড়ে। যখন তাকে গালি দেওয়া হয়, 'পাজি হতভাগা গাধা।' তখনও সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসে। (কিন্তু কেন? কেষ্টা জানে, ওগুলো কর্তার মুখেরই ধ্বনি —প্রাণের নয়।)

এত অগুণ (দোষ) থাকা সত্ত্বেও কেষ্টার মায়া ছাড়তে পারেন না গল্প-কথক। পুরাতন ভৃত্যের মায়া ছাড়ান ভার। কিন্তু কেন?

কারণটির মধ্যেই কেষ্টার স্বভাব বৈশিষ্ট্য জড়িত। সে নিজের সেবাপরায়ণতা দিয়ে প্রভুর মনে 'কেষ্টা-নির্ভরতা'র সৃষ্টি করেছে। কেষ্টা জড়িয়ে গেছে তাঁর জীবনযাত্রার ছন্দের সঙ্গে। কেষ্টার যত ত্রুটিই থাক, আসলে প্রভুতে-ভৃত্যে ঐ ছন্দ জমে ওঠে, কেষ্টাকে বাদ দিলে ছন্দ ভ্রষ্ট হতে হয়—ভৃত্যের প্রতি ঐ নির্ভরতাতেই প্রভু মায়াবদ্ধ।

কবিতাটির মূল সত্যটিই এই অংশের মধ্যে জড়িত। তোমরা জান, সেবা দিয়ে ঈশ্বরকেও মায়াবদ্ধ করা যায়—ভারতীয় সাধনাতত্ত্ব একথা বলে। মনে আছে কি মীরার সেই ভজন! হে প্রভু আমাকে তোমার ভৃত্য কর! কেষ্টাও সেবা দিয়ে প্রভুকে অমন বশীভূত ক'রেছে।

প্রশ্ন

১. 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার ভৃত্যটির নাম কি ? রবীন্দ্রসাহিত্যের এমন আর দু'একটি ভৃত্যের নাম বলতে পার কি ? [২+২]

২. পুরাতন ভৃত্যের চেহারাটি কেমন ? তার বুদ্ধিটাই বা কেমন ? তার চেহারা ও বুদ্ধি সম্পর্কে গল্প-কথকের মন্তব্যকে তুমি কতখানি সত্য মনে কর ? [১+১+২]

উঃ স ঃ স্বার্থবুদ্ধির বিচারে সে নির্বোধ। কিন্তু মহামানবিকতার বিচারে, সেবাপরায়ণতার বিচারে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম।

৩. কেষ্টা সম্পর্কে গিন্নি কি বলেন ? একথা কর্তা স্বীকার করেন কি ? [২+২]

৪. 'দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।'—কার পিত্ত জ্বলে ? কি দেখে পিত্ত জ্বলে ? পিত্ত জ্বলায় কি করেন ? [১+২+১]

৫. 'তিনখানা দিলে একখানা রাখে··· একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।'—ব্যাপারটি বুঝিয়ে বল। [৪]

এই স্তবক থেকে শেষ পংক্তিটি ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। নিচের প্রশ্নগুলো দেখ ঃ

'তবু' কথাটা প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ? এখানে 'মায়া' কি ? 'মায়া' ত্যাগ করা ভার' কেন ?

ওপরের আলোচনা থেকে এ সব প্রশ্নের উত্তর পাবে। ব্যাখ্যাটি নিজে লিখবার চেষ্টা কর। এই অংশ থেকে নিচের ব্যাকরণগত টীকাগুলো জেনে রাখ।

নির্বোধ ঃ সন্ধি = নিঃ + বোধ ঃ নেই বোধ যার (বহুব্রীহি সমাস)।

গিন্নি ঃ তদ্ভব শব্দ। মূলশব্দ ঃ গৃহিণী।

কেষ্টা ঃ তৎসম শব্দ ঃ কৃষ্ণ > অর্ধতৎসম > কেষ্টা (তুচ্ছার্থে, অনাদরে)

বাপান্ত ঃ সন্ধি = বাপ + অন্ত ঃ বাপ অন্ত যার (যে তর্জনের) [বহুব্রীহি সমাস]

প্রয়োজন ঃ প্র-√যুজ্ + অন্ (ভাববাচ্য)।

চেতন ঃ ব্যুৎপত্তি = √চিত্ + অন্ (কর্তৃবাচ্য, ভাববাচ্য)। বিশেষ্য ও বিশেষণ দুই অর্থই হয়।

দেশ ঃ পদান্তর ঃ দেশীয়।

শুনেও শোনে না কানে (কারক বিভক্তি) ঃ করণ কারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ।

মহাকলরবে ঃ কল যে রব (কর্মধারয় সমাস) = কলরব। মহা যে কলরব (কর্ম-ধারয় সমাস)

অনুবাদ

প্রথমে গত সংখ্যায় প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির অনুবাদ করতে চেষ্টা করা যাক। আমাদের রীতি অনুসারে প্রথমে যথাসম্ভব শব্দানুবাদ করা হবে। একে আমরা নাম দিয়েছি প্রাথমিক অনুবাদ।

প্রাথমিক অনুবাদ ঃ মহম্মদ মহসীন ছিলেন একজন খুব ধনী ব্যক্তি হুগলীর। কিন্তু ছিলেন বিখ্যাত জন্য তাঁহার দয়ালুতার।

এক রাত্রে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন তাঁর ঘরে। রাত্রি ছিল অন্ধকার এবং শান্ত। সহসা, তিনি শুনলেন এক শব্দ। তিনি জেগে ওঠেন এবং জ্বালালেন বাতি। আলোকে

তিনি দেখলেন একটি লোক কাঁপছে ভয়ের সঙ্গে। মহসীন জিজ্ঞাসা করলেন তাকে, কেন সে এসেছিল সেখানে। চোরটি শুরু করল কাঁদতে। মহসীন তখন জিজ্ঞাসা করলেন তাকে ; তুমি দেখাচ্ছ না যে তোমার হাত দক্ষ। কত কাল তুমি এই লাইনে আছ ? চোরটি বলল ভাঙা স্বরে, মশাই, আমি হই একেবারে নতুন। আমি হই খুব দরিদ্র। আমার পরিবার আছে খাদ্য ছাড়া কয়েকদিন ধরে। আমার নেই কোন কাজ এবং তাই আমি কিছুই উপার্জন করতে পারিনি। তাই আমি এসেছিলাম তোমার বাড়িতে চুরি করতে।

শুনে এ কথা মহসীন গলে গেলেন। তিনি তাকে অর্থ দিলেন। একটা কাজও তাকে দেওয়া হল।

★

এবারের অনুচ্ছেদটি অতি সহজ। দেখ, এটা বোধহয় একবারেই চূড়ান্ত অনুবাদ হতে পারে।

চূড়ান্ত অনুবাদ ঃ মহম্মদ মহসীন হুগলীর এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দয়ার জন্য ছিল তাঁর খ্যাতি।

একদিন রাত্রে তিনি তাঁর ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ এক শব্দ শুনে জেগে উঠে আলো জ্বাললেন। সেই আলোতে দেখলেন একটি লোক। তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে। ভয়ে কাঁপছে। মহসীন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এখানে এসেছ ?' লোকটা কাঁদতে শুরু করল। মহসীন তখন বললেন, 'দেখছি তুমি একেবারেই কাঁচা। কতকাল এ পথে আছ ?

চোরটি ভাঙ্গা গলায় বলল, 'মশাই, আমি একেবারে নতুন। আমি খুবই গরিব। কদিন ধরে বাড়ির সকলে অভুক্ত আছে। আমার কোন কাজ নেই ফলে উপার্জনও নেই। তাই আপনার বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিলাম।'

শুনে মহাসীন (দুঃখে) অভিভূত হলেন। তিনি তাকে টাকা ত দিলেনই, একটা চাকরিও দিলেন।

★

বাড়িতে অনুবাদের অনুশীলনের জন্য নিচের অনুচ্ছেদটি দেওয়া হল।

One summer evening a fisherman met a plainly dressed lady walking alone on the beach. He ventured to accost her, saying that he had a petition which he wished to present to the Duchess. But he did not know how to proceed to do so. The lady asked him whether he had ever seen the Duchess. The fisherman replied that he had never seen the Duchess but he had heard that she was very ugly. The lady took the petition and promised to hand it over to the Duchess herself. A few days later the fisherman was summoned to the palace of the Duchess. The fisherman was surprised to find that the Duchess was the very lady to whom he had given his petition.

ভাব সম্প্রসারণ

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র,
নানা ভাবের নতুন জিনিস শিখছি
দিবারাত্র।

পৃথিবীতে শিক্ষার ক্ষেত্র অনন্ত। পুঁথি পড়া এবং গুরু মহাশয়ের পাঠশালার শেখাই যে শুধুমাত্র শিক্ষার পথ এ কথা সত্য নয়।

সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এই যে পুঁথি পড়ে এবং পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেই বিদ্যা-শিক্ষা লাভ করা যায়। এ কথা মিথ্যা নয় যে যুগ যুগ ধরে মানুষ যে জ্ঞান সঞ্চয় করে গেছে তা পুঁথি পড়েই সহজে আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু এই শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নয়।

এই পৃথিবীর দিকে দিকে শিক্ষণীয় বিষয় ছড়িয়ে আছে। যাঁরা পৃথিবীর প্রধান শিক্ষাগুরু তাঁরা পাঠশালায় পড়ে শেখেননি। যীশুখ্রিস্ট গতানুগতিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি পার্থিব শিক্ষালাভের জন্যে দেশে দেশে পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। যে রামকৃষ্ণদেবকে যুগাবতার বলি, তিনি ত ছিলেন সমস্ত রকম বিদ্যালয়-শিক্ষা বর্জিত। কবীর জোলা কোন বিদ্যালয়ে পড়েননি। স্বামী বিবেকানন্দ দর্শনের ছাত্র হলেও সিদ্ধির জন্যে জাগতিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অবশেষে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই তাঁর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছিল।

মন যাঁর নিপুণ, স্পর্শকাতর তিনি বিশ্বের প্রতি জড়বস্তু হতেও শিক্ষালাভ করে থাকেন। আকাশ উদার হবার শিক্ষা দেয়, বায়ু দেয় কর্মী হবার মন্ত্র, পর্বতমালা দেয় মৌন ও মহান হবার আদর্শ। সূর্যদেব দেয় তেজের শিক্ষা, চাঁদ দেয় স্নিগ্ধ সহানুভূতির দীক্ষা। তাঁরা সাগরের কাছে মন্ত্র পান হৃদয়কে রত্নময় করতে, নদী দেয় চলার বেগ। এইভাবে বিশ্বজোড়া পাঠশালা হতে ওঁরা শিক্ষা পান।

প্রবন্ধ রচনা

এবারে আমরা কতকগুলো ঘটনা বর্ণনামূলক প্রবন্ধ রচনা করতে চেষ্টা করব।

আমাদের জীবনে কত ঘটনাই ত ঘটে। কিন্তু সব ঘটনাই কি বর্ণনা করবার মত? নিশ্চয়ই না। কত ছাত্রছাত্রীই ত শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে মার খায়, বকুনি খায়। কিন্তু সেটা কি একটা বর্ণনীয় বিষয়? কিন্তু যদি কোন একদিন মার খেয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল ছেলেটির, সে শুধু বিদ্যালয়ের সেরা হয়ে রইল না--সে একেবারে দেশের সেরা হয়ে উঠল—এবার হল গল্প, এবার হল বর্ণনার বিষয়। বর্ণনামূলক রচনায় এমন একটা গল্পের আবেশ আনতে হয়।

এবারের রচনা দুটি পড়। এর কৌশল শিখতে চেষ্টা কর। নিজের বুদ্ধিতে যদি বের না করতে পার, হার স্বীকার কর--তবে পরে জানিয়ে দেব।

একটি বনভোজন

বন্ধু আমরা পাঁচজন। পাঁচ সখা। আমাদের বাড়ির অবস্থা এক মালতীর ছাড়া আর কারও ভাল নয়। তবু আমাদের বন্ধুত্বে ফাটল নেই। আমরা এক ক্লাসে পড়ি, একরকম পড়াশুনায়। যতদূর পারি একত্রে কাটাই। আমাদের আমোদ-প্রমোদও একই রকম।

মালতীর বাবা সদ্য একটি বজরা কিনেছেন। ভারী সুন্দর দেখতে।

আমাদের বাড়ির পাশে নদীতে ভাসে। দোল খায় দিনরাত। বজরার নাম মরাল। সত্যিই যেন মরাল। আমরা ঠিক করলাম মরালে করে আমরা যাব মায়াপুর। সেখানে চড়ায় হবে চড়ুইভাতি। আধুনিক ভাষায় বনভোজন বা পিকনিক।

অনুমতি মিলল অভিভাবকদের। অনুমতি মিলল মালতীর বাবার। নৌকা চালায় বুড়ো বিশুদা। বিশুদা থাকবেন আমাদের সঙ্গে। তিনি আমাদের রক্ষক, আমাদের উপদেষ্টা—সব।

পাঁচজনে মিলে হিসেব করে বাজার করা হয়, বিশুদা ঘাড়ে করে সব মাল নিয়ে এলেন। জমা হল মরালে। রাত্রে আর ঘুম আসে না। ভোর হতে না হতেই মালতীদের বাড়ি এসে হাজির হলাম। ওমা! মণি, বিন্দি, সুষমা আমার আগেই এসে গেছে, ঘুম তাহলে কারোরই হয়নি।

সূর্য ওঠবার আগেই আমরা নৌকাযাত্রা শুরু করলাম। যদিও বদর বদর বলে কেউ নৌকা ছাড়ল বধূরা পাড়ে দাঁড়িয়ে বাজাল না শঙ্খ, দিল না হুলুধ্বনি, ছড়াল না লাজাঞ্জলি তবু কেন জানি না, আমার বারবার চাঁদ সওদাগরের কথাই মনে হতে লাগল। ঐ ভাঙা পাড়, পোড়া মাঠ, ন্যাড়া শিমুল গাছ আর স্থানে স্থানে চড়া পড়া নদী—তাকেই মনে হতে লাগল অপরূপ—অপরূপ।

ঝিরি ঝিরি বাতাসের আমেজ-ধরান শীতের সকাল। দেখলাম, প্রভাতের পুণ্য অঞ্চলের সবটুকু রং উদার করে নদীর জল যখন রাঙা হয়ে উঠল ঠিক সেই সময় সেই সোনা-গোলা নদীর জলের বুক চিরে সূর্যদেব টক করে উঠে দাঁড়ালেন। নদীর ঢেউগুলো যেন সমস্ত জগতের লক্ষ প্রণামের উপচার নিয়ে ছুটে চলল। সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম হাজার পাখি কলতান শুরু করেছে—হয়ত জয় বন্দনা।

আমারও আত্মতন্ময়তা ভাঙল বিন্দির অতি বাস্তব আমন্ত্রণে। হতভাগী কানের কাছে রাক্ষসীর মত চেঁচিয়ে উঠল 'চা'। চমকে তাকিয়ে দেখলাম সেই জলের ওপরে জলযোগের ষোড়শ উপচার প্রস্তুত। রুটি, মাখন, কলা আর ডিম, সঙ্গে চা। মনে হল আজ আমি রূপকথার রাজকন্যা। আলাদিনের ঐশ্বর্য পেয়েছি। এখুনি পারসিক বাঁদি সুপুষ্ট আঙ্গুর গোছা থেকে একটি ছিঁড়ে বলবে, শাহাজাদী একটি মুখে দিন। মনে পড়ল এতক্ষণে ভাইটি কালকের বাসি রুটি চিবুচ্ছে।

ঠিক দশটায় আমরা মায়াপুর পৌঁছলাম। দূরে মন্দিরের চূড়া। নদীতে তার প্রতিফলন। নদীর খাত মরে গিয়ে

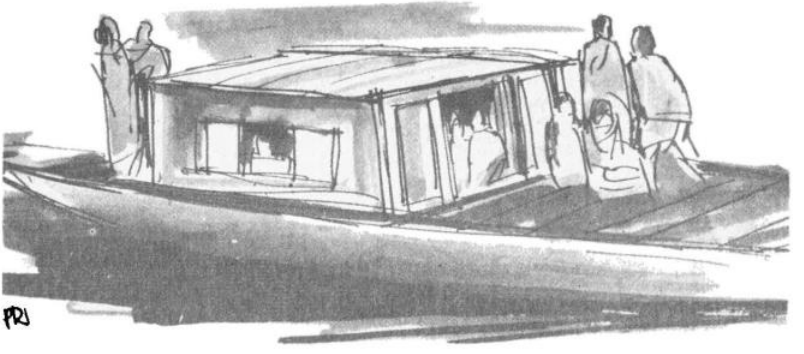

মায়াপুর আজ নবদ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন। একদিন নাকি এক ছিল। এখানেই নাকি চৈতন্যদেবের জন্মভিটা। জগাই-মাধাই উদ্ধার—ভাঙা খোলা—কাজি দলন, কাজির কবর! অবশ্য এসব আমি আর মণি ওদের বকাবকি খেয়েও এগারটা থেকে দুটোর মধ্যে এক চক্কর ঘুরে দেখে নিয়েছিলাম।

নদীতীরে বালি আর বালি। রান্নার জায়গা মেলা ভার। অবশেষে একটা খাঁড়ি মত জায়গায় স্থান নির্বাচন হল। মাটি খুঁড়ে ইট পেতে উনুন যদি বা হল তাতে আর আগুন জ্বলে না। বালি চুইয়ে জল উঠে ভিজে যায়। আধ ঘণ্টা ব্যর্থ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল স্টোভেই রাঁধতে হবে।

জল? হায়রে! কে জানত যে নদীর এত জল তবু তা পান করতে অনভ্যস্ত আমরা, ও জল দেখে ঘেন্না বোধ করব। অবশেষে তাই মেনে নেওয়া হল। বেলা বারটা প্রায় বাজে। এমন সময় সুষমা আর্তনাদ করে উঠল। দুপুরের রান্নার জন্য ডিমের যে আলাদা প্যাকেট, সেটা আনাই হয়নি। উপায়?

উপায় নির্ধারক বিশুদা সহাস্যে বললেন, ভাবনা কি দিদি। ওপারে নবদ্বীপের বাজার। ওখান থেকে কিনে আনি? একথা বলেই হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হল, বলল, তার থেকে এক কাজ করা যাক। ঐ যে বাঁক দেখছ, ওর ওপাশে জেলেরা ডিঙি বেয়ে ইলিশ ধরছে। গঙ্গার ইলিশ। কি তেল তার! কি স্বাদ! তাই নিয়ে আসি।

আমরা লাফিয়ে উঠলাম। বিশুদা নৌকা নিয়ে চলে গেল। ওরা তিনজন রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আমি ইসারায় মণিকে ডাকলাম। টুক করে উঠে, দৌড়, দৌড়! দৌড়! বালিয়াড়ি ভেঙে বটগাছের কাছে গিয়ে একটা রিক্সা। যা, যা দেখবার তাড়াতাড়ি দেখিয়ে আনব ভাই!

ফিরতে প্রায় দুটো। ভয়ে ভয়ে ফিরলাম। নিশ্চয় ওরা রান্না সেরে, স্নান সেরে আমাদের জন্য খেতে বসতে পারছে না! এসে দেখি অবস্থা আরও খারাপ। বিশুদা ফেরেনি। স্টোভের তেল ফুরিয়ে নিভে গেছে। তাতে এক আলু কপির তরকারি ভিন্ন আর কিছু হয়নি। তার ওপর আমাদের অনুপস্থিতিতে মেজাজ সকলেরই সপ্তমে।

কথা না বলে দুজনে স্নান করে নিলাম। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল। কড়া সূর্যের তেজ স্তিমিত হয়ে এল। বেলা প্রায় চারটে। বিশুদার এখনও দেখা নেই সকলের রাগ তখন আতঙ্কে পরিণত। কি হল বিশুদার? মালতীর মুখ ছলছল।

সকলকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঐ ভাত আর তরকারিই খাইয়ে নিলাম। ক্ষুধায় ও উৎকণ্ঠায় কি যে খেলাম বুঝলাম না। একটু একটু করে আলো কমে আসতে লাগল। আমরা যখন হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়তে চলেছি, তখন হঠাৎ এক বালিয়াড়ির পেছন থেকে বিশুদার দাড়ি-ভরা সহাস্য বদনখানি দেখা গেল। হাতে তার এত্তবড় রুপোর পাতের মত এক গঙ্গার ইলিশ।

মাছ না পেয়ে জেদ ধরে গেছিল বিশুদার। খুকীদের কথা দিয়ে এলাম। মাছ খাওয়াতে পারব না। ধর তোরা। ফেল জাল। ডবল দাম দেব। মাছ চাই-ই। মাছ পেয়ে ডাঙা পথে দ্রুত এসেছে বিশুদা। এক জেলে নৌকা বেয়ে জলপথে আসছে পিছনে।

নৌকা আসতে তেলের ব্যবস্থা হল। বিশুদার ভাণ্ডারে 'রিজার্ভ স্টক' ছিল। ঐ তেলে স্টোভ জালিয়ে ইলিশ মাছ ভাজা

আর গরম চা দিয়ে আমরা হাল্কা জলযোগ পর্ব সারলাম। অভুক্ত বিশুদা খুকীদের মাছ খাওয়াতে পারার পরম পরিতোষে দ্রুতবেগে নৌকা চালিয়ে আমাদের রাত নটায় বাড়ি পৌঁছে দিলে। বলুন ত। ঐ দিনটি কি ভুলবার ?

চিড়িয়াখানায় একদিন

নানারকম পশুপাখি দেখতে কার না ভাল লাগে। বিশেষ করে আমার মত ছোট ছেলের। কিন্তু তাই বলে বনে গিয়ে বন্য জীবজন্তু দেখা ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই যেদিন থেকে জানলাম যে আলিপুরে একটি চিড়িয়াখানা আছে, সেইদিন থেকেই আমার মনে চিড়িয়াখানা দেখে আসার সাধ জাগে।

আমার কাকা থাকেন কলকাতায়। তাঁর ছেলে, মানে আমার বিশুদার বিয়েতে আমরা সবাই গিয়ে উপস্থিত হলাম কলকাতায়। বৌভাতের হাঙ্গামা মিটতে আমি প্রস্তাব দিলাম চিড়িয়াখানা দেখতে যাবার। সবাই দেখলাম আমার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করল।

পরদিন বেলা আটটা নাগাদ আমরা চারজন ছোট এবং দু জন বড় মোট ছ জন মিলে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের সঙ্গে রইল দুপুরের খাবার, জলের বোতল, আর বিশুদার এক শালা নিল ক্যামেরা, সে নাকি মস্ত ক্যামেরাম্যান।

আমার যখন চিড়িয়াখানার গেটে এসে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় ৯টা। দেখলাম টিকিটের জন্য বড় লাইন পড়েছে। লাইনে দাঁড়িয়ে যখন টিকিট পেলাম তখন বেলা দশটা। বিন্দুমাত্র দেরি না করে আমি আমার এতদিনের স্বপ্নের রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

আমরা প্রথম যেখানে গেলাম সেটা হচ্ছে পাখিদের রাজ্য। ময়ূর, সাদা ময়ূর, উটপাখির খাঁচার পাশ ঘুরে আমরা গেলাম অন্য পাখিদের খাঁচার পাশে। শুনলাম সেইসব নাম না জানা নানা রং-এর পাখিদের বেশির ভাগই এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। এদের মধ্যে অদ্ভুত লাগল আমার কাছে লায়ার পাখিদের। বিচিত্র রকম দেখতে ছিল এদের লেজটি !

তারপর পাখিদের খাঁচা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে গেলাম সাপেদের খাঁচার কাছে। যে ঘরটিতে সাপেদের রাখা হয়েছে সেখানেই চৌবাচ্চার মধ্যে দেখলাম দুটি কুমির রয়েছে। দেখে মনে হল মরা। বেচারারা খেতে পায় না বোধহয়। ভবনটির চারপাশের আলমারিতে নানাবর্ণের নানা রকমের সাপ। পাইথন, ময়াল পড়ে আছে গাছের ডালের মত। লাউডগা সাপ সবুজ গাছের সঙ্গে মিশে আছে। দেখলে ভয় হয়। একটি হাঁড়ি থেকে বিচিত্র রং-এর একদল সরু সরু সাপকে ঝুলতে দেখলাম। নাম পড়তে গিয়ে শিউরে উঠলাম—কাল-নাগিনী। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বেহুলার কথা। বুক শুকিয়ে সেই মুহূর্তে হিম হয়ে যাবার দশা আমার।

এবারে আমরা গেলাম হিংস্র জন্তুদের খাঁচার কাঁছে। জলহস্তী দেখলাম। ডানদিকে দেখলাম বাঘের খাঁচা। দেখলাম সিংহ। আর একদিকে দেখলাম একটা বিরাট ভল্লুক। দেখতে দেখতে ভয় ও শিহরণ জাগল। দেখলাম সিংহটা কাঁচা মাংস টেনে টেনে খাচ্ছে। আর তা দেখতে দেখতে টুবলু এমন কান্না জুড়ে দিল যে আমরা তাড়াতাড়ি হাতির কাছে চলে এলাম।

হাতি আমাদের বিশেষ পরিচিত ও দেখা জীব। তবু ভীষণ ভিড় দেখলাম সেখানে। সবাই হাতিকে ছোলা খেতে দিচ্ছে। কেউ কেউ আবার দেখলাম পয়সাও দিচ্ছে। মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, হাতিটা পয়সাগুলো বেছে নিয়ে

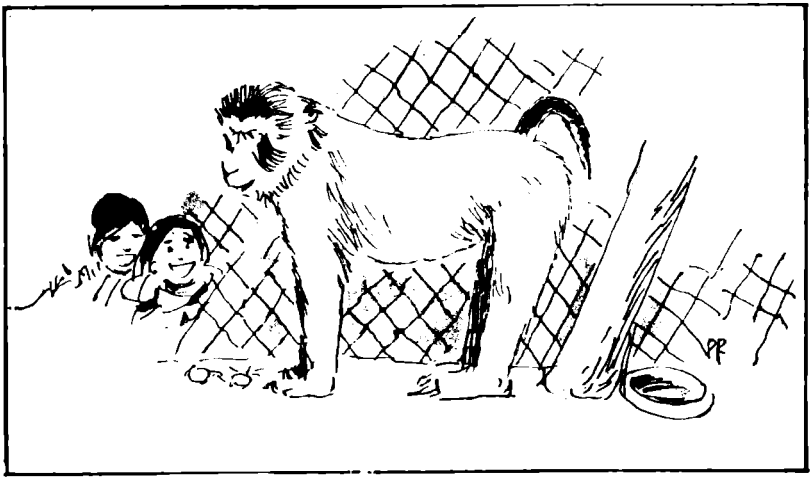

মাহুতকে দিয়ে দিচ্ছে আর নিজে ছোলা খাচ্ছে।

হাতি দেখতে দেখতে একটা বেজে গেল। আমরা তখন গিয়ে ঢুকলাম শিশু উদ্যানে। একটা কাকাতুয়া আমাদের দেখে 'হ্যালো' বলে সম্বোধন জানাল। আমরা অতি উৎসাহ নিয়ে কাকাতুয়াটাকে ঘিরে ধরলাম। কিন্তু দেখলাম কাকাতুয়াটা হ্যালো ছাড়া আর কিছুই জানে না। আর দেখলাম ভোঁদড়ের নাচ। দুপুরের খাবার-টাও খেয়ে নিলাম সেইসঙ্গে। দেখলাম একটা হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। টুবলুর সঙ্গে ওর খুব ভাবও হয়ে গেল।

সময় আর বেশি নেই। দুটো বাজে প্রায়। আমরা সবাই দ্রুত ঘুরতে লাগলাম। উট, জিরাফ, বনমানুষের খাঁচা ঘুরে সবাই এসে দাঁড়ালাম বানরের খাঁচার কাছে। কিন্তু আশ্চর্য বানরের খাঁচার পাশ থেকে কেউ আর নড়তে চায় না। কত রকম বানর দেখলাম যার মধ্যে হাতখানেক উঁচু একরকম ক্ষুদে বানর আমাদের মাতিয়ে তুলল। একটা বানর আমাদের সামনে এসে মুখে আঙুল লাগিয়ে সিগারেট চাইতে লাগল। একজন একটা সিগারেট দিতেই এক লাফে গাছে উঠে সিগারেট খেতে লাগল। দাদার শালা তাড়াতাড়ি তার ছবি নিল।

তিনটে বেজে গেছে। আমরা প্রায় ছুটছি। বল্গাহরিণ, বিরাট কচ্ছপ, শজারু, গন্ধ গোকুল, ক্যাঙ্গারু, ওরাং-ওটাং পেরিয়ে এলাম জেব্রার কাছে। দাদার শালা ক্যামেরা বাগিয়ে যখন ছবি তুলতে যাবে অন্য একটা জেব্রা এসে ক্যামেরাটা কামড়ে ধরল। বেচারা প্রাণের ভয়ে ক্যামেরাটা ছেড়ে দিতে জেব্রাটা সেটা নিয়ে দৌড় দিল। শেষ পর্যন্ত জেব্রাদের তদারককারী লোকটির সাহায্যে ক্যামেরাটা উদ্ধার হল। বাইরে যাবার সময় হয়ে যাওয়ায় আমরা একসময় বাইরে চলে এলাম।

আমি এই দিনটি ভুলব না। এ পৃথিবীতে কত বিচিত্র জীব আছে। তাদের আমরা কতটুকুই-বা জানি? চিড়িয়াখানায় গিয়ে আমার এদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ তাই আরও বেড়েছে। আমি নানা বই পড়ে ফেলেছি এই সুযোগে। ইচ্ছা আছে সুযোগ পেলে আবার যাব চিড়িয়াখানা।

ছবি এঁকেছেন ঃ পোলারিস

কথা ও কাহিনী

মানী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত সংখ্যায় আমরা মানী কবিতার প্রথম তিন স্তবক মাত্র পড়েছি এ সংখ্যায় শুরু হচ্ছে চতুর্থ স্তবক থেকে।

মনে আছে ত এর আগেই যশোবন্ত সিংহ প্রশ্ন করেছেন যে, তিনি ক্ষত্রকুল সিংহ-শিশু সিরোহিপতিকে সঙ্গে করে রাজ সভায় আনতে পারেন, কিন্তু তার অসম্মান হবে না ত? চতুর্থ স্তবকে তারই উত্তর দিচ্ছেন আরঙজেব।

চতুর্থ স্তবক

মূলকথা ঃ আরঙজেব তখন হেসে বললেন, হে মাড়োয়াপতি মহারাজ! তুমি একজন প্রবীণ সভাসদ এবং প্রবল বীর হয়ে, এ কেমন কথা বললে? তোমার মুখে এমন কথা শুনে লজ্জা পাচ্ছি। মানীর মান নষ্ট করব—কোন মানী ব্যক্তির কি এ কাজ শোভা পায়? আমি বলছি, চিন্তা কর না—তাকে সভার মধ্যে আন।

আলোচনা ঃ এই অংশে আরঙজেবের চরিত্রটিই ভালভাবে ফুটে উঠেছে। আরঙজেব নিজেকে মানী বলে বর্ণনা করছেন এবং নীতি স্থির করে দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি নিজে মানী, সে কখনও অন্য মানী ব্যক্তির মান নষ্ট করতে পারে না। অর্থাৎ আরঙজেব বোঝাতে চাইছেন যে মানের প্রকৃত মূল্য যে জানে, সেই প্রকৃত মানী, আর তাই সে নিজের বা অপরের মান নষ্ট করেন না।

আরঙজেবের ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। তিনি শিবাজী সম্পর্কেও অনুরূপ অভয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে রাজ সভায় শিবাজীর মান রক্ষা করেননি—তা তোমরা জান।

প্রশ্ন

১ 'তোমার মুখে এমন বাণী শুনিয়া মনে শরম মানি'—এ কথা কে বলছেন ? কার কথা শুনলেন ? কি কথা শুনলেন ? শুনে আর কি বললেন ? [১+১+১+২]

২. 'প্রবীন তুমি প্রবল তুমি'—এ কথা কে কাকে বলছেন ? তাকে প্রবীন ও প্রবল বলবার কারণ কি ? এ কথা বলবার তাৎপর্যই বা কি ? [২+১+২]

পঞ্চম স্তবক

মূলকথা ঃ আরঙজেবের অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে যশোবন্ত সিংহ সিরোহিপতিকে সভায় নিয়ে এলেন। তিনি মাথা উঁচু রেখে, সামনের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন।

তাঁর এই উদ্ধত ভঙ্গি দেখে অন্য সভাসদেরা বজ্রনাদ করে উঠল, বাদশাজাদাকে সেলাম করতে বলল তারা।

এতে সিরোহিপতি যশোবন্তের কাঁধের দিকে একটু হেলে বললেন 'গুরুজনের পায়ের কাছেই আমি নত হই, আর কারও কাছে মাথা নত করি না।'

আলোচনা ঃ এখানে সিরোহিপতির চারিত্রিক দৃঢ়তার চিত্র আঁকা হয়েছে। তিনি অনবনত মস্তকে প্রবেশ করেছেন রাজ সভায়। বন্দীত্ব তাঁর গৌরববোধকে বিধ্বস্ত করতে পারেনি।

কিন্তু সভাসদেরা আরঙজেবের রাজসভায় দাঁড়িয়ে একজন বন্দীর এই আচরণকে বরদাস্ত করতে পারেননি। চিরকাল মাথা নত করাই যাদের স্বভাব, তারা অপরের উন্নত মাথা সহ্য করতে পারে না। তাই তারা চিৎকার করে উঠেছে, বাদশাজাদাকে সেলাম করও।

লক্ষ্য কর, এ'রা ক্রোধে এতদূর জ্ঞানহারা হয়েছে যে, অনুরোধ বা নির্দেশ নয়, আদেশই দান করেছেন।

অবশ্য এর যোগ্য উত্তর দিয়েছেন সিরোহিপতি। তার উত্তরের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও বিনয় সমানভাবে মিশে আছে। তিনি গুরুজনদের প্রতি বিনীত। এখানে তাঁর বিনয়ের প্রকাশ। গুরুজন ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করেন না—এ তার ঔদ্ধত্য —এ তার দৃঢ়তা। এ দৃঢ়তাকে পরাজয় বা বন্ধন কিছুই দুর্বল করতে পারেনি।

প্রশ্ন

১. সিরোহিপতি কিভাবে রাজসভায় প্রবেশ করলেন ? [৫]

২. 'কহিল সবে বজ্রনাদে'—সকলে কারা ? তারা বজ্রনাদে বলল কেন ? কি বলল ? [১+২+২]

৩. 'সেলাম করো বাদশাজাদে'—কে বা কারা একথা বলেছেন ? কাকে সেলাম করতে বলা হল ? তিনি কি করলেন ? [১+১+৩]

ষষ্ঠ স্তবক

মূলকথা ঃ সিরোহিপতির উত্তরে বাদশাহের অনুচরেরা রোষে রক্তচক্ষু হয়ে উঠল। বলল, কেমন করে মাথা মাটিতে নত করতে হয়, তা শিখিয়ে দিতে পারি।

সিরোহিপতি তখন হেসে বললেন, এমন চিন্তা কর না যে আমায় মাথা নত করতে শেখাবে। ভয়ে নত হব এমন মানুষ আমি নই। ভয় ডর কাকে বলে, তা আমি জানি না। একথা বলে রাজা কৃপাণে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন।

আলোচনা ঃ বুঝতেই পারছ, সিরোহিপতির উত্তরের মধ্যে যে ঔদ্ধত্যের গন্ধ ছিল, তা বরদাস্ত করা বাদশাহের অনুচরদের পক্ষে সম্ভব নয়—সে শিক্ষা তাদের নেই। তাই তারা চোখ লাল করে

যা বলেছে, তার কিন্তু দুটো অর্থ হয়।

মোগল রাজদরবারে কোমর বাঁকা করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মাথা নত করে কুর্ণিশ করতে হত। ওরা বললে, ওটুকু নত করা নয়—একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণত হতে শিখিয়ে দিতে পারি। এই হল এক অর্থ। কিন্তু ওরা বলল, 'মাথা লুটিয়া পড়ে ভূমি পর।' কিন্তু কখন? তলোয়ারের কোপে যখন মাথা স্কন্ধচ্যুত হয়—তখন। অর্থাৎ এত ঔদ্ধত্য দেখালে কাঁধ থেকে মাথা নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সিরোহিপতিও যোগ্য উত্তর দিয়েছেন তার। তাতে আসলে ওদের বলা হল যে, কুর্ণিশ করতে শেখাতেই আস আর মাথা কেটে ফেলতেই আস, আমার কাছে খুব সুবিধা হবে না বাপু! বাদশার সামনে বলে রেওয়াদ করব না, বাদশার অনুচর বলেও পিছিয়ে আসব না। আমি ভয় ডর জানি না। আমিও কৃপাণ চালাতে জানি।

প্রশ্ন

১. শেখাতে পারি কেমনে মাথা লুটিয়া পড়ে ভূমি 'পর।'—কে কাকে কি কথার উত্তরে একথা বলেছিল? এর উত্তরেই বা কি শুনল? [৩+২]

২. 'এমন যেন না হয় মতি'—একথা কে কাকে বলেন? কিরকম মতি না হবার কথা বলা হল? তিনি কেন একথা বললেন?

[২+২+১]

বা, বক্তা কে? এই বক্তব্যের কারণ কি? এর দ্বারা তার চরিত্রের কি পরিচয় ফুটে ওঠে?

সপ্তম স্তবক

মূলকথা ঃ তখন বাদশা আরঙজেব সিরোহিরাজ সুরতানকে নিজ হাতে ধরে নিজের পাশে বসালেন। বললেন, ওগো বীর পুরুষ! সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কোন দেশ তোমার আশা?

সুরতান বললেন, অচলগড়। অচলগড়কেই আমি জগৎসেরা মনে করি।

সুরতানের কথায় সকলে হেসে উঠল। সামান্য অচলগড়কে জগৎসেরা বলায় সকলে তাকে পরিহাস করল।

আরঙজেব কিন্তু পরিহাস করলেন না। বললেন, বেশ, তবে তুমি অচলগড়ে অচল হয়ে বাস কর।

আলোচনা ঃ লক্ষ্য কর, সভাসদ ও সুরতানের মধ্যে বাক বিনিময়ের সময় আরঙজেব কোন কথা বলেননি। তিনি স্তব্ধভাবে দেখছিলেন—বুঝে নিতে চাইছিলেন সুরতানের চরিত্র। সত্যিই কি তিনি বীর। তিনি কি ক্ষত্রকুল সিংহশিশু। সত্যিই কি তিনি মানী?

গোটা ঘটনায় সুরতানের নির্ভিকতা প্রমাণিত হয়েছে। উপযুক্ত স্থানেই ঘটনার রজ্জু নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন আরঙজেব। সুরতান যে সভাসদদের চেয়ে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, তা বোঝাতে তাঁকে নিজের পাশে নিয়ে বসিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ভারত সেরা প্রদেশটি উপহার দিতে চেয়েছেন তাঁকে।

সুরতান বাদশাহের ইঙ্গিত বোঝেননি এমন নয়। কিন্তু তিনি শুধু নির্ভীক নন—নির্লোভও বটে। তাই তিনি বলছেন যে শুধু ভারত নয়, জগৎ শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন তিনি নিজ রাজ্যকে—স্বদেশকে। এর ভেতর দিয়ে তাঁর স্বদেশপ্রীতিও ফুটে উঠেছে।

সভাসদেরা সুরতানের কথার তাৎপর্য বোঝেনি। তাই মরুরাজ্যের সামান্য অচলগড়কে জগৎ-সেরা বলায় তারা উপহাস করেছে সুরতানকে। ভেবেছে নিরেট বুদ্ধির মানুষ। বাদশার দেওয়া এতবড় সুযোগটা তা না হলে কেউ এভাবে অপচয় করে?

বাদশা কিন্তু বুঝেছেন সুরতানের মহত্ব। তাই বলেছেন, হে নির্লোভ, হে বীর! তুমি অচলগড়ে অচল হয়ে থাক।—আর আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।

প্রশ্ন

১. সভাসদ ও সুরতানের মধ্যে কথা-কাটাকাটির সময় বাদশা কথা বলেননি কেন? [৫]

২ বাদশা সুরতানকে কিভাবে সমাদর করেন? সুরতান ও বাদশার কথোপকথন বল? [৫ + ৫]

৩. 'মানী' কাহিনীটি নিজের ভাষায় বল। [১০]

৪. চরিত্র বর্ণনা কর।
সুরতান / আরঙজেব / যশোবন্ত।

কবিতা সংকলন ঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

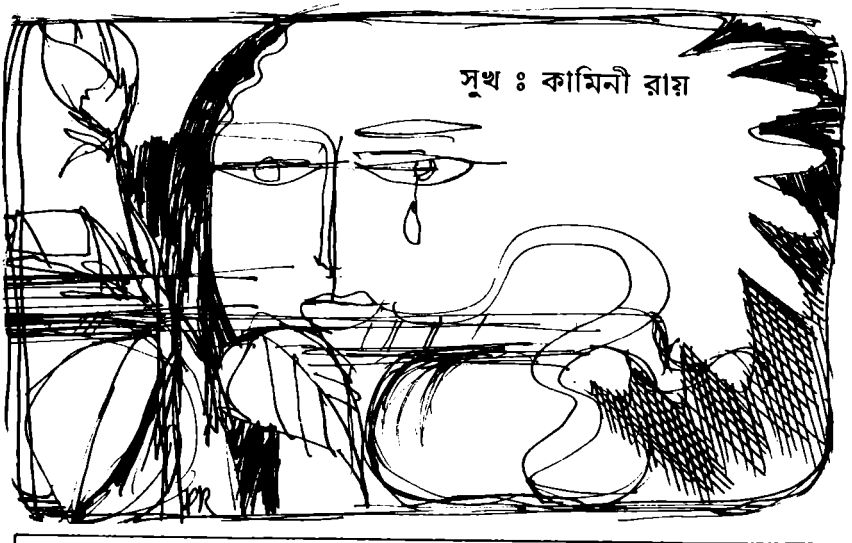

আমরা ইতঃপূর্বে এই কবিতার প্রথম সাত স্তবক পাঠ ও আলোচনা করেছি। দেখেছি কবি কবিতাটির প্রথম চার স্তবকে এক হতাশ মানসিকতার বর্ণনা করেছেন। এ জীবনে সুখ নেই। জীবন মরীচিকাময়—মরুভূমির মত। মনে হয়েছে বাঁচা এবং মরার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু পরবর্তী তিন স্তবকে কবির মনে যেন এক সংশয়—সত্যিই কি এ পৃথিবী মরুময়? পৃথিবীতে কি কোনভাবেই সুখ পাওয়া যেতে পারে না? আমরা বলেছিলাম এমন সংশয় থেকেই জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা থেকেই আসে দার্শনিকতার জন্ম। আজ আমরা কবিতার সেই দার্শনিকতায় পৌঁছে গেছি।

অষ্টম থেকে একাদশ স্তবক্

মূলকথা ঃ কবি আবার মনের ছিন্ন বীণাকে আহ্বান করে বলতে বলেছেন ঃ না, পৃথিবীতে মানুষের উচ্চতর সুখ আছে, আছে উচ্চ লক্ষ্য। শুধু কাঁদাবার জন্য বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করেননি।

সারা পৃথিবীই ত একটা বিশাল কর্মক্ষেত্র। এ সংসার ত একটা যুদ্ধক্ষেত্র। বীরবেশে যাও সেখানে। যুদ্ধ জয় কর। তাহলেই সুখ লাভ করবে।

পরের জন্য স্বার্থ বলি দাও, এ জীবন মন সবই দাও পরার্থে, এর চেয়ে সুখ আর কোথাও আছে কি? নিজের কথা ভুলে যাও দেখি।

পরের জন্য মৃত্যুতেও সুখ—আর সুখ সুখ করে কেঁদো না। যতই কাঁদবে আর যতই ভাববে ততই তোমার বেদনাভার বেড়ে যাবে।

আলোচনা ঃ কবি মনের ভাঙা বীণায় নতুন সুর চড়িয়েছেন। বীণা এখন আর ভাঙা নেই। হতাশাই ত বীণা ভেঙেছিল। আশা আবার তাকে জোড়া লাগিয়েছে। কবির মন এখন উদ্দীপ্ত। তাই উচ্চৈঃস্বরে বলতে বলেছেন তাঁর নবলব্ধ প্রত্যয়।

কি সে প্রত্যয়? প্রত্যয়টি হচ্ছে মানুষের আছে উচ্চতর সুখ, উচ্চ লক্ষ্য। কি সেই উচ্চ লক্ষ্য আর উচ্চতর সুখ? তাহলে এর আগে লক্ষ্য কি ছিল, কি ছিল সুখের স্বরূপ? কবি এখানে সেই লক্ষ্য বা সুখের কোন বর্ণনা দেননি। তবে উচ্চ ও উচ্চতর বিশেষণ দুটি প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায় যে কবি আগের সুখ ও লক্ষ্যকে নিম্ন ও নিম্নতর বলেছেন। কিন্তু তা কি?

সাধারণ মানুষের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে আত্মতৃপ্তি—সুখ বলতেও বোঝে ব্যক্তি-সুখকে। নিজেকে জড়িয়েই তার সবকিছু। পৃথিবীর যা কিছু ভাল তা ভোগ করব আমি—এখানেই ছিল এতদিনের প্রত্যাশা। এই আত্মসর্বস্বতা কখনই পরিতৃপ্ত হতে পারে না—কেননা চাইবার কোন শেষ নেই। কবি একেই বলেছেন সুখ সম্পর্কে ধারণার নিম্নস্তর। এ সুখ নিয়ে ব্যস্ত পশু; কিন্তু মানুষের জন্য এর চেয়ে অনেক বড় সুখ পড়ে আছে। আত্মসর্বস্বতা পরিতৃপ্ত হয়নি দেখে কাঁদবার জন্য বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করেননি।

তবে কিসের জন্য করেছেন? কবি বলছেন যে পৃথিবী এক সমরক্ষেত্র, লড়াই করার জায়গা। যে যত সুন্দরভাবে লড়াই করতে পারবে—সে তত সৌভাগ্য লাভ করবে। তোমার জন্য সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে। বসে না থেকে সৌভাগ্যকে লাভ করার চেষ্টা কর, একবার না পারলে হতাশায় ভেঙে পড়না—পাবেই তুমি পাবেই। ওরে বাবা, কে যাবে যুদ্ধে, যদি মরি বলে বসে থাকলে মরণকে এড়াতে পারবে না—মাঝখান থেকে জয়লাভের আনন্দ এবং সৌভাগ্য অর্জনের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হবে।

এ ত গেল সংগ্রামের আনন্দের কথা। কিন্তু সংগ্রামটি কিসের জন্য? সংগ্রামটিও হবে পরার্থে। পরের মঙ্গলের জন্য স্বার্থ-ত্যাগ কর। দেখবে এতে এমন এক আত্মতৃপ্তি লাভ করবে যা অখণ্ড—তাই পরিতৃপ্ত। নিজের কথা ভুলে যাও—পরার্থে ত্যাগ কর।

এমন কি, এ জন্য যদি আত্মত্যাগ কর, দেখবে তার মধ্যেও কম সুখ নয়। অতএব আত্মসুখের জন্য আর কেঁদো না। নিজের সুখের কথা যতই ভাববে, ততই তার হিসাব কষতে বসবে, ততই তোমার যন্ত্রণা বাড়বে।

প্রশ্ন

১. 'বল্ ছিন্ন বীণে,বল্ উচ্চৈঃস্বরে',—ছিন্ন বীণা আবার বলবে কিভাবে? তাকে কবি কি কথাই বা বলতে বলছেন?

২. 'না, না, না, মানবের তরে, আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর।' এই উচ্চতর সুখ ও উচ্চ লক্ষ্য কি? নিম্ন লক্ষ্য ও নিম্নতর সুখই বা কি?

৩. পৃথিবীকে সমর-অঙ্গন বলবার কারণ কি? সেখানে কি করলে সুখ পাওয়া যাবে?

৪. 'তার মতো সুখ কোথাও কি আছে? কিসের মত সুখের কথা বলেছেন কবি? অন্য কোনও রকম সুখের কথা কি আগে বলা হয়েছে?

৫. মরণেও সুখ কিসের জন্য? হৃদয়-ভার কিসে ক্রমেই বেড়ে ওঠে?

বারো থেকে সতের স্তবক

মূলভাব ঃ সুখের স্বপ্ন যদি ভেঙেই গিয়ে থাকে যাক না—স্বপ্ন অমন ভেঙেই থাকে। ঐ স্বপ্ন ত আলেয়ার মত। সে আলো যদি নিভেই গিয়ে থাকে যাক না। ঐ আলেয়ার আলোর জন্য পঙ্কিল পরিবেশে না ঘুরে গৃহে এস না।

যন্ত্রণার কথা বলছ? কিসের যন্ত্রণা? এত বিষাদই বা কিসের? আর যন্ত্রণা ও বিষাদ যদি থেকেই থাকে, তবু তা জগৎ ভরে জানিয়ে কি লাভ?

ও বিষাদ নিজের মনে লুকিয়ে রেখ। তবু কোন বিষাদ আর থাকে না। নিদারুণ অন্ধকারে যেমন তারা জ্বলে—ঐ বিষাদও তেমন আলো দেয়।

আর বিষাদ বিষাদ বলে কাঁদবেই বা কেন? জীবন ভরে এ কান্না কাঁদবেই বা কেন? মানুষের মন কি এতই অসার? এত সহজেই কি সে নুয়ে পড়ে?

সকলের হাসিমুখ দেখে কি তুমি কান্না ভুলতে পার না? পরের মঙ্গল করতে পারনা কি নিজের বিষাদকে চেপে রাখতে?

এ পৃথিবীতে কেউ নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকতে জন্মগ্রহণ করেনি—আমরা সবাই সকলের জন্য [আর এই পরার্থপরতাতেই পরম আনন্দ—চরম সুখ।]

আলোচনা ঃ কবি এখানে আবার হতাশ জীবনের কথা টেনে এনেছেন। বলছেন, স্বার্থপরতার সুখ ত আলেয়ার মত —ওত গৃহের মঙ্গলদীপ নয়। ওর জন্য কেন পাকে বিপাকে ঘুরবে? ফিরে এস গৃহে। এখানে গৃহ মানেই সত্য পথ—যেখানে আছে প্রকৃত শান্তি।

এর পরের বক্তব্যটি ভাল করে বোঝ। তোমার যন্ত্রণা বা বিষাদের কথা অন্যকে জানিয়ে কি হবে? তারা কি তোমার যন্ত্রণার ভাগ নেবে? তা যদি না হয়, তবে অন্যকে জানিয়েই বা কি লাভ? আর সত্যিই কি জগতে এত দুঃখ? এত যন্ত্রণা?

প্রকৃতপক্ষে আমরা অন্যকে নিজের দুঃখ জানাই মাত্র তার সহানুভূতি পাবার জন্য—এও এক ধরনের ভিক্ষা প্রবৃত্তি। এর থেকে আত্মরক্ষাও এক ধরনের সুখ। আমার বেদনা আমারই। তাই নিয়েই আমি হাসব, কাজ করব—কেউ বুঝবেও না যে আমার বুকের ভিতরে কি ভীষণ যন্ত্রণা অপেক্ষা করে আছে। অবসরে বুকের দরজা খুলে দেখব আমার যন্ত্রণাকে—যা শুধু আমারই। যন্ত্রণাকে এমনি করে ভোগ করার মধ্যেও রয়েছে একরকম সুখ। মনে রেখ এই কথা থেকেই কবি মানুষের মনের শক্তির কথায় চলে এসেছেন। 'মানবের মন এত কি অসার? এতই সহজে নুইয়া পড়ে?' না মানুষের মনের শক্তি অসীম। যদি তেমন দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান যায়—তবে মনকে কোন বিষাদই দীর্ণ করতে পারে না।

নিজের দুঃখকে এমনি করে চেপে রেখে যদি অন্যের মুখে হাসি ফোটান যায়—তবেই সুখ। এজন্য নিজের দুঃখকে চেপেও রাখা যায়।

এরপর কবি তার অনুভবের সাধারণী-করণ করেছেন। কবি এতক্ষণ যেসব চিন্তা পরপর ব্যক্ত করেছেন তা ত সকলেরই। সকলেরই তাই পরার্থপর হওয়া উচিত। তাই বলছেন, আমরা সকলেই সকলের জন্য করব—তবে সকলেই সুখী হব।

প্রশ্ন

১. 'গৃহে এসো, আর ঘুরো না পাঁকে'—পাঁকে ঘোরা বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন ? এখানে গৃহই বা কি ?

২. 'কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে ?' —কি জানানোয় লাভ নেই ? পরিবর্তে কি করবেন ?'

৩. 'হালে সুমধুর আলোক কত ?'—কে সুমধুর আলো ঢালে ? একথা কি প্রসঙ্গে বলা হল ?

৪. 'পার না মুছিতে নয়নধার ?' —কিভাবে নয়নধার মুছবার কথা বলেছেন কবি ?

৫. 'সুখ' কবিতার মূল বক্তব্য ৫/৬টি বাক্যে শেষ কর।

এই কবিতা থেকে নিচের উদ্ধৃতি-গুলোর ভাব-সম্প্রসারণ করবে। মন থেকে সমগ্র কবিতা মুছে ফেল। শুধু উদ্ধৃতির অর্থ থেকে মূলভাবটি জেনে নাও। পরে ভাব-সম্প্রসারণগুলো লিখে ফেল ঃ—**স্তবক-নবম, দশম, একাদশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ।**

কুমার চট্টোপাধ্যায়

সবচেয়ে মোটা মানুষ

পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা মানুষটির নাম ফ্রান্সিস ল্যাব। জন্ম ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইয়োয়া রাজ্যের ক্লিনটন শহরে। তিনি মাইকেল ওয়াকার নামেই পরিচিত ছিলেন। ওজন ১১৮৭ পাউণ্ড। ১৯৭২ সালে মি ল্যাব গলব্লাডারের প্রদাহে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাউস্টন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অস্ত্রোপচারের জন্য। কিন্তু হাসপাতালের দরজা দিয়ে মিঃ ল্যাবকে ঢোকানো গেল না। অবশেষে হাসপাতালের সামনে ফুটপাতে খাট পেতে তাকে শুইয়ে অপারেশন করতে হয়।

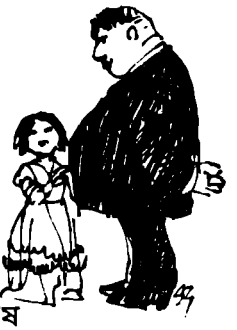

সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ

সব ক্ষুদ্রাকৃতি নর-নারীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি কে এ তথ্য পাওয়া গেছে সম্প্রতি। প্রাপ্তবয়স্ক বামনদের মধ্যে রাজকুমারী পলিন হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি। বাড়ি হল্যাণ্ডের ওমেনডেখট শহরে। ১৮৭৬ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি যখন পলিনের জন্ম হয় তখন তার দৈর্ঘ্য ছিল ১২ ইঞ্চি। ন বছর বয়সে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২১·৬৫ ইঞ্চিতে। এ সময় তার ওজন ছিল ১ কেজি ৫০ গ্রাম। ১৮৯৫ সালে ১ মার্চ তার মৃত্যু হয়। তখন তার ওজন দাঁড়িয়েছিল ৩ কেজি ৪০ গ্রাম আর দৈর্ঘ্য ১৯ ইঞ্চি। দেহের মাপ ছিল ১৮½"-১৯"-১৭"।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ● দ্বিতীয় পত্র

পাঠ সংকলন গদ্যাংশ

মেজদা ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় আমরা প্রথম দুই অনুচ্ছেদের আলোচনা করেছি। শ্রীকান্ত যদিও 'সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে' বলে উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য শুরু করেছে, তবু প্রথম দুই অনুচ্ছেদে মূল ঘটনার বর্ণনায় নামেনি। ঐ দুই অনুচ্ছেদে সান্ধ্য পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে। চরিত্রগুলির সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সে দিনের বিশেষ ব্যাপার ছিল, সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর থমথমে ভাব। আকাশ গাঢ় মেঘে ঢাকা – এজন্য আরও অন্ধকার। নাটকের কুশীলব (ছাত্র চার জন, পুরোহিত রামকমল ভট্টাচার্য, পিসেমশাই দ্বারিকবাবু এবং দারোয়ানরা) সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত অর্থাৎ অন্যমনস্ক। এই পরিবেশের কথা মনে রেখে আজকের পাঠ শুরু করা যাক।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ এই অনুচ্ছেদে শ্রীকান্ত পূর্ব-বর্ণিত বক্তব্যের একটা সংক্ষিপ্ত সার বর্ণনা করেছে। যে দিনের কথা সে বর্ণনা করতে বসেছে, সেদিন নাটকের মূল মঞ্চে বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত দুই বুড়ো আর ভিতরে 'গভীর-অধ্যয়নরত' চারটি প্রাণী।

লক্ষ্য কর, পরিবেশের অন্ধকারকে শ্রীকান্ত কেমন গভীরভাবে এঁকে দিতে চাইছে। এই অনুচ্ছেদেও সে 'বাহিরে ওই জমাট অন্ধকার' 'ভিতরে মৃদু দীপালোক'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যাটি যদি চন্দ্রালোকে ঝলমলে এবং পাঠটি যদি উজ্জ্বল আলোতে হত তবে পরবর্তী বিভ্রম সৃষ্টি হতে পারত না। ঐ বিভ্রম সৃষ্টির জন্যই লেখক গোড়া থেকে স্বল্পালোক ও অন্ধকার, তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও অন্যমনস্কতার পরিবেশ রচনা করে নিলেন।

আচ্ছা, 'আমরা চারিটি প্রাণী' বললেন কেন লেখক? মানুষ নিশ্চয়ই প্রাণী, কিন্তু তাকে 'প্রাণী' বলে বর্ণনা করার অর্থ হীন অর্থে প্রয়োগ করা। এমন করলেন কেন? মনে হয় এতক্ষণ 'আমাদের' পড়াশুনার যে চিত্র এঁকেছেন তিনি, তাতে আর যাই হোক, ছাত্র কজনকে খুব বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বলা যায় না—আর বিচারশীলতার জন্যই প্রাণীদের থেকে মানুষের পার্থক্য। সম্ভবত এ কথা ভেবেই শ্রীকান্ত (রসিকতা করেও বটে) নিজেদের প্রাণী বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন

১. 'সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে···। ভিতরে···' এখানে কোন রাত্রের কথা বলা হয়েছে? ঘরের 'ভিতরে-বাহিরে'র যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল, তা বল। [২+২]

২. 'ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।'—এই চারিটি প্রাণী কে কে? তাদের 'প্রাণী' বলা হল কেন? 'গভীর অধ্যয়নরত' বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন?

[২+২+৬]

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়, দ্বিতীয়

অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে যতীনদা একটা নাক-ঝাড়ার টিকিট পেশ করে আটটা তেত্রিশ মিনিট থেকে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত সময়ের জন্য বাইরে যাবার অনুমতি পেয়েছিল। তা দেখে ছোড়দা থুথু ফেলার টিকিট পেশ করলেন।—তা নামঞ্জুর করা হল। একটু অপেক্ষা করে ছোড়দা যেই তেষ্টা পাওয়ার টিকিট পেশ করল—সঙ্গে সঙ্গে মিলল—আটটা একচল্লিশ মিনিট থেকে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত বাইরে যাবার অনুমতি। ছোড়দা বেরিয়ে যেতে যতীনদা ঢুকল। অর্থাৎ যতীনদা প্রায় সাত মিনিট বাড়তি সময় বাইরে কাটিয়ে ফিরেছে। এবার শ্রীকান্তের পালা। চতুর্থ অনুচ্ছেদ শুরু হয়েছে তার কথা দিয়েই। মেজদা খাতায় যতীনদার টিকিট এঁটে রাখতেই শ্রীকান্ত তেষ্টা-পাওয়ার টিকিট পেশ করল। সে সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছে যে তেষ্টায় তার বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে। এখানে শ্রীকান্ত এমনই ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছে যে কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না ঐ সব তেষ্টা পাওয়া, নাকঝাড়া, থুথু-ফেলা ইত্যাদি আদৌ কোন সত্যব্যাপার নয় —কৃত্রিম অজুহাত মাত্র।

পরের বাক্যাংশ আরও চমৎকার! শ্রীকান্ত তৃষ্ণা পাওয়ার টিকিট পেশ করায় মেজদা খাতা মিলিয়ে বিচার করতে লাগলেন, সপ্তাহের আগের ক দিন পড়তে বসে শ্রীকান্ত যে পরিমাণ জল খেয়েছে, তাতে আজও তার তৃষ্ণা পাওয়া উচিত কি না! যেন তৃষ্ণাটাও বিচার করেই পেয়ে থাকে।

প্রশ্ন

১. 'কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম।'—কিসের টিকিট? 'কাজেই' বলবার তাৎপর্য কি? 'উন্মুখ হইয়া রহিলাম'—অপেক্ষার কারণ কি?

[১+২+১]

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ এই অনুচ্ছেদেই আকস্মিক ব্যাঘ্র-রহস্যের সূচনা হয়েছে। মেজদা হিসেব করেই চলেছেন। ইতঃমধ্যে ছোড়দা ফিরে এসেছে। অর্থাৎ আটটা সাতচল্লিশ মিনিটের পরের ঘটনা বর্ণনা শুরু হয়েছে। (কারণ ছোড়দার ছুটি ছিল ৮.৪৭ মিনিট পর্যন্ত এবং কখনই সে আগে ফেরেনি।) এমন সময় শ্রীকান্তের পিঠের কাছে (আমাদের সম্ভাব্য নক্সায় দেখ, শ্রীকান্ত দরজার দিকে পেছন দিয়ে বসেছে।) একটা 'হুম' শব্দ। যতীনদা এবং ছোড়দা ছিল দুপাশে। তারাই প্রথম শব্দ উৎসের দিকে তাকাল এবং দরজার সামনে এক বাঘকে বসে থাকতে দেখে (অমনি আর এক ছদ্মবেশী ব্যাঘ্র —মেজদার ভয় ভুলে) 'ওরে বাবারে, খেয়ে ফেল্লেরে' বলে চিৎকার শুরু করল।

সেই চিৎকারে মেজদা মুখ তুলে তাকালেন। কি করছিলেন তিনি? গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখছিলেন যে শ্রীকান্তকে ছুটি দেওয়া যায় কি না। এই তন্ময়তার মধ্যেই দুই ভাই-এর চিৎকারে মুখ তুললেন তিনি। সামনেই দরজা। দরজার সামনে পাপোষের ওপর ওটা কি বসে? যতীনদা বা ছোড়দার মত চিৎকারের ক্ষমতাও রইল না মেজদার। তাঁর একেই ছিল ফিটের ব্যামো—তার ওপর ঐ বিচিত্র পরিস্থিতি। তিনি ১. মুখে বিকট আওয়াজ তুললেন, ২. বিদ্যুৎবেগে সামনে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর পা দুটি, ৩. ফলে উল্টে গেল সেজবাতি, ৪. তিনি মুখ দিয়ে আঁ আঁ আওয়াজ করতে করতে চিৎ হয়ে পড়লেন এবং ৫. ফিট হলেন।

বুঝতেই পারছ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ-গুলোতে মন্থরগতিতে পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে লেখক এই অনুচ্ছেদে দ্রুত মূল ঘটনা বর্ণনায় নেমেছেন। এই অনুচ্ছেদ থেকে পরের পাতার প্রশ্নগুলোর উত্তর করার চেষ্টা কর।

প্রশ্ন

১. বাঘ দেখে যতীনদা এবং ছোড়দা যে চিৎকার করেছিল, লেখক তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কি কি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন ? বিশেষণগুলো ব্যবহারের তাৎপর্য বল।

২. মেজদা বাঘ দেখবার পর কি কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন ?

৩. 'আর খাড়া হইলেন না'-কে খাড়া হইলেন না ? কেন খাড়া হইলেন না ? শুইবার আগে তিনি কি কি করেন ?

৪. যখন যতীনদা ও ছোড়দা বাঘ দেখে তখন মেজদা কি করছিলেন ? ওর চিৎকার শুনে তিনি কি কি করলেন ?

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ মেজদা প্রদীপ উল্টে দিতেই অন্ধকার কাণ্ড শুরু হল। শ্রীকান্ত তখনও জানে না কি দেখে যতীনদা ও ছোড়দা চিৎকার করেছিল, অন্ধকারের মধ্যে কে কি করেছে তাও সে জানে না। স্বাভাবিক চিন্তা থেকেই সে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে বেরিয়ে সে দেখল, পলায়নপর দুই পুত্র (যতীনদা ও ছোড়দা) পিসেমশাই-এর কাছে বন্দী হয়েছে। তারাও সম্ভবত অন্ধকারে ছুটে বাইরে যাচ্ছিল। তাদেরই চিৎকারে তন্দ্রাচ্যুত পিসেমশাই সামনে দিয়ে পলায়নরত দুই ছায়ামূর্তিকে কোন বিবেচনা না করেই চেপে ধরেছিলেন। ফলে ওরা দুজনেও প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল। হয়ত ওরা বলছিল, 'ওরে বাবারে কিসে ধরলরে, গেছিরে' অথবা বলছিল, 'ছাড় বাবা ছাড়, বাঘ বেরিয়েছে।' পিসেমশাই চেঁচাচ্ছিলেন, দারোয়ানদের নাম ধরে বা বন্দুক সড়কি নিয়ে আসতে বলছিলেন। কারও কোন কথাই শোনা যাচ্ছিল না। তিনজনের মিলিত চিৎকারে একটা বিচিত্র আওয়াজ মাত্র উঠছিল।

সুন্দর ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন শরৎচন্দ্র, (শ্রীকান্তের জবানীতে) 'এ যেন তিন বাপ-ব্যাটা কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।'

এই পংক্তিটি ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ নির্দেশ কর।

২. এই তিন বাপ-ব্যাটা কে কে ?

৩. কেন তারা হাঁ করেছিল।

৪. একে লড়াই বলবার কারণ কি ?

৫. এর ভিতরে লেখকের যে ব্যঙ্গ উৎক্ষিপ্ত রয়েছে, তা বুঝিয়ে বল।

এই প্রশ্নগুলোর প্রথমটিতে রচনা ও রচয়িতার নাম এবং ঘটনার সূত্র বর্ণনা করতে হবে। তিন বাপ-ব্যাটা যে যতীনদা, ছোড়দা আর শ্রীকান্তের পিসেমশাই দ্বারিকবাবু এ তোমরা জান। আতঙ্কে চিৎকার করছে সবাই। সকলেই নিজের চিৎকারকে সবচেয়ে বড় করে তুলতে চাইছে। চিৎকার ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠছে। জয়ের আকাঙ্ক্ষা সকলেরই। একে লড়াই ছাড়া আর কি বলা যাবে।

শ্রীকান্ত প্রথমাবধিই এদের সকলের প্রতি বিরূপ। তার সমস্ত সমর্থন ও সহানুভূতি আপাতঃ নিন্দিত ইন্দ্রের ওপর। তার স্কুলে পড়া বিদ্যের ছাপ নেই। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে সে অনেক পূর্ণ মানবত্বের অধিকারী। তার পাশে মেজদা বা দ্বারিকবাবু বা অন্যেরা অনেক বেশি অন্তঃসারশূন্য। অথচ সমাজে তারাই প্রতিপন্ন—তারাই মর্যাদার অধিকারী। তাদের অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় জেনেই শ্রীকান্ত এই ব্যঙ্গ করেছে। এখানে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাতেই তাদের বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। যে পা-

পোষের ওপর বাঘ দেখেছে যতীনদা আর ছোড়দা, অন্ধকারে তার পাশ দিয়েই ছুটে এসেছে তারা—অন্ধকারে কিছুই না দেখে না বুঝে বৃদ্ধ পরিণতবুদ্ধি দ্বারিকবাবু দুই পুত্রকে দুহাতে চেপে ধরে চেঁচিয়েই চলেছেন। কোন কাজেই কারও কোন বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় ফুটে উঠছে না। একেও যদি ব্যঙ্গের বস্তু মনে না করা হয় তবে বুঝি বা পৃথিবীতে ব্যঙ্গের বস্তু নেই বললেই চলে।

অনুচ্ছেদ সাত থেকে বার : এই অংশ রহস্য উদ্ঘাটনের প্রথম পর্ব বলা যায়। এই অংশ শুরুর আগের অবস্থাটা মনে করে নাও। শ্রীকান্তের পিঠের কাছে 'হুম' শব্দ হল। যতীনদা ছোড়দা চিৎকার করল। মেজদা মুখ তুলেই ওঁা ওঁা চিৎকার করে পা ছড়িয়ে সেজবাতি উল্টে ফিট হলেন। অন্ধকারে শ্রীকান্ত বাইরে এসে দেখল তিন বাপ-ব্যাটার হাঁ করার প্রতিযোগিতা। কিন্তু কে যে যতীনদা ও ছোড়দাকে খেয়ে ফেলছিল আর কি দেখেই বা মেজদা চোখ ওল্টালেন তা এখনও রহস্যে—শ্রীকান্ত কিছুই জানে না।

এই অবস্থায় সিপাই (দারোয়ান)-দের কথায় বোঝা গেল যে একটা চোর অন্ধকারে পালাচ্ছিল—তারা তাকে ধরে ফেলেছে। একথা শুনে পিসেমশাই যে কাণ্ডটি করলেন তাতে তাঁকে বুদ্ধিসম্পন্ন কর্তা বলা যায় না। তিনি সার্কাসের ক্লাউনের মত প্রচণ্ড চিৎকার করে হুকুম দিতে থাকলেন, 'আউর মারো—শালাকো মার ডাল—' চোর কি করে 'শালা' হ'ল, আর ধরা পড়া চোরকে যে একেবারে মেরেই ফেলতে হবে এ নির্দেশেরই বা তাৎপর্য কি, তার কিছুই বোঝা যায় না। এটুকু বোঝা যায় বিচারবোধহীন মানুষ যখন গুরুদায়িত্ব লাভ করে, তখন এই রকম সদম্ভ আস্ফালন ও অকারণ ক্ষমতা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই হয় না।

হুকুম পেয়ে দারোয়ানরা সত্যি সত্যিই চোরকে মেরে ফেলার উপক্রম করল। চিৎকার চেঁচামেচিতে চাকর-বাকর ও আশপাশের লোকজন ছুটে এল। আলোও এল প্রচুর। ওরা চোরকে টেনে এনে ফেলল আলোর সামনে। এবার আলোতে আধমরা চোরের মুখ দেখে সকলে আঁৎকে উঠলেন—তিনি আর কেউ নয় ভট্টাচার্যি মশাই।

এবার জল-বাতাস গায়ে মুখে হাত বুলান শুরু হল। ঘরে মেজদাকে, বাইরে ভট্টাচার্যি মশাইকে। ভট্টাচার্যি মশাই সুস্থ হলে তাঁকে প্রশ্ন করা হল, তিনি ছুটছিলেন কেন তা জানবার জন্য। তিনি সংক্ষেপে মূল কথা যা বললেন, তা হল এই যে তিনি ভয়ে ছুটছিলেন। অবশ্য এসব না বলে, তিনি বলছিলেন ভয়ের কারণ। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে বাঘ নয়, একটা মস্ত ভাল্লুক লাফ মেরে বৈঠক-খানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। (এবং তাই দেখে তিনিও য পলায়তি···)।

ছোড়দা যতীনদা ঘোরতর প্রতিবাদ করলে। তারা যে প্রদীপের আলোতে স্পষ্ট দেখেছে হুম করে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষে বসেছে এক মস্ত বাঘ। তারপরেই আর এক নতুন শব্দ যোগ করল তারা 'নেকড়ে বাঘ'। (বোঝা যাচ্ছে, বাঘ এবং নেকড়ে বাঘ যে এক নয়—এ ধারণা তাদের নেই।)

এই বিসম্বাদে প্রায় বিচারকের গাম্ভীর্য নিয়ে যেন শেষ কথা বলে দিলেন সদ্য ফিট ভাঙা মেজদা, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার! (আহারে! যেন একেবারে ব্যাঘ্র বিশেষজ্ঞ। ওটা যে একেবারে সুন্দরবন থেকে ভাগল-পুরে হাওয়া খেতে এসেছে তাও বুঝে ফেলেছেন মেজদা। আবার লক্ষ্য করেছ ত', রয়েল বেঙ্গলের আগে 'দি'

আর্টিকেলটি। হুঃ হুঃ বাবা। মেজদার কাছে চালাকি নয়। ভেবেচিন্তেই বলি আর ফিট থেকে উঠে না ভেবেই বলে ফেলি—ভুলটি পাবে না। তবু কিনা পরীক্ষকেরা···যাক গে, যাক গে ওসব দুঃখের কথা।)

অনুচ্ছেদ তের থেকে পনের ঃ এই অংশে রহস্য চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। শুরু হয়েছে অনুসন্ধান। সকলেই বুঝেছেন, মেজদার দি রয়েল বেঙ্গলই হোক আর যতীনদা ছোড়দার নেকড়ে বাঘই হোক আর ভট্টাচার্যি মশাই-এর মস্ত ভাল্লুকই হোক; সেটা এলই বা কোথা দিয়ে, আর গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখেছে তখন একটা কিছু ত বটেই, কিন্তু সেটা কি?

এখানে, তোমাদের বুঝবার জন্য একটা প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। যাই এসে থাকুক তাকে দেখেছে এক যতীনদা ছোড়দা দুই মেজদা, তিন ভট্টাচার্যি মশাই। কিন্তু তিনজন তিনরকম বলছেন কেন?

বুঝলাম, ছোড়দা যতীনদা এবং মেজদাদের বিশেষণগুলো (নেকড়ে, দি রয়েল বেঙ্গল) বাদ দিলে আদতে তারা একটা 'বাঘ' দেখেছে, এ কথা বোঝা যায়। অতএব প্রকৃতপক্ষে এদের বিবৃতির মধ্যে ফাঁক নেই। বিশেষণগুলো অজ্ঞতাজনিত অপপ্রয়োগ। কিন্তু ভট্টাচার্যি মশাই ভাল্লুক বললেন কেন? একি তাঁর আফিং-এর নেশার ফল?

আসলে কিন্তু তা নয়। শরৎচন্দ্রের গল্প রচনায়, কাহিনী পরিকল্পনায় কোন ফাঁক নেই। এককালে বৃদ্ধেরা তাদের শারীরিক কারণে আফিং খেতেন—নেশার জন্য নয়। তাতে যে সামান্য নেশা বা ঝিমুনি আসত—তা অলীক কল্পনা দেখবার মত অবস্থায় নিত না। ভট্টাচার্যি মশাই-এর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তিনি ঝিমুচ্ছিলেন। যতীনদা ছোড়দার চিৎকারে জেগে ওঠেন। ইতঃমধ্যে মেজদা বাতি উল্টিয়ে দিয়ে ফিট হলেন। বেগতিক দেখে ছিনাথ বহুরূপী আর পাপোষে বসে থাকবার অবকাশ পেল না। সে উঠে পালাল। কিন্তু কিভাবে? নিশ্চয়ই হামাগুড়ি দিয়ে নয়—দৌড়ে। এখন, আবছা অন্ধকারে ভট্টাচার্যি মশাই যদি দেখেন, লোমওয়ালা একটা মস্ত কি মানুষের মতই পায় হেঁটে তাঁর সামনে দিয়ে পালাল, তাহলে তিনি তাকে কি ভাববেন? নিশ্চয়ই ভাল্লুক। এবং এ জন্যই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন ভাল্লুক, বাঘ নয়। কারণ বাঘ আর যাই করুক দুপায়ে হাঁটে না।

কিন্তু মেজদা এবং তার ভাইয়েরা তা মানবে কেন! তারা যে প্রদীপের আলোতেই 'বাঘ' দেখেছে।

এই অবস্থায় কিশোরী সিং 'উহ্ বয়ঠা' বলে এক লাফে বারান্দায় উঠল। তখন উঠোন বোঝাই লোক। বাড়ির লোক, চাকর-বাকর এবং আগত প্রতিবেশিবৃন্দ। সকলেই ঐ অমীমাংসিত হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে ঠেলাঠেলি করে বারান্দায় এবং পারলে ঘরে ঢুকতে চায়।

এ'রাও যেমন বিবেচনাহীন কাণ্ডকারখানা করতে থাকলেন, পিসেমশাইও তেমনি চেঁচিয়ে চললেন, সড়কি লাও—বন্দুক লাও।

বন্দুক কোথায়? পাশের গগনবাবুদের বাড়িতে একটা প্রাচীন মুঙ্গেরি গাদা বন্দুক ছিল—সম্ভবত সেটার কথাই বললেন। আর বন্দুক না থাকলেই বা কি! দ্বারিকবাবু কি আর সত্যি সত্যি বন্দুক আনবার জন্যই আদেশ দিচ্ছিলেন! ঐ সময় কর্তৃত্ব দেখাতে তাঁর চেঁচান দরকার—তাই চেঁচাচ্ছিলেন তিনি। অনায়াসে তিনি কামান লাও এমন কি রকেট লাও বলেও চেঁচাতে পারতেন।

যা হোক, হিংস্র জন্তুর ভয় দ্বারিকবাবুর

অর্থশূন্য চেঁচানর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী অতএব হিন্দুস্থানীরা স্তব্ধ—যারা বাড়ি ঢুকেছিল তারাও। সেই আতঙ্কিত পরিমণ্ডলে – ভূতগ্রস্তের মত চেঁচিয়ে চলেছেন একমাত্র দ্বারিকবাবু।

সাত থেকে পনের অনুচ্ছেদের বর্ণনা থেকে যেসব প্রশ্ন দেওয়া যেতে পারে, তা নিচে দেওয়া হল :

ইংরেজ শক্তি তাঁর স্বাধীনতার প্রচেষ্টা ধ্বংস করে দেন। কিন্তু মুঙ্গেরের কর্মকারেরা এক ধরনের বন্দুক নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করে। এতে বারুদ গেদে পলতেয় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়তে হত। এ জন্যই এর নাম হয় গাদা বন্দুক। ইংরেজদের অস্ত্র আইনের দৌলতে এবং গুলির বন্দুকের চল হওয়ায় গাদা বন্দুকের কালও যায়, ইজ্জতও যায়।

প্রশ্ন

১. 'দেউড়ির সিপাহিরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।' কাকে ধরে ফেলেছে? কি অবস্থায় ধরেছে? [১+২]

২. 'তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল।' কখন কারা এই চোরকে ধরেছিল? কখন চোরের মুখ দেখা হল? চোরের মুখ দেখে বাড়িশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাল কেন? তখন তারা কি করলেন? [৩+২+৩+২]

৩. 'ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার।' সেই ব্যাপার বলতে কোন ব্যাপারকে বোঝান হয়েছে? মেজদাকে নিয়ে সেই ব্যাপার কেন? [২+২]

৪. 'কিন্তু সে কোথায়'—সে কে? 'কিন্তু' বলবার কারণ কি?

৫. এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই।'—এখানে 'সে' কে? এতগুলো বলতে কাকে কাকে. বোঝান হয়েছে? নিশ্চিত না বলে 'একটা কিছু' বলবার কারণ কি? তার প্রকৃত পরিচয় কিভাবে জানা গেল? [১+৩+৩+৩]

৬ 'তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না।'—কার লেখা কোন রচনা থেকে গৃহীত? বিশ্বাস করা না করার কারণ কি? [২+২]

৭. নিচের বাক্যগুলোর প্রসঙ্গ নির্দেশ কর : [প্রতিটি ৩ নম্বর]

ক. এক লাফে বারান্দার উপর।

খ. জনপ্রাণী আর সেখানে নাই।

গ. কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না।

ঘ. লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর।

এই অংশ থেকে 'মুঙ্গেরি বন্দুক' শব্দটির টীকা লিখতে দেওয়া যেতে পারে।

তোমরা জান, মীরজাফরআলি খাঁর পর তাঁর জামাই মীর কাশিমআলি খাঁ বাঙলার নবাবী পদ লাভ করেন। তিনি ইংরেজদের হাত এড়াবার জন্য মুঙ্গেরে তুলে নিয়ে যান বাঙলার রাজধানী এবং মুঙ্গের দুর্গে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের কারখানা করেন।

এই অংশ থেকে নিচের ব্যাকরণগত টীকাগুলো দেখে রাখবে।

তন্দ্রাভিভূত : সন্ধি—তন্দ্রা + অভিভূত। সমাস : তন্দ্রা দ্বারা অভিভূত যে (বহুব্রীহি সমাস)। এখানে তন্দ্রা দ্বারা অভিভূত (কর্মবাচক বা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ) না লেখাই ভাল। লিঙ্গান্তর : তন্দ্রাভিভূতা।

দীপালোক : সন্ধি—দীপ + আলোক। সমাস : দীপ-সৃষ্ট আলো (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)। এটাকে দীপের আলোক : ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস না করাই ভাল। চন্দ্রালোক বা সূর্যালোক কিন্তু ষষ্ঠী তৎপুরুষ হবে। কারণ, আলোকটা প্রদীপের নিজের নয়।

বুকফাটা (বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার) : একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদে মায়ের বুক ফেটে গেল।

আইন-সঙ্গত : সমাস—আইনের দ্বারা সঙ্গত (করণবাচক বা তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস)।

কাল-পরশু : সমাস—কাল ও পরশু (দ্বন্দ্ব সমাস)।

পরিমাণ : পদান্তর : পরিমিত।

আর্তকণ্ঠ : আর্ত যে কণ্ঠ (কর্মধারয় সমাস)। আর্ত : পদান্তর = আর্তি।

গগণভেদী : গগণকেও ভেদ করে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)।

বিদ্যুৎবেগে : বিদ্যুতের ন্যায় বেগ (উপমান কর্মধারয় সমাস) + এ।

দক্ষযজ্ঞ : ভারতীয় পুরাণে দিকপাল রাজ্যেশ্বরদের প্রজাপতি বলা হয়েছে। কথাটার অর্থ সম্রাট হওয়াও সম্ভব। দক্ষ ছিলেন এমন এক প্রজাপতি। ইনি মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। এঁর 'সতী' নামে এক কন্যার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ হয়। কিন্তু কোন এক সভায় দক্ষ উপস্থিত হলে মহাদেব উঠে দাঁড়াননি, এই অপরাধে দক্ষ এক সভা আহ্বান করে জামাতা মহাদেবকে বাদ দিয়ে সকল দেবতাকে আহ্বান করেন।

মহাদেবের গৃহিণী কিন্তু পিতৃগৃহে আসেন। সতীর সামনে শিবনিন্দা শুরু করেন দক্ষ। অভিমানিনী সতী এতে যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। মহাদেবের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে ক্রোধোন্মত্ত মহাদেব বীরভদ্র নামে তাঁর এক অনুচরকে পাঠান। বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেন। দক্ষের ছিন্ন শির অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়। দক্ষের যজ্ঞের মাঝে এই তাণ্ডব ও বিপর্যয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পণ্ড আয়োজন এবং বিশৃঙ্খল ব্যাপারকে দক্ষযজ্ঞ বলা হয়। মেজদা প্রদীপ উল্টিয়ে অজ্ঞান হওয়ার পর থেকে প্রশান্ত অধ্যয়ন পরিবেশে যে এক ভূতের নৃত্য শুরু হল—সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

ঠেলাঠেলি : ঠেলে ঠেলে যে কাজ (ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস)।

তিন **বাপ-ব্যাটার** কে কতখানি হাঁ করিতে পারে (কারক বিভক্তি) কর্তায়-এর বিভক্তির প্রয়োগ।

চোর : পদান্তর : চৌর্য, চোরামি।

প্রকৃতিস্থ : প্রকৃতিতে স্থিত (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)।

পা-পোষ : বিদেশী আগন্তুক শব্দ। ফরাসী থেকে আগত। এখানে 'ষ'-র বদলে 'শ' লেখা সঙ্গততর।

নিমীলিত চক্ষে : নিমীলিত যে চক্ষু (কর্মধারয় সমাস) + এ।

নিমীলিত : (বুৎপত্তি) নি-√মীল্ (চোখ বোঁজা) + ও (কর্মবাচ্য) বিশেষণ। পদান্তর : নিমীলন। বিপরীত : উন্মীলিত।

ব্যাকরণ

এবারে আমরা ব্যাকরণের একটা নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। এই অধ্যায়কে বলা যেতে পারে **শব্দ-গঠনের** অধ্যায়।

তোমরা জান ভাষার মূল হল ধ্বনি। ধ্বনিগুলোর অর্থ নেই। ঐ সব অর্থহীন ধ্বনিকে এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে শব্দে পরিণত করা হয়। শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ আছে। একটা গোষ্ঠী সমাজে সে অর্থ মানে।

এই শব্দকেই আমরা নানাভাবে প্রয়োগ করে আমাদের ভাব-ভাবনা অন্যের কাছে প্রকাশ করি। তা হলে বলা যায় ভাষার মূল ধ্বনি হলেও আমরা সাধারণ মানুষেরা কারবার করি শব্দ নিয়ে। যে মানুষের যত বেশি শব্দ জানা আছে, তার পক্ষে ভাব-ভাবনা ভাষায় প্রকাশ করা তত সহজ। দেখ না, ইংরাজী লিখতে গিয়ে তোমার অত আটকে যায় কেন? কারণ প্রথমেই তুমি জান অল্প শব্দ। উপযুক্ত শব্দটিই খুঁজে পাও না, তার ওপরে ত শব্দগুলোকে সাজাবার কৌশলটাও জানা নেই তেমন।

যা হোক, এই অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝবে যে, তোমার ক্ষেত্রেও যা সত্যি একটা ভাষার ক্ষেত্রেও তা সত্যি। যে ভাষার শব্দভাণ্ডার যত বেশি সেই ভাষা তত সমৃদ্ধ—সেই ভাষা তত সুন্দরভাবে, তত নিখুঁতভাবে, তত সূক্ষ্মভাবে ভাবনা প্রকাশ করতে পারে।

আমাদের মাতৃভাষা এদিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ। কিন্তু কোন কোন গুণে একটি ভাষা সমৃদ্ধ হয়? ব্যাকরণবিদেরা দেখেছেন যে ভাষার মূল শব্দভাণ্ডার বড় এবং নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা আছে—সেই ভাষাই সমৃদ্ধ হয়। বাঙলা ভাষার দুটি গুণই আছে। বাঙলা ভাষা সংস্কৃত (আরও শুদ্ধ করে বললে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা) থেকে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছে। শুধু সংস্কৃত থেকে নয়, চলতি পথে যে ভাষাই তার কাছাকাছি এসেছে, সেই ভাষা থেকেই নির্বিচারে গ্রহণ করেছে শব্দ। আর অন্য দিকে সংস্কৃত ভাষা থেকে গ্রহণ করেছে নতুন নতুন শব্দ গঠন করবার রীতিগুলি। এইসব রীতিকে সে নিজের মত করে খানিক খানিক পরিবর্তিতও করে নিয়েছে। ফলে প্রয়োজন মত শব্দ তৈরি করে নিতে আর আটকায় না। এরপর কে আটকাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ হতে?

আজ আমরা বাঙলা ভাষার এই অনন্য-সাধারণ গুণ নতুন শব্দ গঠনরীতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব।

বাঙলা ভাষার নতুন শব্দ গঠনের রীতি প্রধানত দুরকম। ১. প্রচলিত কোন শব্দের ল্যাজে মুড়োয় কতকগুলি ইঙ্গিতবহ ধ্বনি যোগ করে শব্দের অর্থ বদলে নতুন অর্থ সৃষ্টি করা যায়—আর নতুন অর্থ হওয়া মানেই নতুন শব্দ হওয়া। ২. একের বেশি শব্দকে একত্রে বিশেষভাবে মিলিয়ে নতুন অর্থ তৈরি করা। প্রথম রীতির আবার দু'টি পর্ব আছে। ইঙ্গিতবহ ধ্বনি শব্দের সামনে লাগালে বলি উপসর্গ যোগ করা, পেছনে লাগালে বলি প্রত্যয় যোগ করা। দ্বিতীয় রীতিকে বলি সমাস গঠন। অর্থাৎ উপসর্গ-প্রত্যয় যোগে বা সমাস নিযুক্ত করে

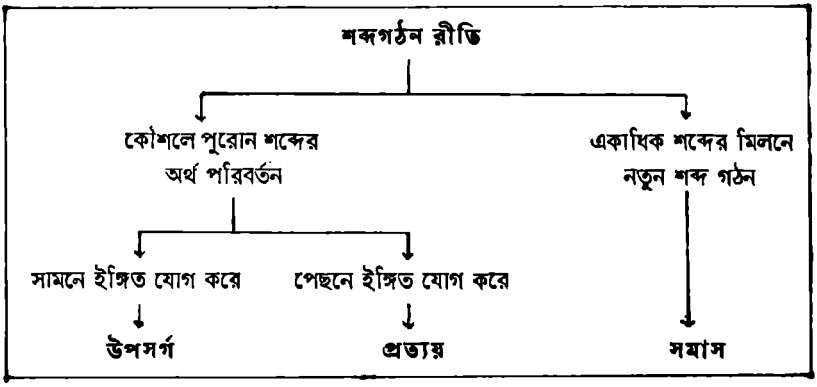

আমরা নতুন শব্দ গঠন করে থাকি।

এখন আমরা শুধু প্রত্যয় সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমেই প্রশ্ন করবে, প্রত্যয় কি ?

আগের আলোচনা থেকে, এর কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছ। লক্ষ্য কর, আমরা বলেছি ১. এগুলি শব্দের পেছনে (ব্যাকরণে একে শব্দের উত্তরে বলা হয়) যোগ করা হয়। ২. যোগের ফলে শব্দের অর্থ বদলে যায়। ৩. অর্থ বদলাবার একটা বিশেষ ইঙ্গিত দেয় প্রত্যয়টি এবং সেই অনুযায়ী অর্থ বদলায়। একটা কথা যদি বুঝে থাক, তবে প্রত্যয় কাকে বলে তা বুঝে গেছ।

দেখ, প্রত্যয় হচ্ছে এক বা একের বেশি ধ্বনির সম্মেলন। ধ্বনি সম্মেলনই ত শব্দ। প্রত্যয়ে ধ্বনির সম্মেলন হয় বটে কিন্তু তার অর্থ নেই। তবে যে কোন অর্থহীন ধ্বনি সম্মেলনকেই প্রত্যয় বলা যায় না। প্রত্যয়ের মধ্যে অর্থ পরিবর্তনের ইঙ্গিতটি নিহিত থাকে।

শব্দ বা ধাতুর উত্তরযুক্ত হয়ে, ঐ শব্দ বা ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, তাকে প্রত্যয় বলে।

লক্ষ্য কর, প্রত্যয় কখনও যোগ হয় শব্দের উত্তর, কখনও যোগ হয় ধাতুর উত্তর। মনে রেখ, শব্দের উত্তর যোগ হলে তাকে **তদ্ধিত প্রত্যয়** আর ধাতুর উত্তর যোগ হলে তাকে **কৃৎপ্রত্যয়** বলে।

যেমন, √চল্ + অন = চলন। 'এখন এমন ঘড়ির চলন হয়েছে'। এখানে চলন একটা কৃদন্ত শব্দ এবং অন একটা কৃৎ-প্রত্যয়।

কিন্তু, কৃৎ প্রত্যয় যোগ করার পরেও যদি কৃদন্ত অংশ একটা ধাতুই থাকে, অর্থাৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দটিকে ধাতু হিসেবে গ্রহণ করে একটা ক্রিয়াপদ তৈরি করা হয়, তবে ঐ ক্ষেত্রে প্রত্যয়টিকে **ধাত্বাবয়ব** বা **ধাতু অংশ** বলে। যেমন, √দেখ্ + আ = দেখা। (সে দেখায় বা আমি দেখাইব)। শব্দের সঙ্গে কোনও প্রত্যয় যোগ হয়ে তাকে ধাতুতে পরিণত করলে ঐ প্রত্যয়কেও ধাত্বাবয়ব বলে। যেমন, চমক্ + আ = চমকা > তাহাকে দেখিয়া আমি চমকাইয়া গেলাম।

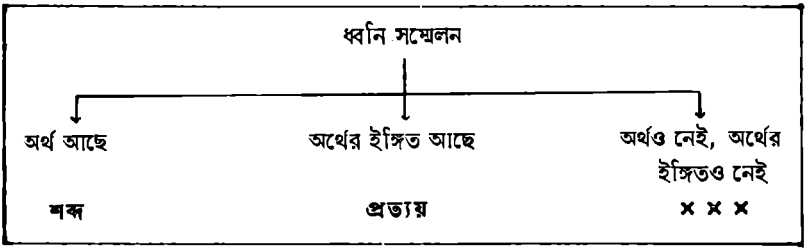

[মনে রেখ, উপসর্গও প্রত্যয়ের মত অর্থহীন অথচ ইঙ্গিতবহ ধ্বনি সম্মেলন। এদের মধ্যে পার্থক্য এই যে উপসর্গ শব্দের আদিতে বসে, প্রত্যয় বসে পেছনে।]

এবারে তাড়াতাড়ি তোমাকে প্রত্যয়ের একটা সংজ্ঞা বাক্য দেওয়া যাক।

অর্থহীন অথচ অর্থের ইঙ্গিতবহ যে ধ্বনি (বা ধ্বনি-সম্মেলন) কোন

নাম-শব্দ বা সাধিত শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত শব্দকে বলে তদ্ধিতান্ত শব্দ। যেমন, সাধু + তা = সাধুতা। এখানে 'তা' তদ্ধিত প্রত্যয় এবং সাধুতা তদ্ধিতান্ত শব্দ।

প্রত্যয়গুলো নানা উৎস থেকে বাঙলায় এসেছে। এই উৎসের দিকে তাকিয়ে প্রত্যয়গুলোকে ১. সংস্কৃত, ২. বাঙলা এবং ৩. বিদেশী এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সংস্কৃত ও বাঙলা প্রত্যয় তদ্ধিত ও কৃৎ দু রকমের হয়। বিদেশী প্রত্যয় কৃৎ হয় না, শুধু তদ্ধিত হয়।

কৃৎ প্রত্যয় দু প্রকার। সংস্কৃত ও বাঙলা।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

—শতৃ ঃ করিতেছে বা করিয়া থাকে অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। —শতৃ প্রত্যয়ের 'অন্ত' বা অৎ অবশিষ্ট থাকে। বাকি অংশ ইৎ বা লুপ্ত হয়। পুংলিঙ্গে একবচনে শতৃ অন্ত পদ অন হয়, স্ত্রীলিঙ্গে অতী বা অন্তী আর ক্লীবলিঙ্গে অৎ হয়। যেমন,

√অস্ + শতৃ = সন্ত্ / সন্, সতী, সৎ।

√মহ্ + শতৃ = মহন্ত / মহান্, মহীত, মহৎ।

√ভূ = ভবান, ভবতী, ভবৎ ॥

√চল্ = চলৎ √জ্বল্ = জ্বলৎ ॥

√জাগৃ = জাগ্রৎ ॥ √গল্ = গলৎ ॥

—শানচ্ ঃ এই প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতু ঘটমান কালের অর্থ বোঝায়। এই প্রত্যয়ের 'শ' এবং 'চ' অংশ লোপ পায়। ধাতুর সঙ্গে—অন অংশ যুক্ত হয়। যেমন, √বিদ্ + শানচ্ = বিদ্যমান। √মৃ = ম্রিয়মান। √শী = শয়ান ॥ √আস্ = আসীন ॥ √মুহ্ = মুহ্যমান ॥ বি—√রাজ্ + শানচ্ = বিরাজমান।

নাম ধাতুর উত্তরেও এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন,—শব্দায় + শানচ্ = শব্দায়মান ॥ ধূমায় = ধূমায়মান। দণ্ডায় + শানচ্ = দণ্ডায়মান।

—ণক ঃ এই প্রত্যয়ের 'ণ' অংশ লোপ হয়। ধাতুর সঙ্গে অক যুক্ত হয়। এ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে যুক্ত হয়। এর ফলে পদটা বিশেষ্য পদ হয়। যেমন √গৈ + ণক = গায়ক। √দৃশ্ + ণক = দর্শক। √লেখ্ + ণক = লেখক। অনুরূপ, কৃষক, পাচক, শাসক, ঘাতক, দায়ক, কারক, ধারক, নাশক, পাঠক, চালক, পালক ॥ প্র—√তৃ + ণক = প্রতারক। সম্—√পাদি + ণক = সম্পাদক ॥ পরি √ব্রজ্ + ণক = পরিব্রাজক। শোষক, পাচক, সেচক, শিক্ষক, পরীক্ষক, জনক, অধ্যাপক।

গদ্য সহায়ক পাঠ

গল্প সংকলন ঃ অনধিকার প্রবেশ

আমরা গত সংখ্যায় এই গল্পের দশম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। তাতে জয়কালীর ব্যক্তিত্বের একটি দিকই প্রধান হয়ে উঠেছিল। তিনি খুবই রাশভারী প্রকৃতির মহিলা। তাই তিনি বহুজনের ওপরে নিজেকে সুন্দরভাবে আরোপ করতে পারতেন। নীরবেই বহু সমস্যার সমাধান হত। গ্রামের সকলকে তিনি সেবা ও সাহায্য করতেন। কিন্তু তার জন্য কৃতজ্ঞতায় ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব ছিল না।

সংসার-জীবনেও তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। তাঁর সার্বিক আত্মসমর্পণ ছিল কোথায়? আজ আমরা সেই বর্ণনা ও আলোচনাতেই পাঠ শুরু করব।

একাদশ অনুচ্ছেদ

আমরা আগেই জেনেছি, জয়কালী নিঃসন্তান ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর সংসার শূন্য হওয়াই উচিত। কিন্তু মা-বাপমরা দুটি ভাইপো তাঁর ঘরে মানুষ হচ্ছিল। এমন অবস্থায় স্নেহের আতিশয্যে এবং শাসনের অভাবে ওদের মাথা বিগড়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু জয়কালী তা হতে

দেননি। এমন কি ওদের ভেতর বড়টি, যার নাম পুলিন, তার বয়স আঠার হয়েছিল। সেকালে আঠার বছর বয়সে ছেলের বিয়ে দেওয়া হত। ফলে পুলিনের বিয়ের সম্বন্ধ আসত। কিন্তু জয়কালী কঠোর মন্তব্য করতেন। উপার্জন করতে শুরু করলে তবেই পুলিন বিয়ের অনুমতি পাবে।

একথা শুনে প্রতিবেশীরা দুঃখিত হতেন। ভাবতেন প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধাচার করে তিনি নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ করছেন। আঠার বছর বয়স যখন হয়েছে কোন পুত্র-সন্তানের তখন উপার্জন করুক না করুক বিয়ে দেওয়া উচিত। মা'ত নয়, পিসির আর কত দরদ হবে! মোট কথা প্রতিবেশীরা এ ব্যাপারে তাকে হৃদয়হীনই ভাবতেন।

প্রশ্ন

১. 'কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখ-বাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই।'—পিসিমা কে? কার সুখবাসনা? সুখবাসনাটি কি? কি যুক্তিতে প্রশ্রয় দেন নাই? এর দ্বারা তার চরিত্রের কি পরিচয় পাও?
[১+১+২+৩+৩]

২. 'পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয়বিদীর্ণ হইয়া যাইত।'—কঠোর বাক্যটি কি? প্রতিবেশিনীদের হৃদয়বিদীর্ণ হবার কারণ কি? [৩+২]

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

এই অনুচ্ছেদে লেখক জয়কালীর মনের স্নেহপ্রীতি অর্পণের আশ্রয়টির বর্ণনা করেছেন। তিনি যত্ন করতেন একমাত্র ঠাকুরবাড়িটিকে। এটিই ছিল তাঁর মনের একমাত্র আশ্রয়। মন্দিরের ব্যাপারে কোন শৈথিল্য তাঁর পছন্দ হত না। তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করেন যে দেবতার নৈবেদ্য দেবতা পান না। কারণ নৈবেদ্য অর্পণের দায়িত্ব যার, সেই পুরোহিতমশাই নৈবেদ্য দেবতার স্থানে না দিয়ে নিস্তারিণী নামে একটি স্ত্রীলোককে দিত। সামান্য কিছু পেতেন দেবতা, বাকি সবটাই পেত স্ত্রীলোকটি। জয়কালীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে দেবতার ভাগে হাত বাড়াত যেসব উপদেবতা—তাদের কাল গেছে।

প্রশ্ন

১. 'কিন্তু আজকাল·····পূজার ষোল আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে।'—আগে কার ভোগে যেত? আজকালই বা ভোগে আসছে কেন? [২+৩]

২. 'পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত।'—দেবতা দুটি কে কে? একটি মানবীই বা কে? ভয় করবার কারণ কি?
[২+১+২]

ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

জয়কালী দেবীর শাসনে শুধু যে মন্দিরের ভেতরের দেবতার বরাদ্দ যথাস্থানে পৌঁছেছে এমন নয়, বাইরের প্রাঙ্গণ এবং মালঞ্চেরও সংস্কার হয়েছে। কি কি পরিবর্তন হয়েছে?

১. প্রাঙ্গণ ঝকঝক তকতক করছে।
২. মাধবীলতার একটি শুকনো পাতাও কোথাও পড়ে থাকে না।
৩. পাড়ার ছেলেমেয়েরা এখানে আসত লুকোচুরি খেলার জন্য, এখন তা বন্ধ হয়েছে।
৪. ছাগশিশু যখন তখন আসত মাধবী-লতার বাকল খেতে, তা এখন আর সম্ভব নয়।

মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষায় জয়কালী-দেবীর দৃঢ়তার আরও বড় দৃষ্টান্ত দেওয়া

হয়েছে চতুর্দশ অনুচ্ছেদে। তাঁর এক ভগ্নীপতি মুরগীর মাংস খেতেন। তিনি জয়কালীদেবীর সঙ্গে মন্দিরে ঢোকার উপক্রম করেছিলেন। জয়কালীদেবী তাঁকে ঢুকতে দেননি। এতে তাঁর বোন তাঁর সঙ্গে প্রায় বিচ্ছেদ ঘনিয়ে তুলেছিলেন। পরে বোনে বোনে সম্ভবত ব্যাপারটি মিটে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ একে জয়কালীদেবীর বাতিক (বাতুলতা) বলেই মনে করেন।

জয়কালীদেবীর এই আচরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক যা বলেছেন তা হল এই যে মন্দিরের কাছেই তিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। মন্দিরই ছিল তাঁর সব। একজন নারী কখনও বধূ, কখনও মাতা কখনও সংসারের কর্ত্রী। কখনও তিনি বধূরূপে কখনও মাতারূপে, কখনও কর্ত্রীরূপে চরিতার্থতা লাভ করেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে স্বামী-পুত্রশূন্য এই বিধবা মন্দিরের মধ্যেই তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। ঐ মন্দিরই ছিল তাঁর স্বামী-পুত্র-পরিজন। এককথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন মন্দিরসর্বস্ব।

প্রশ্ন

১. জয়কালীদেবী ঠাকুরবাড়ির পারিপাট্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য কি কি করেন ? [৫]

২. 'সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল।' তাঁহার বলতে কাকে বোঝাচ্ছে ? বিচ্ছেদ সম্ভাবনা কেন ঘটেছিল ? সাধারণ লোক এই ঘটনার কি অর্থ করে ?

৩. 'ইহাই তাঁহার স্বামীপুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।' 'তাঁহার' বলতে কাকে বোঝান হয়েছে ? 'ইহা'টি কি ? তা তাঁর স্বামী-পুত্র-সংসার কিভাবে হতে পারে ?

[২+২+৬]

পদার্থ বিদ্যার নবযুগ ঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

'ইলেকট্রনের জয়যাত্রা' প্রবন্ধের ভূমিকাংশ পাঠ শেষ হয়েছে। আমরা জেনেছি যে ফ্লেমিং বেতারে শব্দ সংকেতের পরিবর্ধন করতে গিয়ে যে ভালভের সৃষ্টি করলেন, তা ইলেকট্রনের ব্যবহারিক প্রয়োগকে সহজসাধ্য করে দিল। এই প্রসঙ্গেই লেখক রেডিয়ো সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখছেন। আজ আমরা 'রেডিয়ো' অংশ পড়ব।

লেখক রেডিয়োকে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন—'বেতার টেলিফোন'। অর্থাৎ টেলিফোনে গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রের মধ্যে তারের সংযোগ থাকে, কিন্তু বেতারে গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রে তারের যোগ থাকে না। এই কারণেই তিনি রেডিয়োকে বলেছেন 'বেতার টেলিফোন'। [বেতার = তার ছাড়া]

'বেতার টেলিফোন' সম্পর্কে আলোচনার আগে লেখক স-তার টেলিফোনের আলোচনা করেছেন। বেতার আর স-তারের কার্যপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। কিছু মূল তথ্যের মধ্যে পার্থক্য নেই। তোমরা জান, শব্দ অর্থ বায়ু তরঙ্গ। ঘণ্টায় ঘা মারলে ঘণ্টা কেঁপে কেঁপে বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। ঐ তরঙ্গ কানে এসে পৌঁছলেই আমরা তা শুনতে পাই। টেলিফোনে প্রেরক যন্ত্রের সামনে কথা বলে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করা হল তা যন্ত্রের বিদ্যুৎ প্রবাহের মধ্যে আলোড়ন আনে। ঐ আলোড়ন তারের ভিতর দিয়ে গিয়ে গ্রাহক যন্ত্রেও অনুরূপ আলোড়ন আনে। বিদ্যুতের আলোড়নকে শব্দ

তরঙ্গে পরিণত করার ব্যবস্থা থাকে গ্রাহক যন্ত্রে। ফলে শ্রোতা তা শুনতে পান।

মনে রাখ : ১৮৭৮ সালে আলেকজেণ্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। আধুনিক কালে আমরা যে কার্বন টেলিফোন (আসলে কার্বন প্রেরকযন্ত্র) ব্যবহার করি, আবিষ্কারক বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন।

নিচে টেলিফোনের কার্যকারিতা চিত্রে বোঝান হল।

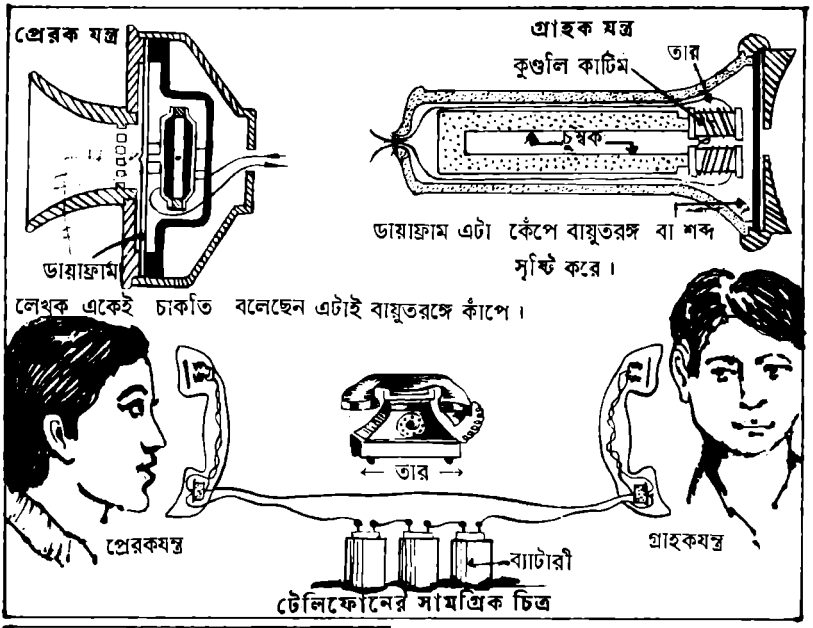

টেলিফোনের সামগ্রিক চিত্র

প্রশ্ন

১. রেডিয়োকে লেখক কি বলে বর্ণনা করেছেন ?
২. রেডিয়ো ও টেলিফোনের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য কি ?
৩. টেলিফোনের কার্যকারিতা বর্ণনা কর।

টেলিফোনের বর্ণনার পর লেখক বেতার টেলিফোন বা রেডিয়োর কথায় এসেছেন। লক্ষ্য কর, সঙ্গে সঙ্গে ফ্লেমিং ও তাঁর অনুচরদের আবিষ্কৃত ও সংশোধিত ভালভের কথা এসে গেল। ভালভের সাহায্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করা হল প্রেরক যন্ত্রে। যা করা হয় 'আকাশবাণী ভবন' থেকে।

লেখক এবার চলে এসেছেন আমাদের বাড়ির রেডিয়োতে। বাড়ির ছাদে টাঙানো তার বলতে লেখক এরিয়ালকে বুঝিয়েছেন। আজকাল অনেক বাড়িতেও ওভাবে এরিয়াল টাঙান থাকে না। রেডিয়োর উন্নতির সঙ্গে ওভাবে বাইরের ছাদে এরিয়াল না টাঙালেও চলে। যা হোক, ঐ এরিয়াল দেখা যাক বা না যাক, রেডিয়োর একটি অংশে ইলেকট্রনের প্রবাহ এসে ধরা পড়ে। এবং টেলিফোনের চাকতির মত একটি চাকতিতে তরঙ্গ তোলে। অন্তত তোলা উচিত বলে ভাবা যায়।

কিন্তু প্রথম দিকে বহু বিজ্ঞানী অবাক

হলেন যে ডায়াফ্রাম নড়ছে না। পরে কারণ বোঝা গেল। হিসেব অনুসারে ডায়াফ্রামটিকে সেকেণ্ডে লক্ষ বার নড়া দরকার। কিন্তু ওর একবার দোলা শেষ হবার আগেই আর একটা আঘাত এসে যায়। ফলে টানাপোড়েনে পড়ে ব্যাচারা স্থির থেকে যাচ্ছে।

এই অসুবিধা থেকে রক্ষা পেতে গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে বসান হল এক টুকরো **'গ্যালিনা'**। গ্যালিনা কেন বসান হল? গ্যালিনার কাজ কি?

গ্যালিনা বিদ্যুৎ প্রবাহকে একমুখী করে। একদিকেই ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ যায়। বিপরীত দিকে যায় না।

ফলে ডায়াফ্রামে ঠেলা এবং টান কিছুই পড়ল না। হয় টান বা ঠেলা পড়ল। অতএব ডায়াফ্রামের প্রতিটি কম্পন শেষ হবার অবকাশ পেল।

প্রশ্ন

১. 'বাড়ির ছাদে একটা তার খাটান হয়েছে'—কেন? এই তারকে কি বলে? আজও কি এমন তার খাটান থাকে? কেন?

২. 'কিন্তু দেখা যাবে চাকতি নড়াচড়া করছে না।' কিসের চাকতি? নড়াচড়া করছে না কেন? কিভাবে এ অসুবিধা দূর করা হয়?

৩. গ্যালিনা কি কাজে ব্যবহার করা হয়? এর কার্যকারিতা সম্পর্কে যা জান বল।

এই পর্যন্ত আলোচনায় লেখক আমাদের বুঝিয়েছেন বিনা তারে এক স্থান থেকে প্রেরিত বিদ্যুৎতরঙ্গ কিভাবে অন্যত্র ধরা সম্ভব। এবারে তিনি বর্ণনা করতে চলেছেন, কিভাবে এক স্থানের কথা ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গ মারফৎ অন্যত্র পৌঁছন যায়। এ কথা বুঝতে আবার তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছে প্রেরক যন্ত্রে।

প্রেরক যন্ত্রে শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎতরঙ্গে পরিণত করা হয়। শব্দের ওঠা-নামার সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহেরও জোর বাড়ে কমে। একে মিলিয়ে দেওয়া হয় আগে যে তরঙ্গ-প্রবাহের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে। ফলে ঐ তরঙ্গপ্রবাহেও ওঠা-নামা হতে থাকে। এবার এরিয়ালের সাহায্যে ঐ ওঠা-নামা করা বিদ্যুৎপ্রবাহ গ্রাহক যন্ত্রের ডায়াফ্রামকে মূল শব্দতরঙ্গের ছন্দে কাঁপাতে থাকে। এইভাবে আমরা শব্দতরঙ্গ শুনতে পাই।

এত গেল রেডিয়োর মূলকথা। এতে আমরা কোনক্রমে শব্দকে শুনতে পেলাম। একজন টেলিফোনের মত কানে লাগিয়ে শুনতে পারলেন এই শব্দ। একঘর লোক একত্রে শুনবে, সে ব্যবস্থা এতেও হল না। তখন ভালভের সাহায্য নেওয়া হল। এরিয়াল থেকে তার এসে যুক্ত হল ভালভের সঙ্গে। প্রেরকযন্ত্র থেকে যে ঈথর তরঙ্গ আসছিল তা এসে পড়ল ভালভের জালতিতে। বিভব পরিবর্তিত হল। বর্তনীর তড়িত-প্রবাহে জোয়ার-ভাটা খেলতে থাকল। ঐ জোয়ার-ভাটা হল আগের চাইতে প্রবল। ফলে ডায়াফ্রাম আরও জোরে কাঁপতে থাকল। ফলে শব্দের জোর বাড়ল।

প্রশ্ন

১. প্রথম যে রেডিয়ো তৈরি হল তাতে কি অসুবিধা ছিল? ঐ অসুবিধা কিভাবে দূর করা হল?

২. ভালভ কিভাবে রেডিওর উন্নতি করল।

৩. 'এইরকম বেতার যন্ত্রে বেশি দূর থেকে শব্দ শোনা যায় না।' কোন রকম বেতার তন্ত্র? কিভাবে এই অসুবিধা দূরা করা যায়?

যুদ্ধ বিগ্রহ সব সময়েই বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটায়। যদিও যুদ্ধবাজ নেতাদের লক্ষ্য থাকে যুদ্ধ জয় এবং বিজ্ঞানের শক্তিকে কাজে লাগান, তবু সেই উপলক্ষে অনেক মহৎ আবিষ্কারও হয়ে যায়। যেমন হয়েছিল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের আমলে—উন্নতি ঘটে ভালভের।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ কখন ঘটে মনে আছে ত? প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলে ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত।

এই সময় থেকে ভালভ নানা কাজে ব্যবহার করা হল।

১. অ্যামপ্লিফায়ারে ভালভের ব্যবহারের পর মৃদু শব্দ বহুগুণিত হল।

২. স্টেথিসকোপ (যা দিয়ে ডাক্তারবাবুরা রোগীর বুক পিঠ পরীক্ষা করেন।)-এর সঙ্গে ভালভ ব্যবহার করে রোগীর বুক-পিঠ থেকে পাওয়া মৃদু শব্দকে বাড়িয়ে একদল ছাত্র-শিক্ষক চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করতে পারলেন।

৩. একটার পর একটা ভালভ বসিয়ে শব্দকে এত জোরাল করা যায় যে একটা মাছির পায়ের শব্দ বেড়ে উঠে রেলগাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে যায়।

৪. সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ভালভের অবদান আছে। তোমরা জান হারমোনিয়াম-পিয়ানো-এসরাজ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রে 'সা থেকে র্মা আটটি সুর থাকে। এই সুরগুলো অবিমিশ্র থাকে না। এদের জোর বাড়াতে গেলেও দেহের জোর বেশি করে প্রয়োগ করতে হয়। তাতেও যতটা চাইছি, তত বড় ফল পাওয়া যায় না।

ভালভের সাহায্যে পিয়ানো বা ঐরকম যন্ত্রের এই দুই অসুবিধাই দূর করা হয়েছে।

প্রশ্ন

১. '১৯১৪ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় থেকে এই ভালভ বহু লোকের হাতে আশ্চর্যরকম উন্নতি লাভ করেছে।'—১৯১৪ সালের যুদ্ধ কি যুদ্ধ নামে পরিচিত? সেই যুদ্ধে ভালভের কি উন্নতি হয়?

২. স্টেথিসকোপ কি? তার শব্দ কিভাবে বাড়ান যায়? বাড়িয়ে কি কাজে লাগে?

৩. 'একটা চলন্ত রেলগাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে ওঠে।'—কে কিভাবে রেলগাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে ওঠে?

৪. 'সঙ্গীতে ভালভের দান অসামান্য'—প্রমাণ কর।

নির্মল লাহিড়ী

সবচেয়ে লম্বা মানুষ

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষটির উচ্চতা ৮ ফুট ১১ ইঞ্চি। এ পর্যন্ত এই উচ্চতাকে কেউই ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। নাম তার রবার্ট। থাকত ওয়াশিংটেন রাজ্যের সেণ্ট লুই শহরে। বেচারা রবার্ট তার সাইজের জামা, জুতো, মোজা, টুপি কিছুই বাজারে পেত না। বড় জুতো না পাবার দরুন তার পায়ে ফোস্কা পড়ে। কারণ তার পায়ের পাতা ছিল ১৮ ইঞ্চি লম্বা।

অভিনব কুকুর সংবাদ

মার্কিন দেশের নিউইয়র্ক শহরে পোষা কুকুরের সংখ্যা প্রায় ৪,৭৫,০০০। তাদের সেবাযত্ন আহার-বিহারের জন্য রয়েছে সেবা নিকেতন, রেস্তোরাঁ। এই কুকুর রেস্তোরাঁর 'মেনু কার্ডে' থাকে মেরীল্যাণ্ডের সুস্বাদু কাঁকড়ার কারি বা চিংড়ির কাটলেট। এই রেস্তোরাঁয় নিয়মিত কুকুর খদ্দেররা গাড়িতে চড়ে আসে।

দ্বিতীয় ভাষা ঃ ইংরাজী

TEXT

A DAILY DRAMA

—Jerome K Jerome—

I. পূর্বসূত্র (Paras 1-5) : পোজার (**Podger**) খুড়ো এবং শহরতলী গ্রাম ঈলিং (**Ealing**)-এর অনেক মোটাসোটা লোক শহরের ট্রেন ধরবার জন্য পড়ি কি মরি দৌড়তেন। কারণ, আট মিনিটের হাঁটা পথ তাঁরা পাঁচ মিনিটেই পার হতে চাইতেন। এবং এই সব লেট-লতিফ মানুষগুলোর হাস্যকর দৌড়াদৌড়ি দেখার জন্য নিষ্কর্মা লোকেরা রাস্তায় এসে জমা হত আর মজা পাওয়ার জন্য খুব উৎসাহ দিত। এই পর্যন্ত তোমরা আগের সংখ্যায় পেয়েছ। এবার দেখা যাক পরের অংশ।

গল্পের যে অংশটা এখন বলা হবে তার আগে কয়েকটা দরকারী কথা জেনে রাখ। পোজার (পজার উচ্চারণও হয়) খুড়োর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো এবার কিন্তু একে একে ফুটে উঠতে থাকবে। এই বৈশিষ্ট্য-গুলো এমনই মজাদার যে লেখক **Jerome** শুধু পোজার খুড়োকে কেন্দ্রীয় চরিত্র তৈরি করে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দুখানা ভ্রমণ কাহিনী **Three Men in a Boat** এবং **Three Men on the Bummel** রচনা করে-ছিলেন। বই দুখানার নাম তোমরা আগেই জেনেছ। প্রথম কাহিনীটা এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে,সেই যুগে শুধু আমেরিকাতেই বইটার ১০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে যায়। জার্মানী ভ্রমণের ওপর লেখা দ্বিতীয় কাহিনী থেকে তোমাদের পাঠ্য গল্পটি নেওয়া হয়েছে। এমন যে অলস অথচ ভাবখানা যেন সদা ব্যস্ত (**Idly busy**), এই মজাদার খুড়োর চরিত্রটা লেখক **Jerome** প্রায় ১০ বছর ধরে (১৮৮৯ সালে প্রকাশিত **Idle thoughts of an Idle fellow**-এর রচনাকাল থেকে) তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন। সুতরাং, বুঝতেই পারছ, তোমরা এখন যে চরিত্রটার সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছ সেই চরিত্রটি বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি।

II. (Translation) Paras 6-15

My Uncle always got up..... my aunt would ask.

আমার খুড়োমশাই সব সময় বেশ তাড়া-তাড়ি উঠতেন, কিন্তু যত গোলমাল সব যেন শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হত। প্রাতরাশের পরে তাঁর প্রথম কাজটাই ছিল খবরের কাগজটা হারান। যখনই কিছু হারাতেন আমার পোজার খুড়ো মনে মনে বলতেন না, 'আমি একজন অসাবধান বুড়ো মানুষ। আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলি। কখনও মনে থাকে না কোথায় কি রেখেছি। আমি নিজে কখনই তা খুঁজে পাই না। আমি নিশ্চয়ই চারপাশের লোকজনের খুব অসুবিধা ঘটাই।' যখনই তিনি হারাতেন, তখনই সবাইকে দোষ দিতেন এক নিজেকে ছাড়া। তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন, 'এক মিনিট আগে এটা (কাগজটা) আমার হাতে ছিল।'

আমার খুড়ি একটা সম্ভাবনার কথা বাতলাতেন, 'তুমি হয়ত এটা বাগানে ফেলে এসেছ।'

'বাগানে ফেলে আসব কেন? বাগানে আমার কাগজের দরকার হয় না। আমার কাগজের দরকার হয় গাড়িতে (ট্রেনে)।'

'তুমি কি ওটা পকেটে রেখেছ?'

'তুমি কি ভাব যে ওটা আমার পকেটেই রেখে আমি ন'টা বাজতে

পাঁচ মিনিট আগে এখানে দাঁড়িয়ে ওটাই খুঁজতে থাকব ? তুমি কি আমাকে বোকা (মূর্খ) মনে কর ?' এমন সময় কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করত, 'এটা কি ?' এই বলে কোথা থেকে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ তাঁর হাতে দিত। রেগে গিয়ে ওটা হাতে নিয়ে তিনি বলে উঠতেন, 'আমি চাই, আমার জিনিসে কেউ যেন হাত না দেয়।'

কাগজটা রাখার জন্য তিনি ব্যাগটা খুলতেন এবং তারপরই ওটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নির্বাক হয়ে থেমে যেতেন। আমার খুড়ি জিজ্ঞাসা করতেন, 'ব্যাপার কি' ?

ব্যাপারটা কি সেটা তোমরা পরের বার জানবে। আপাতত এই পর্যন্ত যে গল্পাংশ পড়লে তার **word-notes**, **grammar** ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

(Notes) A. Words : **Got** (**Pr. tense : get**) **up** ; **get up** অর্থ—ওঠা, নিদ্রা ত্যাগ করা ; **to rise from sleep, to leave bed.** **Get** verb-এর সঙ্গে বিভিন্ন **preposition** যুক্ত হয়ে যেসব **group verb** বা **verb idiom** তৈরি হয় তাদের রকমারি অর্থ জেনে রাখলে ইংরাজী লেখায় বা বলায় তোমাদের খুব কাজে লাগবে। যেমন : **get at** = **reach, find out** ; **get by** = **pass** ; **get in** = **arrive, enter** ; **get off** = **start, escape** ; **get over** = **recover, surmount** ; **get to** = **begin, reach** ; ইত্যাদি। **Enough** (এনাফ, ইনাফ) **sufficiently.** এখানে **enough** শব্দটি **adverb, adjective** এবং **noun** হিসাবেও ব্যবহার হয়। যেমন : **We have enough** (**adj.**) **mangoes** (অথবা, **mangoes enough**) **for five persons. Stop, please, we have had enough** (**noun**) **of it.** —এইসব ক্ষেত্রে **enough** পরিমাণ (**quantity**) বা সংখ্যা (**number**) বোধক।

Seemed—যেন মনে হত—**gave the impression of being so** ; **'seem'** এবং **'appear'** শব্দ দুটি কখন কখনও একইভাবে, কখন কখনও একটু ভিন্নভাবে ব্যবহার হয় যেমন : (একইভাবে) **Things far off seem** (**or appear**) **small.** (ভিন্নভাবে) **He is late in coming ; it seems he has been detained somewhere. From his looks he appears to be sad.**

At the last moment (শেষ মুহূর্তে **at eleventh hour** (**idiom**).

Lose (**verb**)—হারান ; **have** (**something**) **no longer** ; (মোটামুটি একই উচ্চারণের শব্দ হল **loose** (**adj.**)—ঢিলা, **not tight.**

I must be a great trouble i.e. I must be a source of great trouble (কষ্ট বা অসুবিধার কারণ বা মূল) ; **blamed—accused** দোষ দিত, **censured, found fault with** ; **Perhaps**—সম্ভবত ; **probably, possibly. Suggest**—সম্ভাবনা বাতলান—**mention as a possibility. Aunt-feminine of uncle.**

N. B. : **'Why should I leave it in the garden ?'** থেকে আজকের গল্পাংশের শেষ পর্যন্ত সমস্তটাই **Punctuation**-এর জন্য খুব দরকারী। সুতরাং **Text** বইটা ভাল করে দেখে রাখ। (**would**) **hand him**...তাঁর হাতে দিত। এখানে **hand** শব্দটি **verb** হিসেবে বসেছে। **folded**—ভাঁজ করা, **doubled up over** ; **I do wish** –**indefinite tense**-এ খুব জোর দিয়ে কোন **verb**-এর বা কাজের কথা বলতে গেলে **'do' verb**-টিকে অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নতুবা, শুধু **I wish** লিখলেই চলে যেত। **People would leave my things alone**—লোকেরা আমার জিনিসগুলো দেবে। অর্থাৎ আমার জিনিসগুলো যেমন আছে তেমন থাকতে দেবে অর্থাৎ আমার জিনিসে কেউ

হাত দেবে না।

Pause—কিছুক্ষণের জন্য থামা, stop for a while, speechless—নির্বাক, without speech/a word. Speechless এখানে adverb হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। Pause speechlessly.

B. Sentence I

The first thing he did after breakfast was to lose his newspaper—i.e., The first thing that he did···newspaper. এই বাক্যটি এইভাবে ভেঙে বোঝা যাক—He lost his newspaper. That was the first thing he did after breakfast.

Ref. : What he always did···· and seen. (Para 3)

C. 1. Lexical Test :

Synonyms	Antonyms
last—final	uncle – aunt
round—about	after—before
(in round me)	early—late
pause—stop	last—first
speechless—dumb	careless—careful
except—but	folded—unfolded
(in except himself)	

2. Pick out the right word from the following quotation and with it, fill in the gap in each of the sentences under the quotations :

a. **My uncle always got up early enough.**

i. We have – food at our disposal.

ii. We have had — of it.

iii. He finished his job early—.

[**Ans :** 'enough' (used as an adjective, noun & adverb)]

b. **I must be a great trouble to everybody round me.**

A. i. Don't—the child, it is feeling sleepy.

ii. Don't give me—

[**Ans :** 'trouble' (used as a verb and a noun)].

B. i. There was a scarf — his neck.

ii The watch is —.

iii. There was a wall all —.

[**Ans :** 'round' (used as a preposition, adjective and adverb)].

c. **He would open his bag.**

i. The windows are —.

ii. Take the old man out into the —.

iii. He will now — his bag.

[**Ans :** 'open' (used as an adjective, noun and verb)].

3. a. **I must be a great trouble to everybody.**

[Which words above mean 'inconvenience' and 'all' respectively ? **Ans :** trouble & everybody.]

b. **I can never find it again.**

[Which words above mean 'at no time' and 'once more' respectively ? **Ans :** never & again.]

c. ···**and then taking a quick look at it he would pause . .**

[Which words above mean 'hurried' and 'stop' respectively ? **Ans :** quick & pause]

(Short Questions & Answers)

ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে এইবার আলোচ্য অংশটি ভাল করে বুঝে নাও।

Q. When did Uncle Podger get up ?

A. Uncle Podger got up early in the morning.

Q. When did troubles come to him ?

A. Troubles came to him at the last moment / at the eleventh hour.

Q. What was the first thing he did and when ?

A. The first thing he did was to lose his newspaper. He would lose it after breakfast.

Q. What did Uncle Podger do when he lost anything ?

A. When Uncle Podger lost anything he accused everybody around except himself [or, whenever he lost anything he made others responsible (দায়ী) for it.]

Q. What would Aunt Podger (wife of Uncle Podger) suggest ?

A. Aunt Podger would suggest that my Uncle had left the day's newspaper in the garden.

Q. What did the Uncle say when somebody handed him a folded newspaper ?

A. When someone handed him a folded newspaper, Uncle Podger took it angrily from him and said that, people should leave his things alone.

Q. Which day's paper was handed to Uncle Podger ?

A. The paper handed to Uncle Podger was the paper of the day before (or···was the previous day's paper).

Q. What did Uncle Podger find when he took a look at the paper ? What did he do then ?

A. Taking a quick look at the newspaper, Uncle Podger found that, that was the previous day's paper.

As soon as Uncle Podger found that to be so, he stood motionless and said no words.

TASK (with hints)

আলোচ্য পাঠ্যাংশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ (important) লাইন আছে যেগুলো প্রশ্নপত্রে তুলে দিয়ে তাদের ওপর প্রশ্ন করা হতে পারে। এতক্ষণ যা পড়লে তার ওপর নির্ভর করে উত্তরগুলো লিখে ফেল। অবশ্য প্রয়োজনমত উত্তর সম্পর্কে hints দেওয়া হল।

Q. 1. '....but troubles seemed to came to him at the last moment.'

i. Who is the person referred to here ? When troubles come to 'him' ?

ii. What was the trouble that came to him first ? What did he do when it came ?

iii. What should a man usually do at such a moment ? How did the person referred to here do ?

iv. How did the person suffer for his carelessness ?

[**Hints** : iii. When a person loses anything for his own carelessness, he should blame himself. Uncle Podger did the opposite thing, for he blamed all except himself.

iv. Uncle Podger lost a lot of time in finding out the newspaper he had lost. So he had to run to the station madly to catch the train to town.]

Q. 2. 'I had it in my hand a minute ago ?'

i. Who is the speaker here ? To whom did he say this ?
ii. What is referred to by it ? When was this said ?
iii. What is the most amusing feature you find here in the speaker's character ?

[**Hints :** iii. The most amusing feature we find in the speaker Uncle Podger's character is that, he is a fussy, forgetful man. He is always behind to his own faults. He is given to accusing others around him for the troubles caused by his own carelessness.]

Q. 3. 'Do you think I'm a fool ?'

i. Who put this question and to whom ? Or, Whom do the words 'you' and 'I' refer to ?
ii. What was the occasion ? Or, What led to this remark being made ?
iii. What did the speaker say in his own defence ?

[**Hints :** ii. When Uncle Podger was looking for the day's newspaper he had lost, his wife asked him if he had, by any chance, put it in his pocket. At this Uncle Podger was greatly annoyed (বিরক্ত) and made this remark.

iii. The speaker, Uncle Podger defended himself by saying that if he had put the newspaper in his pocket, he would not have stood there looking for it at five minutes to nine, for he was to catch the 9 o'clock train to town. He said that he was no fool to stand there then with the newspaper in his pocket.

Q. 4. 'I do wish people would leave my things alone.'

i. Whom do 'I' and 'people' stand for ?
ii. When was the remark made ?
iii. What followed the remark ?

[**Hints :** ii. Uncle Podger had lost the day's newspaper through his own carelessness. When Aunt Podger suggested that he might have left it in the garden or put it in his pocket, he became very angry. Just then someone present there handed him a folded newspaper. The Uncle took it for the right one and made the remark.

iii. When Uncle Podger got a folded newspaper from someone present there, he took it for the right one and hastily opened the bag to put the paper in. As soon as he took a quick look at the paper, he became dumb for a while.]

GRAMMAR

VOICES

1. I **shall draw** a picture. **(Active)**

A picture **will be drawn** by me. **(Passive)**

2. Kallol **will kill** the snake. **(Active)**

The snake **will be killed** by Kallol. **(Passive)**

3. The Headmaster **will scold** us. **(Active)**

We **shall be scolded** by the headmaster. **(Passive)**

গত সংখ্যায় Active Voice থেকে Passive Voice করার সময় তোমরা দেখেছ 'be' verb Present Tense-এ am, is, are এবং Past Tense-এ was, were রূপ নেয়। ওপরের sentence গুলো আছে Future Tense-এ। তাদের Passive করতে গিয়ে যথাবিধি মূল verb-এর Past Participle ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার আগে 'be' verb-এর Future Tense (will be/shall be) ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ 'be' verb-এর বাহ্যিক রূপের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

অনুরূপভাবে, যেসব sentence-এ **can** (বা could), may (বা might), must, should (বা ought to) ব্যবহৃত হয়, সেসব sentence passive করতে গিয়ে **can be** (বা could **be**), **may be** (বা might **be**), must **be**, should **be**, (বা ought to **be**) ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ **be** verbটি অপরিবর্তিত-রূপেই ব্যবহৃত হয়, যেমন :

1. I **can do** this. **(Active)**

This **can be done** by me. **(Passive)**

2. Rupa **may tell** the story. **(Active)**

The story **may be told** by Rupa. **(Passive)**

3. One **should help** the poor. **(Active)**

The poor **should be helped**. **(Passive)** ইত্যাদি।

লক্ষ্য কর, ওপরের sentenceগুলোতে voice change-এর অন্যান্য নিয়ম আগে যা শিখেছ,—তাই আছে। Future Continuous Tense এবং Future Perfect Tense-এর ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসারে be-verb-এর Participle form অর্থাৎ been ত থাকবেই, যেমন :

Future Continuous

I should be drawing a picture. **(Active)**

A picture will be being drawn by me. **(Passive)**

Future Perfect

He will have done the work by now. **(Active)**

The work will have been done by him by now. **(Passive)**

লক্ষ্য কর, Passive Voice-এ এই যে be, being বা been বসছে তা কিন্তু মূল verb-এর Past Participle form (যথা, drawn, killed, told, done)-এর আগে বসছে।

Voice change সম্পর্কে এখন

নবম দশম ৪২

তোমাদের কয়েকটা কথা স্মরণ রাখতে হবে ঃ

1. যেহেতু ইংরাজী একটা সরস, ক্রমবিবর্তনশীল ভাষা, সেহেতু সব সময়ই তাকে পুরনো grammar-এর কঠিন বন্ধনে রেখে দেওয়া যায় না। ফলে, একটি বাক্য বা শব্দের ব্যবহার grammatical বা ব্যাকরণ-সম্মত হলেই যে তা রীতিসম্মত হবে তা নাও হতে পারে। তবে Present, Past এবং Future Tense-এর Perfect Continuous form এবং Future Continuous form-এর Passive Voice-এর চলন নেই। সুতরাং,

i. The work has been being done by Ram. **(Present Perfect Continuous)** ii. The book had been being read by the student. **(Past Perfect Continuous)** iii. The picture will be being drawn by me. **(Future Continuous)** এবং iv. The book will have been being read by the student. **(Future Perfect Continuous)**—এই ধরনের sentence ইংরাজীতে অচল।

2. ব্যবহারগত রীতি এবং শ্রুতিমাধুর্য ছাড়াও দেখতে হবে Passive Voice করলে Sentence-এ অর্থগত প্রাঞ্জলতা আসছে কিনা। Passive Voice কখনই Active Voice-এর ভিন্নরূপে প্রকাশ নয়। যেখানে কর্তা (doer)-র চাইতে কৃতি (thing/s done)-র প্রাধান্য বা কর্তা অস্পষ্ট সেখানে Passive Voice ব্যবহার করা উচিত। **Trespassers will be prosecuted ঃ** বা my watch is stolen. এই ধরনের Sentence-এ কে prosecuted (প্রসিকিউটেড—দণ্ডিত) হয়েছে বা কি চুরি গিয়েছে তারই প্রাধান্য বেশি। কে বা কারা দণ্ডিত করেছে বা চুরি করেছে সেটা অস্পষ্ট এবং অপ্রধান। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে Passive form-এ প্রকাশ করাই ভাল। আবার, **I shall eat some cakes now (Active).** বাক্যটিকে Passive-এ, **Some cakes will be eaten by me, now (Passive)** রূপান্তরিত করলে অত্যন্ত খারাপ শোনাবে, যদিও তা স্পষ্টতই ব্যাকরণসম্মত।

3. Quasi-Passive Verbs : (Transitive Verbs with a Passive meaning) ঃ যেসব Sentence-এ এই ধরনের verb ব্যবহার করা হয় সেসব Sentence-এরও Passive Voice করা হয় না। **Rice, when sold by the sellers, costs dear.** এইভাবে বাক্যটি গঠন না করে করতে হয় নিম্নলিখিতভাবে ঃ **Rice sells dear.** অনুরূপভাবে, **The milk tastes sweet. The flower smells sweet** ইত্যাদি। এখানে **sells tastes** এবং **smells** verb-গুলো Quasi-Passive.

TASK

Present এবং Future Tense-এর ওপর কয়েকটা Sentence Active Voice-এ দেওয়া হল। তোমরা বাড়িতে এই Sentenceগুলো Passive Voice-এ change করে রাখবে। পরের বারে আমরাও করে দেব। তখন মিলিয়ে নিও।

a. Cows give milk. **b.** Dipankar is selling milk. **c.** They have seen Tajmahal. **d.** Jolly is dressing the doll. **e.** Rahim has written a letter. **f.** My teachers will surely praise me. **g.** You may take it. **h.** Kabita can make delicious cakes. **i.** Himadri must win the prize. **j.** He will have read the book.

TRANSLATION

গত সংখ্যায় যে বাঙলা অনুচ্ছেদ ইংরাজীতে অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল তোমরা নিশ্চয়ই তা করে রেখেছ। আমরাও একটা অনুবাদ করে দিচ্ছি। তোমরা মিলিয়ে নাও এবং দরকারমত সংশোধন কর। মনে রেখ, অনুবাদে নানাভাবে, নানা শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা যেটা করে দিচ্ছি তার সঙ্গে তোমাদের অনুবাদের হুবহু মিল না হলে যে তোমাদেরটা ভুল হয়েছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তবে কাঠামোটা মোটামুটি ঠিক হয়েছে কি না সেটা নিশ্চয়ই বুঝে নিতে পারবে।

Visva-Bharati is a famous University, or, a University of repute/renoun. It was founded/ established by Rabindranath. Learners from home and abroad come here to get education. Many subjects are studied here. The University is growing day by day. It is being aided by the Central Government. Many buildings have been constructed here. But has the aim of. Rabindranath been achieved ?

N.B.—1. মনে রেখ, University wordটির প্রথম letter 'u' একটি vowel হওয়া সত্ত্বেও এর উচ্চারণ য়ু (Yu) (য়ুনিভার্সিটি) হওয়ায় তার আগে an-এর পরিবর্তে 'a' article বসবে। 'u'-এর উচ্চারণ 'আ' হলে তার আগে an হবে। যেমন, an Umbrella, an Umpire ; an Under-Secretary ইত্যাদি। 'য়ুনিভার্সিটি' শব্দটির 'সিটি' অংশটির বানান 'Sity' কারণ, শব্দটি এসেছে 'Universe' থেকে। City-র সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 2. 'Study' wordটি গুরুত্ব

Study (**noun**) : Dr. Sengupta made a study on Bernard Shaw (কোন বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন বা গবেষণা) Dr. Hajra is in his study (পাঠকক্ষ)। His studies (নানা বিষয়ে পড়াশুনা) show his academic interest.

Study (**verb**) : Mr. Basu studied Law, at the Inner Temple in London.

Passageটির মধ্যে যেসব Passive Voice-এর উদাহরণ আছে সেগুলো লক্ষ্য কর। i. It was founded / established by Rabindranath. (**Simple Past**)—এখানে 'found' শব্দটির অর্থ 'প্রতিষ্ঠা করা'। এর সঙ্গে find—verb-এর Past Tense-এর রূপ 'found'-এর কোন সম্পর্ক নেই। ii. Many subjects are studied here. (**Simple Present**); iii. It is being aided···(**Present Continuous**) ; iv. Many buildings have been constructed. (**Present Perfect**) ; v. But has the aim··· been achieved ? (**Present Perfect Interrogative**).

এবার Past Tense, Passive Voice ইত্যাদির ব্যবহার দেখিয়ে একটি বাঙলা রচনাংশ ও তার ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হল—ভাল করে পড়ে নাও।

রচনাংশ : আমি রায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁহার ছোট ভাইকে তাঁহার পড়ার ঘরে বসা দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'আপনি আসার অনেক আগেই তিনি বেরিয়ে গেছেন। এখন হয়ত তাঁকে অফিসে পাবেন।'

গিয়েছিলাম। তিনি অফিসে অনুপস্থিত।'

তিনি বলিলেন, 'আপনি কি গতকাল এসেছিলেন ?'

আমি বলিলাম, 'না, আমি গতকাল আসিনি। আমি তাঁকে ফোন করেছিলাম। আমাকে আজ আসতে বলা হয়েছিল।'

কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম, 'রায় মহাশয় কি কোন কারণে আমাকে এড়াতে চাইছেন ?'

Translated : I called at Mr Roy's house in order to meet him. But he was not at home then. I saw his younger brother sitting in his study. He was reading a book. He said to me, 'He had gone out long before you came. You may perhaps find him in his office now.'

I said, 'I had been to his office. He is absent from office.'

He said, 'Did you come yesterday ?'

'No', I said, 'I didn't. I called him up yesterday. I was asked (**or** told) to come here today.'

Having waited there for some-time, I returned home. As I was returning, (**or** on my way back home) I thought, 'Is Mr Roy trying to avoid me for some reason ?'

Notes : 1. ওপরের রচনাংশে ব্যবহৃত call at এবং call up এই দুটি Group Verb-এর উদাহরণ। **Call at**—কারও বাড়ি, অফিস ইত্যাদি স্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। **Call up**—ফোনে কথা বলা। (এই Group Verbটি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যথাসময়ে তা জানবে)।

'Call' verb-এর সঙ্গে অন্যান্য Preposition যোগ করেও Group Verb তৈরি করা হয়, যেমন : **Call on** (কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া, pay a visit to a person : I called on an old friend of mine.) **Call for**—(দাবি করা, demand : The officer called for an explanation of my act.) ; **Call in**—(অনুরোধ করে ডেকে আনা বা ফেরত চাওয়া—Please call in a doctor. **or** He called in the papers given to me.) **Call off**—(তুলে নেওয়া, withdraw—The workers called off the strike.) ইত্যাদি।

2. ফিরে আসা—to come back বা to return হবে, কিন্তু কখনই to return back হবে না।

3. যে সব ইংরাজী শব্দের প্রথম ও শেষ letter রেখে দিয়ে abbreviation (সংক্ষিপ্ত) করা হয় সেখানে stop (.) চিহ্ন বসবে না। যেমন, Dr (Doctor), Mr (Mister), Ltd (Limited) ইত্যাদি। কিন্তু অন্য ধরনের abbreviation-এর ক্ষেত্রে stop (.) বসবে। যেমন, Co. (Company), Lat. (Latin), M.A., Ph. D. ইত্যাদি।

তোমরা হয়ত খেয়াল করেছ গত সংখ্যায় যেমন Present Perfect Continuous Tense-এর কোন Sentence দেওয়া হয়নি, এবারও এখন পর্যন্ত Past Perfect Continuous Tense-এর কোন উদাহরণ Passage-এর মধ্যে নেই। এই দুটো Form নিয়ে এখন কিছু চর্চা করা যাক।

i. সকাল ৭টা থেকে বৃষ্টি পড়ছে—It has been raining since 7 a.m.

ii. মি. বসু গত কুড়ি বছর যাবৎ এই স্কুলে কাজ করছেন—Mr Basu has been serving in the school for the last 20 years.

প্রথম Sentence-এ বলা হয়েছে যে

বৃষ্টি পড়ছে এবং সকাল ৭টা থেকে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় Sentence-এ বলা হয়েছে যে, বসু মহাশয় এখনও বিদ্যালয়ে কাজ করছেন এবং তাঁর চাকরি আরম্ভ হয়েছে ২০ বছর আগে। অর্থাৎ যখনই কোন কাজ অতীতে শুরু হয়ে বর্তমানেও চলতে থাকে তখন **Present Perfect Continuous Tense** ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের Sentence-এ অতীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (**point of time** in the past) একটি কাজ শুরু হয়েছে এটা বোঝানর জন্য নির্দিষ্ট সময়বাচক শব্দ **since** ব্যবহার করা হয় এবং অতীতে একটা সময় ব্যাপ্ত করে (**period of time** in the past) একটা কাজ চলেছে বোঝাতে কালবাচক **For** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। Present Perfect Continuous Tense-এ কোন কাজ অতীতে শুরু হয়ে একটা সময় অতিবাহিত করে বর্তমানেও চলতে থাকে (ওপরে (i) নং এবং (ii) নং বাক্য দেখ)। কিন্তু Past Perfect Continuous-এ কাজটি অতীতে শুরু হয়ে একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অতীতেই অন্য কোন কাজের জন্য শেষ হয়ে যায়, যেমন :

1. আমার মা আমাকে ডাকা পর্যন্ত আমি দু ঘণ্টা ঘুমোচ্ছিলাম—**I had been sleeping for two hours when my mother called me.**

2. বৃষ্টি আসার আগে তিন ঘণ্টা ধরে শ্রমিকেরা মাটি খুঁড়ছিল—**The workers had been digging the soil for three hours when the rain came.**

লক্ষ্য কর যে 1 নং বাক্যে মা ডাকা পর্যন্ত একটা সময় (দু ঘণ্টা) ধরে আমি ঘুমোচ্ছিলাম। আমার ঘুম শুরু হয়েছিল অতীতে, চলেছিল অতীতে একটা সময় ধরে এবং শেষ হল অতীতেই, যখন আমার মা আমাকে ডাকলেন। 2 নং বাক্যে শ্রমিকদের মাটি কাটার কাজ শুরু হয়েছিল অতীতে, চলেছিল অতীতে একটা সময় (তিন ঘণ্টা) ব্যেপে এবং বৃষ্টি আসার কারণে সেই কাজ অতীতেই বন্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই সমস্ত ব্যাপারটা অতীতকালের একটা সময়ব্যাপী সংঘটিত। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, Continuous Tense-এর action (ক্রিয়া) যদি Prolonged (প্রলম্বিত) হয় তবে সেখানে Perfect Continuous Tense ব্যবহার করতে হবে।

TASK

এই সেই গ্রাম যেখানে (This is the village where···) শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেটা ছিল বাঙলা ১২৮৩ সালের ৩১ ভাদ্র। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে অনেক বছর ধরে স্থানীয় মানুষেরা (local people) শরৎ মেলা পরিচালনা করছেন। আমরা গতকালও এখানে এসেছিলাম। কিন্তু দেরি করে ফেলেছিলাম। তাই বাউল গানের অনুষ্ঠানটি (programme) ধরতে পারিনি। আমরা আসার আগেই রাজু বাউল গান গেয়ে চলে গিয়েছিলেন। তবে গতকালের লোক-সঙ্গীত (folk-songs) শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কয়েকজন যুবক প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে গানগুলো গাইছিল। খুব সুন্দরভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়েছিল (was conducted).

LETTER WRITING

মাধ্যমিক পরীক্ষায় দু ধরনের Letter সাধারণত এসে থাকে : ১. আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে চিঠি—যাকে Private বা Personal Letter বলা হয়, এবং ২. বিদ্যালয় প্রধানের নিকট চিঠি—যা Official Letter-এর পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তোমাদের এই দু ধরনের চিঠি লেখার **practice** বেশি করে করতে হবে। চিঠির শ্রেণীবিভাগ (classification) এবং তার বিভিন্ন অঙ্গ (The Parts of a Letter) সম্বন্ধে তোমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছ। এবার তোমরা সরাসরি Private বা Personal Letter-এর কয়েকটি নমুনা দেখে ব্যাপারটা আরও

পরিষ্কার করে নাও। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট লেখা Official Letter নিয়ে পরবর্তী সংখ্যায় চর্চা করা যাবে।

Personal বা Private Letter লিখতে যাওয়ার আগে একটা কথা স্মরণে রেখ। তুমি যে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু বান্ধবকে তোমার কিছু কথা জানাতে চাইছ বা তাঁদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাইছ সেইসব মানুষ যদি তোমার সামনে থাকতেন তাহলে তোমরা মুখোমুখিই তাঁদের তোমার কথা জানাতে বা তাঁদের কথা জানতে চাইতে। চিঠি লেখার দরকারই হত না। যেহেতু তাঁরা তোমার সামনে নেই সেইজন্যই তোমাকে চিঠি লিখতে হচ্ছে। চিঠিকে বলা হয়, 'A visit on paper' সুতরাং Letter-এর ভাষা (language) সহজ সরল হতে হবে। অবশ্য, চিঠি লেখাও যে একটা শিল্পকার্য বা art সেটাও ভুলে গেলে চলবে না। আর, তাছাড়া formalities বা রীতিগত সৌজন্যমূলক ব্যাপারগুলো ত আছেই। যাই হোক, নিচের Letterটি ভাল করে দেখ।

1. A letter to your mother about your life in the hostel.

S.K.S.M. Boys' School Hostel
22, Raja Manindra Road,
Calcutta-700 037
16th July, 1982.

(1. The Heading)

My dear Mother ;

Dearest Mother,

(2. Salutation or the Courteous Greeting)

(3. The communication or the body of the letter).

I was so glad to receive your affectionate letter yesterday. I read it just after our classes were over, but it made me feel homesick. You are anxious to learn how I feel here in my hostel. It seems years since I left home though it is really only about a few months. It again seems ages to the Puja holidays, when I shall be able to come home. I was much happier when I came home everyday after school.

Frankly speaking, I don't like the life of a boarder. The hostel is big. There are provisions for co-curricular activities. Our Superintendent is also very good. Yet I feel that I miss something. May be, I miss you most.

Please ask father to get me back home by the end of the year. I should be much happier there.

Mrs. Ila Banerjee
C/o. Sri B. K. Banerjee
4, Khalisakota
Calcutta-700081
(6, The Superscription) .

With Pronams
Yours affectionately
(4, The Subscription or, Courteous Leave-taking or conclusion)
Bappa
(5, The Signature)

এই চিঠিতে সংখ্যা দিয়ে চিঠির যে ছটি অংশের নাম দেওয়া হয়েছে তোমরা যেন পরীক্ষার খাতায় বা বাড়িতে ওরকম লিখ না। ওটা শুধু তোমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য দেওয়া হল। Salutation অংশে যে দুটো সম্বোধন দেওয়া আছে তার একটা লিখবে এবং তার পরে অবশ্যই কমা (Comma) দেবে। My dear Mother—এই সম্বোধন লেখবার সময় dear-এর

d'small letter হবে। কিন্তু Mother-এর M Capital হবে। অনুরূপভাবে My dear Father, My dear Brother ইত্যাদি। Heading অংশে সবার নিচে date বসাবে। এটা ভুলো না। Communication বা body of the letter অংশটি প্রয়োজনমত বিষয়বস্তু ও ভাবনা অনুসারে Paragraph ভাগ করে লিখবে। Subscription অংশে Comma যেখানে যেমন আছে দিতে হবে। তা সে with Pronams-এর জায়গায় with regards, with compliments, with love ইত্যাদি থাকুক ; আর yours affectionately-র স্থলে your loving son বা ঐ জাতীয় যাই-ই থাকুক, yours affectionately / truly / sincerely ইত্যাদিতে yours ব্যবহার করবে, your নয়। Yours শব্দটি লেখার সময় খেয়াল রাখবে যে ওখানে s-এর আগে যেন apostrophe (') না ব্যবহার করে বস। করলে খুব ভুল হয়ে যাবে। কারণ, এটা কোন Possessive Case (সম্বন্ধ পদ)-এর ব্যাপার নয়।

এবারে তোমার বন্ধুকে লেখা চিঠির একটা নমুনা দেখ।

2. A letter to your friend thanking her / him for sending you a present on your birthday.

P.O. Taki
24 Parganas
16.6.82

My dear Rupa,

Yesterday I expected you every moment. Soma, Krishna, Madhumita and many others came. I missed you much.

Thanks for your nice present. I got so many beautiful and costly presents, but yours was the most artistic and hence the most attractive. I had been so long wishing to have a handy photo-frame. All the members of our family and the invitees spoke very highly of your present. How pleasant it would have been if I could have received it from your own hands ! Once more I thank you.

With love,
Cordially yours,
Uma

Miss Rupa Roy
C/o. D. K. Roy, Advocate
32, Ananta Dutta Sarani
Calcutta-700051

TASK

তোমার বন্ধুর জন্মদিনে যেতে পারলে না বলে দুঃখ প্রকাশ করে একখানা চিঠি লিখে রাখ। চিঠির সঙ্গে একটা প্রীতি উপহার পাঠাচ্ছ সেটাও যেন উল্লেখ থাকে। (Write a letter to your friend regretting your inability to attend his / her birthday ceremony and requesting him / her to accept the present you send with the letter).

দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

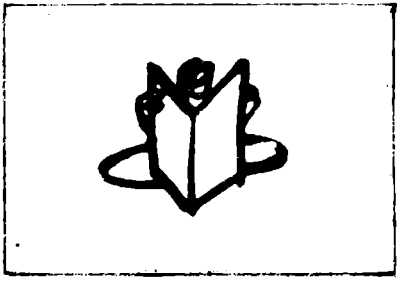

ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি

খ্রি. পূ. ৪র্থ শতক থেকে ১৪শ শতক পর্যন্ত (২)

শিল্প-বাণিজ্য

আদিম মানুষের শিল্প-বাণিজ্যের কোন চিন্তা ছিল না। শিকারের হাতিয়ার হিসাবে ধারাল পাথরের আঘাত-হানার অস্ত্র হয়ত কেউ কেউ অন্যের চেয়ে ভাল বানাতে পারত, কোন কোন সৌখিন ব্যক্তি ঐসব স্থূল অস্ত্রশস্ত্রেও নকশা কেটে বা ভাল হাতল লাগিয়ে রুচিবোধের পরিচয় দিত। আসল শিল্প-বাণিজ্য এল যখন মানুষ চাষ আবাদের মাধ্যমে স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলল, জীবনযাত্রা হল নিরাপদ। উৎপাদন হতে লাগল প্রচুর, নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে এক এক গোষ্ঠীর লোক অপরের চাহিদা মেটাতেও তৎপর হল। খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিবিধ কৃষি সরঞ্জাম তৈরির জন্য যেমন কতক লোক হল পারদর্শী, তেমনি খাদ্যের অতিরিক্ত বস্তু সামগ্রী, যেমন পরিচ্ছদ, নানা সৌখিন দ্রব্য, অলংকার, গৃহ নির্মাণের উপকরণ, শিল্প-কলার বস্তুনিচয় উৎপাদন ও সরবরাহ করার বিপুল কর্মোদ্যম দেখা দিল। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করলে, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন সহজে মিটে গেলে, কর্মের প্রেরণা মানুষকে নতুন নতুন উদ্যোগের পথে উৎসাহিত করে। তখন মানুষের কর্মক্ষেত্র হয় বহুধা বিচিত্র ও বহু দূরবিস্তৃত। ঠিক এমনি সুযোগ এসেছিল মৌর্য আমল থেকে যখন দেশে সুশৃঙ্খল শাসন বিরাজিত, উত্তর-পশ্চিম ভারতের উন্মুক্ত পথ দিয়ে একদিকে ইউরোপ আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত, অন্য দিকে মধ্য এশিয়ার দুর্গম পথ দিয়েও সুদূর চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেন-দেনের জানালা মুক্ত।

শিল্প সমবায়

সমাজ সমৃদ্ধ হলে নিছক খাওয়া-পরার অভাব মিটলেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না: শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দিয়ে কর্মীদের প্রতিভা ও সৃজনশক্তির বিকাশে সাহায্য করে। আমরা এর উদাহরণ দেখতে পাই মৌর্যযুগে, গুপ্তযুগে, মধ্যযুগের শেষ পর্বে ইতালীর রেনেসাঁ বা নবজাগরণে। বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে মানুষের হাতে যে অর্থ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার কল্যাণে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সাহিত্য অপরূপ লাবণ্যে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। মৌর্যযুগে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল।

দেশের মধ্যে চাষীর পরেই ছিল কারু-শিল্পীদের সংখ্যাধিক্য। কর্মকার, সূত্রধর কুম্ভকার, তন্তুবায়, প্রস্তরছেদক, দক্ষ ভাস্কর, গৃহনির্মাণ শিল্পী প্রভৃতি কারিগর দেশের আর্থিক উন্নতি সম্পাদনে অবদান যুগিয়েছিল। বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের সমিতি বা সমবায় ছিল যার ফলে এরা সংঘশক্তি এবং কর্মকুশলতার সঙ্গে নিজ নিজ কর্ম-ক্ষেত্রে নিপুণতা ও উৎকর্ষ লাভ করেছিল। উত্তম শিল্পবস্তুর চাহিদা শুধু দেশের মধ্যে নয়, বিদেশেও ছিল যথেষ্ট। হাতির দাঁত ও সোনা রুপার কারুকার্যখচিত অলংকার, বাঙলার সাদা কোমল দুকুল' মসলিন, উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ সুখস্পর্শ রেশম ও

সূতী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হত প্রচুর পরিমাণে। এইসব দ্রব্যের উৎপাদনকারীদের, বিশেষ করে সূক্ষ্মকর্মনিপুণা মহিলা কর্মীদের খ্যাতির সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও জুটেছিল।

বাণিজ্য

বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশে লক্ষ্মীর আগমন ঘটে। দেশের শিল্প সামগ্রী, কৃষিজ পণ্য শুধু নিজেদের ভোগে লাগালে ভোগতুষ্টি হয় বটে কিন্তু দেশের সম্পদ বাড়ে না। মৌর্যযুগ যেমন রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের পক্ষে গৌরবের যুগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, তেমনি এটি আর্থিক সমৃদ্ধিরও যুগ। ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে, ভারতের যে বাণিজ্য চলত তাতে এদেশে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উপচিয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ একদিকে মালয় ও চীন, অন্যদিকে ইউরোপ—এর মধ্যবর্তী পণ্যসরবরাহ অঞ্চল রূপে বণিকদের স্বর্ণভূমি স্বরূপ হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের আরিকামেডু, পশ্চিম উপকূলের ভৃগুকচ্ছ হয়েছিল কর্মচঞ্চল বাণিজ্যবন্দর। ভারতের মশলা, বিলাস সামগ্রী, মণিমুক্তা, বস্ত্র, বিবিধ কৌতূহলোদ্দীপক প্রাণী যেমন বানর, তোতা ও ময়ূর—রোমানদের কাছে খুবই লোভণীয় ছিল। রোমান সাম্রাজ্য থেকে ভারতীয় বণিক এমন বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করত যে, রোমান ঐতিহাসিকগণ সখেদে বলেছেন রোমের সোনা ভারতে গিয়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থান খুঁড়ে যে প্রচুর পরিমাণ রোমান স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে তা থেকে ভারতের অনুকূলে বাণিজ্যের প্রমাণ মেলে। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির হিসাবমত ভারত পণ্যের মূল্য হিসাবে বছরে ৫৫ কোটি দিনার বা মোহর আয় করত।

তোমাদের মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগতে পারে: সে যুগে ব্যবসা বাণিজ্য চলত কিভাবে, বিশেষ করে অপর মহাদেশের লোকেদের সঙ্গে?

উত্তরে বলি—প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতবর্ষ কখনই বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তোমরা দেখেছ, সিন্ধু সভ্যতার যুগে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগের পথ ছিল বলেই ত আর্যরা বাইরে থেকে আসতে পেরেছিল। তারপর ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আগমন উৎসাহী বণিকদের কাছে পারস্য সাম্রাজ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। পারসিকদের পরে এল গ্রীকরা; তারা স্থলপথ ছাড়াও সমুদ্র উপকূল দিয়ে যাতায়াতের পথ সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া হিমালয়ের উত্তর দিকের মালভূমির ওপর দিয়ে পথ দুর্গম হলেও বণিকদের কাছে অজানা ছিল না।

ব্যবসা বাণিজ্য কিভাবে চলত, তার উত্তর দিতে আমরা প্রশ্নটিকে দু'ভাগে ভাগ করে নিই: **(১) ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথ; ও (২) বহির্ভারতীয় বাণিজ্যপথ।**

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথ

ভারতের ভিতরে বাণিজ্য চলত স্থলপথে ও নদীপথে। পরিবহণ কাজে ব্যবহার হত গোশকট ও কাঠের নৌকা। পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের গল্পে, জাতকের গল্পে শত শত গরুর গাড়িতে পণ্যদ্রব্য দূর অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে, নদীপথে মালপত্র বড় বড় শহরে ও সাগরকূলে বন্দরে নিয়ে যাওয়া হত। কারুশিল্পী হিসাবে কাঠের মিস্ত্রিদের বেশ প্রাধান্য ছিল। দেশের মধ্যে পথঘাট নির্মাণ ও

রক্ষণাবেক্ষণের সুবন্দোবস্ত ছিল, একথা মেগাস্থিনিস উল্লেখ করেছেন ; বন্দরে এবং কর-আদায় চৌকিতে বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিল।

বহির্বাণিজ্য

ভারতের বাইরের দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চলত (ক) স্থলপথে ও (খ) জলপথে। স্থলপথে প্রধান পণ্যবাহী প্রাণী ছিল ঘোড়া, খচ্চর, চমরীগরু, উট প্রভৃতি। জলপথে ব্যবহৃত হত ভারতীয়দের তৈরি কাঠের জাহাজ ও বিদেশী বণিকদের জাহাজ। আমাদের প্রাচীন ভাস্কর্যে পালতোলা জাহাজের ছবি আছে। ছবি দেখে মনে হয় এগুলি খুব বড় ছিল না। প্লিনি বলেছেন, ভারতীয় বড় জাহাজ হত ৭৫ টনের। ৩, ৫ এমনকি ৭ শত যাত্রী বহন করত এমন জাহাজের উল্লেখ ভারতীয় সাহিত্যে আছে।

তোমরা যদি ভারতের সঙ্গে বাইরের দেশগুলির বাণিজ্য পথের আরও বিস্তৃত বিবরণ জানতে চাও, তবে বলি :

স্থলপথ

- বহু-ব্যবহৃত পথ ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের তক্ষশিলা থেকে কাবুল : কাবুল থেকে এই পথ নানাদিকে বিভক্ত হয়ে যেত—উত্তরমুখী পথ ব্যাকট্রিয়া, অকসাস নদী, কাসপিয়ান সাগর হয়ে কৃষ্ণসাগর তীর পর্যন্ত ;
- কাবুল থেকে হিমালয়ের উত্তরস্থিত মালভূমির ভিতর চীন অভিমুখে পথ। যা প্রাচীন রেশম পথ নামে খ্যাত হয়েছিল, পথ রেশমের মত মোলায়েম বা সুখপ্রদ বলে নয়, এ পথে আকাঙ্ক্ষিত পণ্য রেশম দেশ থেকে দেশান্তরে যেত। পথ ছিল ভয়ংকর, দুর্গম।
- একটি পথ কান্দাহার ও হিরাট হয়ে একটানা ;
- অন্য একটি পথ কান্দাহার থেকে পারস্যের রাজধানী পার্সিপোলিস ও সুসা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

জলপথ

- সমুদ্রের উপকূল বরাবর বাণিজ্য জাহাজ আরবসাগর দিয়ে পারস্য উপসাগর হয়ে ব্যাবিলন ; কতক বা আরবসাগর হয়ে এডেন, লোহিতসাগর হয়ে বর্তমান সুয়েজ-এর কাছে। সেখান থেকে মালপত্র স্থলপথে যেত আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পরে ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপের নানা বন্দরে।
- উপকূল দিয়ে জাহাজ চালাতে সময় লাগত অনেক কিন্তু ভারত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া ত সহজ ছিল না। আরব নাবিকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার অনুকূল বাতাসের সন্ধান পেয়েছিল, যা তাদের ভাষায় 'মৌজিম', এখন মৌসুমী বায়ু নামে খ্যাত। মৌজিম শব্দের অর্থ ঋতু। গ্রীষ্মে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং শীতকালীন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। এ বায়ু ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে একটানা প্রবাহিত হত, তাতে পাল খাটিয়ে বাণিজ্যতরণী ভারতে চলে আসত ; আবার গ্রীষ্মের শেষে উত্তর-পূর্ব মৌসুমীর সাহায্যে ফিরে যেত স্বদেশে।

খ্রিঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর মাঝামাঝি হিপ্পালাস নামে এক গ্রীক নাবিক এই নিয়মিত বায়ুস্রোত আবিষ্কার করেন, অর্থাৎ আরবদের ব্যবহৃত পাড়ি জমানো বাতাসের গতি ও চরিত্র পরিবহণের কাজে লাগান।

পণ্যদ্রব্য

কৌতূহল হতে পারে সে যুগে কি ধরনের বাণিজ্যদ্রব্য এদেশ থেকে বিদেশের

চাহিদা মিটাত, আবার কি জাতীয় দ্রব্যই বা এখানে আসত ?

- খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম দিকে একজন গ্রীক নাবিকের লেখা **পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী** অর্থাৎ পূর্বসাগরের বৃত্তান্ত নামক সামুদ্রিক ভূগোলে কোন কোন পথে বণিকরা কি প্রকার দ্রব্যের লেনদেন করত তার বিস্তৃত বিবরণ আছে।
- ভারত থেকে রপ্তানি হত চাল, গম, বস্ত্র, ক্রীতদাসী, তামা, চন্দনকাঠ, সেগুন এবং ইবনিকাঠ, বিবিধ মশলা, মসলিন, রেশম, নীল,লাপিস-লাজুলাই (উজ্জ্বল নীল পাথর)।
- বিনিময়ে ভারত আজও আনত মুক্তা, উজ্জ্বল রঙ, সুরা, খেজুর, সোনা, ক্রীতদাস, টিন, প্রবাল, দামী পাথর, গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, নানাজাতীয় ঔষধ প্রভৃতি। বাণিজ্যে ভারতের লাভের পাল্লা ছিল ভারী।

মুদ্রা

মানুষ যখন প্রথম সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করেছিল তখন নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বস্তুর বিনিময়ে অপরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করত। এতে অনেক অসুবিধা ছিল। পরে সমাজ-ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল হলে সর্বজনগ্রাহ্য মুদ্রার প্রচলন হয়—উপাদান ছিল বিবিধ ধাতু। প্রাচীন ভারতে যে মুদ্রাগুলি ব্যবহৃত হত তা হল সোনার **নিষ্ক, সুবর্ণ,** এবং **পল** ; রুপোর **শতমন,** তামার **কাকিনি** এবং **সীসার মুদ্রা**। সাধারণের মধ্যে বেশি প্রচলিত ছিল **কার্ষাপণ**—চারটি ধাতু দিয়েই তৈরি হত এবং স্বাভাবিকভাবেই ওজন ও আকৃতি অনুযায়ী এদের মূল্যমানের তারতম্য থাকত। পরবর্তীকালে **কড়ি** ছোট বেচাকেনার কাজে ব্যবহৃত হত।

প্রশ্ন

তোমাদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন রাখছি। উত্তর পাবে আলোচনা থেকেই। ঠিক পরীক্ষার জন্য সাক্ষাৎভাবে কাজে না লাগলেও ইতিহাসের জীবন্ত ধারা অনুসরণ করতে এ জ্ঞান এবং জ্ঞানভিত্তিক মনন বিশেষ উপযোগী।

১. কি কি ধরনের কারুশিল্পে কারিগররা ব্যাপৃত থাকত ?
২. আভ্যন্তরীণ ও বহির্ভারতীয় বাণিজ্য পথের বিবরণ দাও।
৩. আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের একটি মোটামুটি তালিকা প্রস্তুত কর। লাভের ভাগ ছিল কোন দিকে ?
৪. কি ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল, তার বিবরণ দাও।

সংস্কৃতির পরিচয়

প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক 'সংস্কৃতি' বলতে কি বুঝি। Oxford Dictionary-তে Culture কথাটির অর্থ বলা হয়েছে--Development of arts, science etc., in human society. 'চলন্তিকায়' সংস্কৃতির শব্দার্থ— শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পকলা রুচি নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, কৃষ্টি।

অতএব, আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে শিক্ষা, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান-চর্চা প্রভৃতি মনন-কল্পনা-সৃজনীশক্তিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের পরিচয়।

মৌর্যযুগ

খ্রিঃ পূঃ ৩২১ অব্দে নন্দবংশ ধ্বংস করে চন্দ্রগুপ্ত মগধ অধিকার করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মৌর্যবংশ ১৮৫ খ্রিঃ পূর্বাব্দে বংশের শেষ নরপতি বৃহদ্রথ সেনাপতি পুষ্যমিত্রের হাতে নিহত হলে ১৩৬ বৎসরের গৌরবদীপ্ত মৌর্যশাসনের অবসান ঘটে।

মৌর্যযুগ ভারত-ইতিহাসে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ঐক্য ও সমৃদ্ধির যুগ, আন্তর্জাতিক গৌরব ও সম্মানের যুগ, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে অভূতপূর্ব উৎকর্ষের যুগ।

শিক্ষা ঃ

মৌর্য শাসকগণ প্রজাবর্গের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি রীতিমত গুরুত্ব দিতেন। অশোক তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের নানাস্থানে পাহাড়ের গায়ে, গুহায়, শিলাস্তম্ভে অনুশাসনগুলি খোদাই করে দিয়েছিলেন এবং এগুলি এমন স্থানে ছিল যাতে বহুজনের দৃষ্টিগোচর হতে পারে। জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় লেখা অনুশাসন এটাই প্রমাণ করে যে, জনগণ বহুলাংশে সাক্ষর ছিল, নতুবা বহু অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়ে এরূপ লিপির কোন সার্থকতা থাকত না। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের ধারণা 'ঐ সময় ব্রিটিশ আমলের কতক প্রদেশ অপেক্ষা সাক্ষরতার হার বেশি ছিল।'

গুরুকুল ব্যবস্থা অর্থাৎ গুরুগৃহে অবস্থান করে ছাত্রদের বিদ্যার্জন করতে হত। তাছাড়া বৌদ্ধমঠ সমাজে শিক্ষাপ্রসারে সহায়তা করত। মৌর্য শাসকগণ এইসব প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করতেন। বিদ্যার্থীর উচ্চশিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল **তক্ষশিলা** ও **বারাণসী**। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, কারুবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। ধর্মমত-নির্বিশেষে অশোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পোষকতা করতেন।

সাহিত্য ঃ

মৌর্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা না গেলেও এ যুগে ভাষা ও সাহিত্যের বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা এসেছিল, এ কথা বলা যায়। মানুষের সুস্থ সমৃদ্ধ পরিবেশ সবযুগে, সবকালে সভ্যতা-সংস্কৃতি শিল্পসাহিত্যের বিকাশের পক্ষে অনুকূল হয়ে থাকে। এযুগে কৌটিলের **অর্থশাস্ত্র** এবং ভদ্রবাহুর **কল্পসূত্র** সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। অর্থশাস্ত্র মৌর্যশাসনযন্ত্র এবং তৎকালীন সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে। রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক বিশ্বের বিখ্যাত গ্রন্থের অন্যতম হল অর্থশাস্ত্র ইতালীর লেখক ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭) **The Prince** গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে বিশ্বে সুপরিচিত। ম্যাকিয়াভেলীর বহু আগে দেশ শাসনের রাজার কি কি করণীয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন চন্দ্রগুপ্তের বন্ধু দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক চাণক্য (কৌটিল্য)। প্রখর কূটনৈতিক বুদ্ধির ধারক হিসেবে 'চাণক্য' নামটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থ **কথাবস্তু** এবং জৈনশাস্ত্র **ভগবতীসূত্র** ও **আচারঙ্গসূত্র** মৌর্যযুগে রচিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারত মৌর্যপূর্বযুগে রচিত হলেও এদের কিছু কিছু অংশ মৌর্য আমলে মহাকাব্যগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বলে কতক পণ্ডিতের ধারণা।

শিল্পকলা ঃ

মৌর্যযুগে যে স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে তা জানা যায়। তিনি লিখেছেন, চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ তখনকার দিনে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং বিস্ময়কর সৌধ ছিল (finest and grandest in the world)। এর প্রায় সাতশ বছর পর চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন মৌর্যদের প্রাসাদ দেখে এর বিরাটত্বে ও সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, এগুলি মানুষের নয়, দেবতার সৃষ্টি বলে বোধ হয়।

পাটলিপুত্রের প্রাসাদ কাষ্ঠনির্মিত ছিল, স্তম্ভগুলো সোনারূপা মণিমুক্তায় খচিত ছিল। মাটি খুঁড়ে প্রাসাদের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে; সেখানে শত শত স্তম্ভযুক্ত এক

পাটলিপুত্রের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ

বিরাট সৌধের নিদর্শক আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া পাটলিপুত্র নগরের কাষ্ঠ প্রাচীরের অবশেষ মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে।

সম্রাট অশোক সারা রাজ্য জুড়ে বহু স্তূপ নির্মাণ করে বুদ্ধের পুতাস্থি রক্ষা ও অর্চনার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রবাদ এই যে, তিনি ৮৪ হাজার স্তূপ নির্মাণ করেন। এসবের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মধ্য-ভারতের **সাঁচীস্তূপ** এবং **ভারহুত স্তূপ**। সাঁচীস্তূপ ৭৭½ ফুট উঁচু, ১২১½ ফুট ব্যাস-যুক্ত। অশোকের পরবর্তীকালে এই স্তূপের চারদিকে নানামূর্তি খোদিত পাথরের রেলিং ও তোরণ তৈরি করা হয়েছে। গম্বুজাকৃতি স্তূপগৃহ পরিক্রমার জন্য স্তূপের গা দিয়ে ঘোরান পথ। আজও সাঁচীস্তূপ ভক্ত ও দর্শনার্থীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করে।

সাঁচী স্তূপ (সারনাথ)

ভারহুত স্তূপের চারদিক ঘিরে যে প্রস্তর-দেওয়াল ও তোরণ ছিল তার কিছু অংশ কলকাতা যাদুঘরে রাখা আছে। পাথরের গায়ে বুদ্ধজীবনের নানা কাহিনী খোদাই করা। এগুলি দেখলে প্রাচীন ভারতের প্রস্তরশিল্পীদের নিষ্ঠা ও নিপুণ-তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

অশোক বৌদ্ধভিক্ষুদের মঠ এবং অন্যান্য ধর্মের উপাসকদের জন্য গুহা-আবাস নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। গুহাগুলি শক্ত পাথর কেটে তৈরি কিন্তু এর দেওয়াল কাঁচের মত মসৃণ ও উজ্জ্বল। রাজতরঙ্গিনীর লেখক কহ্লন উল্লেখ করেছেন, অশোক শ্রীনগরের ভিত্তিস্থাপন করেন ; নেপালের দেবপত্তন ও অশোক কর্তৃক নির্মিত বলে মনে করা হয়।

ভাস্কর্য ঃ

ভাস্কর্য অর্থাৎ পাথর খোদাই করে মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পকাজে ভারত-ইতিহাসে মৌর্যযুগের তুলনা নেই। সর্বোত্তম উদাহরণ হল অশোকস্তম্ভগুলি পশুমূর্তির ভাস্কর্য। ৫০ থেকে ৬০ ফুট উঁচু প্রায় ৫০ টন ওজনের স্তম্ভ এক-পাথর

থেকে কেটে বের করা এবং গোড়া মোটা, ওপরের দিকে সুশ্রীভাবে ক্রমে-সরু নিটোল আকৃতি কিভাবে দেওয়া হয়েছিল তা এখনও বিস্ময়ের বিষয়। কাঠের সূত্রধাররা কুঁদে চড়িয়ে কাঠ সুগোল ও মসৃণ করেন, চারদিক ঘিরে ঢেউ-এর নক্সা তোলেন কিন্তু ৫০ টন ওজনের একখণ্ড পাথর (গোল করার আগে তা নিশ্চয়ই আরও ভারী ছিল) শিল্পীর হাতে কিভাবে এমন মসৃণ হল। প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষে হাতি, বৃষ, অশ্ব, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর মূর্তি। সারনাথ স্তম্ভশীর্ষ (যেখানে পিঠে-পিঠে বসা চারটি অপূর্ব সুন্দর সিংহ উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত) বিশ্বের এক অনবদ্য ভাস্কর্য। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন। প্রাণীভাস্কর্যে এর মত মনোহর শিল্পকর্ম জগতে নেই, এর চেয়ে উত্তম শিল্পের কথা ত ওঠেই না। বাস্তবোচিত রূপায়ণে, প্রতি অঙ্গ সঠিক প্রকাশে এবং পশুরাজের তেজদীপ্ত

অশোক স্তম্ভের শীর্ষ (সারনাথ)

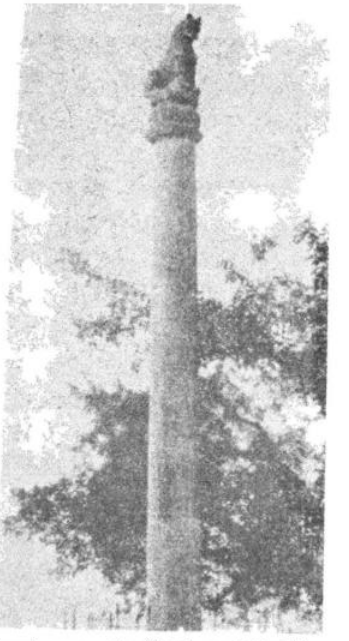

অশোক স্তম্ভ (লরিয়া নন্দনগড়)

মহিমা প্রকাশে সারনাথ সিংহ অতুলনীয়। স্বাধীন ভারতের মুদ্রায় সিংহমূর্তি স্থান দিয়ে অশোকের যুগের শিল্পীর যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পদ্মের ওপর ধর্মচক্র, ধাবমান প্রাণী ও সর্বোপরি সিংহের দৃপ্তভঙ্গি।

স্তম্ভ বা ভাস্কর্য শিল্পের পরিবহণের কিরূপ দক্ষতা ও জনশক্তির প্রয়োজন হত একটি উদাহরণ থেকে তা বোঝা যাবে। ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তোগলক অমৃতসর জেলার তোপারা থেকে অশোক-স্তম্ভটি দিল্লীতে আনার জন্য ৪৮ চাকাযুক্ত এক বিশেষ গাড়ি তৈরি করেছিলেন এবং এটি টেনে আনতে লোক লেগেছিল ৮৪০০ জন! অর্থাৎ শকটের চাকাপ্রতি ২০০ জন মজুর। চলার পথে শকটের ওপর শত শত মণ তূলা বিছিয়ে তার ওপর স্তম্ভ শায়িত রাখা হয়।

অলংকার শিল্প ঃ

বিরাট শুধু আকারের শিল্পকাজই নয়, ক্ষুদ্র আয়তনে নিখুঁত সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে মৌর্যযুগের অলংকার শিল্পের দক্ষতার পরিচয় মেলে। তক্ষশিলায় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কতগুলো অলংকারের নিদর্শন পাওয়া গেছে যা থেকে মণিকারের নিপুণতা সুস্পষ্ট।

স্যার জন মার্শাল বলেছেন, 'সঠিক মাপ এবং নিখুঁত রূপায়ণে মৌর্য শিল্প এথেন্সের স্থাপত্যকেও অতিক্রম করেছে।'

প্রশ্ন

১. কোন বিষয়ে রচিত তা উল্লেখ করে কয়েকটি গ্রন্থের নাম কর। যেখানে সম্ভব গ্রন্থকারের নাম বলতে হবে।
২. মৌর্যযুগে স্থাপত্যের উন্নতির কথা কোন বিদেশীর বিবরণ থেকে জানা যায়?
৩. অশোক কতগুলো স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রবাদ? শ্রেষ্ঠ দুটির নাম উল্লেখ কর।
৪. মৌর্যযুগে শিক্ষার প্রসার কেমন ছিল? প্রমাণ কি?
৫. মৌর্যযুগের দুটি বিখ্যাত বিদ্যাক্ষেত্রের নাম কর।
৬ মৌর্যযুগের ভাস্কর্যের তুলনা নেই—এ কথার কি প্রমাণ দিতে পার? মৌর্য শিল্পকীর্তি এখন মানুষের হাতে হাতে ঘোরে—কথাটির অর্থ?
৭. এগুলো বিস্ময়কর—পাথরের মসৃণতা, পরিবহণ দক্ষতা ও অলংকার তৈরিতে নিপুণতা। প্রমাণ কি?

মনে রাখবে ঃ এ প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় সম্ভাব্য বলে উল্লেখ করা হয়নি। গৌরবময় মৌর্যযুগের কীর্তি অনুধাবন করে তোমরা গৌরব বোধ করবে, এটিই কাম্য।

শুঙ্গ, কান্ব ও আন্ধ্রবংশের যুগ

শুঙ্গরাজত্ব—১৮৫-৭৩ খ্রিঃ পূঃ ; কান্ব ৭৩-২৮ খ্রিঃ পূঃ ; আন্ধ্র খ্রিঃ পূঃ ২৮-২২৫ খ্রিস্টাব্দ

মৌর্যসাম্রাজের পতন ভারত ইতিহাসে আবার অনৈক্য ও ক্ষুদ্রতার যুগের সূচক। অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ার মধ্যে ইতিহাসের কয়েকটি সত্য উদঘাটিত হয়েছে। কালের গতিপথ অনুসরণ করে সাগরের বিশাল ঢেউ ভেঙে পড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে পরিণত হওয়া আমাদের চোখে পড়ে। অহিংস পথে রাজ্যশাসনের প্রবর্তক অশোকের সর্বশেষ বংশধর নিজের সেনাপতির হাতে প্রাণ দিলেন। এও যেন ইতিহাস—নিয়তির নিষ্ঠুর বিদ্রূপ। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। রাজশক্তি কোন বিশেষ একটি ধর্মমতের প্রতি যদি মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় ও একদেশদর্শিতা প্রদর্শন করে, অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মনে নীরবে ক্ষোভ সঞ্চিত হতে থাকে এবং উপযুক্তকালে তা বিস্ফোরিত হয়ে পূর্ব-ব্যবস্থা ওলটপালট করে দেয়। বৌদ্ধদের প্রতি অত্যধিক প্রযত্ন-হেতু সমাজে ব্রাহ্মণদের মনে ক্রোধ জমা হতে থাকে। পুষ্যমিত্র রক্তপাতের ভিতর দিয়ে মৌর্য সিংহাসন অধিকার করেন এবং ব্রাহ্মণ্যবিধি অনুযায়ী অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বৌদ্ধদের প্রভাব খর্ব করে দেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঃ

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সংস্কৃত ভাষা পুনরায় রাজসভার ভাষার মর্যাদালাভ করে। বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধ-ধর্মবিরোধী, মঠনাশক এবং বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারী বলে বর্ণনা

করা হয়েছে কিন্তু শুঙ্গদের আমলেই ভারহুতের স্তূপের চতুর্দিকে কারুকার্যখচিত রেলিং স্থাপিত হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় শাসক হিসেবে গোঁড়াহিন্দু পুষ্যমিত্র অন্যধর্মদ্বেষী ছিলেন না।

শিল্প সাহিত্য ঃ

শুঙ্গ রাজারা শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধস্তূপের রেলিং এবং কার্লের চৈত্যগৃহ শুঙ্গ আমলের স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য-শিল্পের উত্তম নিদর্শন।

বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত বৈয়াকরণ পতঞ্জলি শুঙ্গরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এ যুগে রামায়ণ ও মহাভারত পূর্ণাঙ্গ আকার লাভ করে; হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বই **মনুস্মৃতি** এ যুগে সংকলিত হয়েছিল।

শুঙ্গ আমলকে ভারতের ইতিহাসে গৌরবময় গুপ্তযুগের ঊষাকাল বলা যায়।

কান্ব আমল ঃ

কান্বগণ মাত্র ৪৫ বছর রাজত্ব করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে সমাজ ও দেশের পক্ষে স্থায়ী এবং সুদূরপ্রসারী কোন কর্মকাণ্ড সম্ভব নয়। তবু রাজাদের হিন্দুধর্মপ্রীতি ও শিল্প সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ধর্মের নব উদ্যমকে উৎসাহিত করেছিল।

আন্ধ্র আমল ঃ

কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অন্ধ্র অঞ্চলের শাসকগণ আন্ধ্র নামে পরিচিত। এদের রাজত্বকাল আড়াইশ বছর। আন্ধ্রগণ হিন্দু ও সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার সমর্থক ছিলেন। ভারতের ঐতিহ্য অনুযায়ী শাসকগণ স্বধর্ম পালনে রত থাকলেও অন্য ধর্মের শত্রু ছিলেন না। অন্ধ্ররাজ হল **'সত্তসই'** (সপ্ত-শতক) নামে প্রাকৃত গ্রন্থের রচয়িতা। এই যুগে গুণাঢ্য রচিত **'বৃহৎকথা'** মনোরম গল্পের আকর হিসেবে এখনও সমাদৃত।

গুপ্তযুগ

গুপ্তযুগকে ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। কেন? 'স্বর্ণযুগ' বলতে কি বুঝি? সোনা আকর্ষণীয় মূল্যবান ধাতু। উত্তম আদরের কোন জিনিসকে তাই সোনার সঙ্গে তুলনা। গুপ্তযুগ কি কি কারণে এই অভিধা লাভ করেছে, দেখা যাক।

আর্থিক সমৃদ্ধি ঃ

যত উচ্চচিন্তা, শিল্পপ্রতিভা বা কর্মদক্ষতাই থাক না কেন, আর্থিক সমৃদ্ধি বিনা সমাজের মানুষের সুখ চেতনার স্ফুরণ ঘটে না। শাস্ত্রে ঠিকই বলেছে 'দারিদ্র্যদোষঃ গুণরাশিনাশী', দারিদ্র্য সব গুণের নাশক। গুপ্তযুগে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দরুন দেশের মধ্যে ধনসম্পদ অঢেল হয়ে উঠেছিল। গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা ঐশ্বর্যের সাক্ষী।

শান্তি-শৃঙ্খলা ঃ

দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে যদি শাসন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে তবে মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না। অন্যায়কারী উচ্ছৃঙ্খল শক্তি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের নিদ্রা কেড়ে নেয়। বস্তুত শিথিল শাসন এবং আর্থিক সমৃদ্ধি একসঙ্গে চলতে পারে না। গুপ্তরাজারা সুশাসন প্রবর্তন করে মানুষকে নিরুদ্বেগচিত্তে জ্ঞানচিন্তা ও সৃষ্টিমূলক কাজে আত্মনিয়োগের সুযোগ দিয়েছিলেন। সারা দেশে শান্তি বিরাজিত, প্রজাবর্গ নিরুপদ্রবে নিজ নিজ বাঞ্ছিত কর্মে নিযুক্ত। এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যিনি রাজ্যময় ভ্রমণ করে কোথাও আইনভঙ্গকারী কুকার্য দেখতে পাননি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এসে তিনি ৬ বছর ভারতে ছিলেন।

ফা-হিয়েন কি বলেছেন? তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, ভারত তখন ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। লোকের জীবন ছিল সুখশান্তিময়। সুশাসন গুণে প্রজারা স্বচ্ছল

স্বাধীন জীবনযাপন করত। প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল অক্ষুণ্ন। জনসাধারণ ছিল সৎ, বিশ্বাসভাজন উদার এবং পরোপকারী। প্রবঞ্চনা, চুরি ডাকাতি অজ্ঞাত ছিল।

শিক্ষা-সাহিত্য ঃ

আর্থিক সম্পদ এবং সুশাসন শিক্ষা সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তদুপরি শাসক যদি শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী হয় তবে ত সোনায় সোহাগা। গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রমরমা অবস্থা। নালন্দা, তক্ষশিলা, সারনাথ, অজন্তায় ছাত্রদের উচ্চশিক্ষাচর্চার সুব্যবস্থা ছিল। দেশ এবং দেশান্তরের বিদ্যার্থী সমবেত হত জ্ঞানার্জনের আগ্রহে।

সাহিত্যে গুপ্তযুগের কীর্তি ভারত-সংস্কৃতির অম্লান কীর্তি বলে পরিগণিত। কালিদাস ভারতের মহাকবি, বিশ্বের মহাকবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়ারের সঙ্গে একাসনে সমাদৃত। বিশাখ দত্তের **মুদ্রারাক্ষস** নাটক, অভিধানকার অমর সিংহের **অমরকোষ**, ভারবির **কিরাতার্জুনীয়**, শূদ্রকের **মৃচ্ছকটিক**, আনন্দদায়ক নীতি-কাহিনীর আকর **পঞ্চতন্ত্র** গুপ্তযুগের অমর সাহিত্য। বিবিধ পুরাণ এবং মহাভারত ও মনুস্মৃতি এই যুগে বর্তমানের আকার ও বিষয় বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছিল। সাহিত্য কালজয়ী। গুপ্তযুগ সাহিত্যসম্পদের জন্য অবিস্মরণীয়।

বিজ্ঞান ঃ

বিজ্ঞানে গুপ্তযুগে যে মনীষার প্রকাশ ঘটেছিল তার দীপ্তি এখনও উজ্জ্বল। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অসাধারণ গণিতবিদ, ভারতীয় সিদ্ধান্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের (সায়েন্টিফিক অ্যাস্ট্রনমি) প্রতিষ্ঠাতা **আর্যভট্ট**-এর কথা। গ্রীকদের কাছে ইনি পরিচিত ছিলেন অর্দুবেরিয়স নামে, আরবীয়গণ এঁকে উল্লেখ করতেন অর্জভর নামে। আর্যভট্টই সর্বপ্রথম দিন-রাত্রি ভেদের কারণস্বরূপ পৃথিবীর আহ্নিক-গতির কথা প্রচার করেন। তাঁর প্রায় হাজার বছর পরে কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রিঃ) ইউরোপে এই তত্ত্ব প্রচার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। আর্যভট্ট যেমন বিজ্ঞান-চর্চার সার্থক পথপ্রদর্শক, তাঁর শিষ্যমণ্ডলীও তেমনি যোগ্য উত্তরসাধক। বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে আছেন লাটদেব, প্রথম ভাস্কর এবং লল্ল। গুণগ্রাহীদের কাছে আর্যভট্ট সর্বসিদ্ধান্তগুরু নামে পূজিত হয়েছিলেন। আর্যভট্টের গ্রন্থের নাম 'আর্যভটীয়', মাত্র ১২১টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। সংস্কৃতে লেখা।

[তোমরা লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' সর্বসিদ্ধান্ত-গুরু আর্যভট্টের নামে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ নীরবে এইটেই বলা হয়েছে, মহাকাশ গবেষণার ব্যাপারে গুপ্তযুগের জ্ঞানবৃদ্ধ আর্যভট্ট সর্বাগ্রে স্মরণীয়।]

গুপ্তযুগের অপর বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' রচয়িতা ব্রহ্মগুপ্ত, জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা **বরাহমিহির** যাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও জ্যোতিষগ্রন্থ বৃহৎসংহিতা বিখ্যাত।

ভাস্কর্য ঃ

গুপ্তযুগ ভাস্কর্য অর্থাৎ মূর্তিশিল্পের চরম উৎকর্ষের যুগ ; এ যুগের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু বুদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর নয়নলোভন মূর্তি। বারাণসীর নিকট সারনাথের বুদ্ধ-মূর্তি ভারতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। মথুরা ও অন্যান্য স্থানের পাথর ও ব্রোঞ্জনির্মিত বুদ্ধমূর্তি, ঝাঁসী জেলার দেওগড়ে দশাবতার মন্দিরে পাথরে খোদাই শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতার মনোরম মূর্তি এই যুগে নির্মিত হয়। এগুলি ভারতের শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বুদ্ধ (সারনাথ—৫ম শতাব্দী)

সুচারু গড়ন, মনোহর দেহভঙ্গি, লাবণ্য ও দেবমহিমামণ্ডিত ভাব—সব কিছু মিলিয়ে মূর্তিগুলোতে অপূর্ব সুষমার প্রকাশ।

ঢালাই শিল্প :

গুপ্তযুগে লৌহ ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদির ঢালাই শিল্পও বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিল। হিউয়েন-সাঙ নালন্দায় ৮০ ফুট উঁচু তামার এক বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন। বিহারের সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত ৭½ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জমূর্তি ভাস্কর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মূর্তিটি বর্তমানে বার্মিংহাম মিউজিয়ামে রক্ষিত।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভটি গুপ্তযুগের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। কাচের মতন মসৃণ মরিচাবিহীন, ঢালাই করা এই বিশাল স্তম্ভ বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানের যুগেও বিস্ময়কর শিল্পকাজ। বিদেশী ঐতিহাসিকদের মতে এটি বিশ্বের বিস্ময়, এর নির্মাণকৌশল একটি বিলুপ্ত শিল্প (lost art)।

চিত্রশিল্প

গুপ্তযুগের চিত্র বর্ণসুষমায়, অঙ্কন-নৈপুণ্যে ও বিষয়বস্তুর মনোহারিত্বে ভারতের গৌরবের বস্তু। মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত অজন্তাগুহা ঔরঙ্গাবাদ ও মধ্য-ভারতের বাঘগুহার চিত্রগুলি অধিকাংশই গুপ্তযুগের সৃষ্টি। চিত্রগুলোতে বুদ্ধের জীবনের ঘটনা, তৎকালীন রাজসভা ও সমাজের কিছু কিছু দৃশ্য ও মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী শিল্পীর তুলির টানে জীবন্ত হয়ে আছে। প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার ছবিগুলি এখনও দর্শককে মুগ্ধ করে। এ গুলি ভারতীয় চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। অজন্তাগুহায় ছবির সঙ্গে কিছু প্রস্তরমূর্তিও দর্শনীয়।

মুদ্রা

গুপ্তসম্রাটদের স্বর্ণমুদ্রায় যে চিত্র অঙ্কিত তা যেমন অনুপম, এসবের গঠন ও পারিপাট্যও উৎকৃষ্ট শিল্পকাজের পরিচায়ক। গুপ্ত আমলে এসব মুদ্রা ভারতের নানা অঞ্চলে প্রচারিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গেও নানাস্থানে বর্তমান আধুলি সাইজের খাঁটি-সোনার সুন্দর মূর্তিযুক্ত মুদ্রা পাওয়া গেছে। ২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুর গড় থেকে এমনি কয়েকটি মুদ্রা স্থানীয় লোকেরা মাটি খুঁড়ে পায় যাতে তীর-ধনুক হাতে রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য একপিঠে, অন্য পিঠে পদ্মের ওপর আসীন লক্ষ্মীমূর্তি।

গুপ্তযুগ সম্বন্ধে কি ধারণা হল ?

এ প্রশ্নের উত্তর তোমরাই দেবে, আমি শুধু এ যুগের কীর্তির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি :

ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশে অর্থাগম ; ন্যায়নিষ্ঠ সুশৃঙ্খল শাসনগুণে

সমাজে শান্তি বিরাজিত ; রাজারা উদার ধর্মপরায়ণ ; সাহিত্যকীর্তিতে উজ্জল ; এ যুগের রচিত কাব্য নাটক আজও পৃথিবীতে সমাদৃত ; বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্রে যে প্রতিভার স্ফূরণ হয়েছিল তার ধারা এখনও অব্যাহত ; ঢালাইশিল্পে, ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় অতুলনীয়, মুদ্রাশিল্পে অনুপম। যে যুগের সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে মানুষের আনন্দ, জ্ঞান ও নবপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে তাকে 'স্বর্ণযুগ' বলে স্বীকৃতি দেবে নিশ্চয়ই।

হর্ষবর্ধনের আমল

ভারত-ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের আমল একটি একাঙ্ক নাটকের মত। রাজত্বকাল মাত্র ৪১ বৎসর, সাম্রাজ্যের আয়তন গুপ্তযুগের চেয়ে অনেক ছোট, আইন-শৃঙ্খলার অবস্থার অবনতি ঘটেছে তবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত। এ যুগের সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যিনি হর্ষের বন্ধু, বুদ্ধের ভক্ত এবং নিষ্ঠাবান পণ্ডিত।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে সে সময়ে লোকের জীবনযাত্রা কেমন ছিল জানা যায় :

পোষাক-পরিচ্ছদ : সাধারণের পোষাক ছিল অন্তর্বাস এবং তার উপর সেলাইবিহীন উত্তরীয়।

খাদ্য : সরল এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন —দুধ, ঘি, চাল, তরকারি। পেঁয়াজ-রসুন কদাচিৎ ব্যবহার হত। মাংসের ব্যবহার ছিল আরও কম।

বাসগৃহ : সাধারণত ইটের বাড়ি, চূণকাম করা ; ছাদ খড় দিয়ে তৈরি, কাঠের সিলিং-এর উপর পোড়া বা আপোড়া টালি ; ঘরের মেঝে গোময় মার্জিত এবং অভ্যন্তর পুষ্পে সজ্জিত। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য হলঘর এবং বৌদ্ধমঠ ইত্যাদির গঠন ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়।

পরিচ্ছন্নতা : ভারতবাসী সাধারণত পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। আহারের পূর্বে স্নান, এদের বিধেয় রীতি। কসাই, মৎস্যজীবী, ঝাড়ুদার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নগরের বাইরে বাস করত।

নৈতিক জীবন : সত্যবাদিতা, বদান্যতা অতিথিপরায়ণতা ভারতবাসীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

নারীর স্থান : পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল না কিন্তু সতীদাহ অনুষ্ঠিত হত। হর্ষের জননী যশোমতী দেবী সতীর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ভগিনী রাজ্যশ্রী স্বামীর মৃত্যুর পর চিতায় আরোহণ করতে যাওয়ার সময় নাটকীয়ভাবে হর্ষ তাঁকে রক্ষা করেন।

জীবিকা : চাষ আবাদ, পশুপালন, ব্যবসাবাণিজ্য, কুটিরশিল্প ছিল লোকের উপজীবিকা। স্থল ও জলপথে প্রতিবেশী-দেশগুলির (চীন,পারস্য) সঙ্গে বাণিজ্য চলত।

মুদ্রা : লেনদেনের মাধ্যম ছিল সোনা ও রুপার মুদ্রা এবং কড়ি।

শিক্ষা সংস্কৃতি : হর্ষবর্ধনের প্রধান কৃতিত্ব শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং নিজের সাহিত্যসৃষ্টি। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, মন্দির ও বৌদ্ধমঠে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বসবাসকারী ছাত্ররা বিদ্যাভ্যাস করত। উচ্চশিক্ষার জন্য তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, গয়া ও নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশবিদেশের শত শত ছাত্র জ্ঞানার্জন করত। বহু বিষয় এবং ঐসবের কৃতবিদ্য অধ্যাপকদের খ্যাতি বিদেশেও বিস্তৃত হয়েছিল।

হর্ষ নিজে ছিলেন কবি ও নাট্যকার। সংস্কৃতে লেখা তাঁর নাটক **রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, ও নাগানন্দ,** এখনও

সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন করে। হর্ষের অনুরাগী কবি সাহিত্যিক ছিলেন 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' রচয়িতা বাণভট্ট ; অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মাতঙ্গ, ভর্তৃহরি, জয়সেন প্রভৃতি।

এতক্ষণ উত্তর ভারতের ইতিহাসের ওপরই আমাদের দৃষ্টি ছিল। এবার দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক অবদান

উত্তর ভারতের কথাই ভারত ইতিহাসের বেশির ভাগ স্থান জুড়ে আছে। তবু শক্তিমান শাসক কোন কোন যুগে উত্তর থেকে দক্ষিণে সৈন্যবাহিনী নিয়ে গেছে, কখনও বা দক্ষিণের রণডঙ্কা উত্তর ভারতের প্রান্তরেও ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় এখন 'রণডঙ্কা' শব্দ নাহি তোলে / জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে।' কিন্তু শিল্পরসিক যেসব নৃপতি স্থাপত্য ভাস্কর্য গড়ে তুলেছিলেন সেইসব কীর্তি এখনও জয়ধ্বনি দিচ্ছে। স্রষ্টাদের এমনি কয়েকটি শিল্প নিদর্শনের কথা বলি।

ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির ঃ রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ (আনুঃ ৭৫৬-৭৭৩ খ্রিঃ) কতৃক নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির এক অতুলনীয় কীর্তি। বর্তমান ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইলোরায় একটি সমগ্র পাহাড় কেটে অপূর্ব কারুকার্য সমন্বিত মন্দির তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে একটি পাহাড়ের শীর্ষ ও পাশের পাথর কেটে ফেলে ২৭৬ ফুট দীর্ঘ, ১৫৪ ফুট চওড়া এবং ১০৭ ফুট উঁচু একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বের করা হয়। তারপর সেই বিশাল প্রস্তরখণ্ডের ওপরের অংশ থেকে পাথর কাটতে কাটতে মন্দিরের চূড়া, অলিন্দ, স্তম্ভ, অভ্যন্তর গৃহ নির্মিত হয়। দেওয়ালের গায়ে বিবিধ মূর্তি ও অলংকরণ খোদিত হয়। সাধারণ প্রস্তর বা ইস্টক নির্মিত মন্দির ভিত্তি থেকে ওপরের দিকে গেঁথে তোলা হয়। কৈলাসনাথ মন্দির ওপরের দিক থেকে ভিত্তি পর্যন্ত পাথর কেটে বের-করা। এর কারুকার্য ও মূর্তি-গুলোর সৌন্দর্য অনুপম। ইলোরার মন্দির শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়কর শিল্পকর্ম।

পল্লব শিল্প ঃ পল্লবদের সময়ে দক্ষিণ ভারতে এক নতুন ধরনের স্থাপত্যরীতি প্রসার লাভ করে। পাহাড় খোদাই করে রথ মন্দির, বড় বড় জীবজন্তু প্রভৃতি নির্মাণে পল্লবদের প্রতিভার পরিচয় মেলে। মহাবলীপুরমে এক একটি বিরাট পাথর কেটে 'রথ মন্দির' নির্মিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত পাথরের খোদাই গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ দৃশ্যটি শিল্পসুষমার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

নরসিংহবর্মণের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চীনগরে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, ৫০টি জৈন মন্দির ও বহু সুশ্রী অট্টালিকায় রাজধানী শোভিত ছিল। এসব থেকে সে আমলের শিল্পসংস্কৃতির পরিচয় মেলে।

ভক্তিধর্ম ঃ পল্লবদের সময়ে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। শিবের ভক্তগণ **নায়নার** এবং বিষ্ণুর উপাসকগণ **আলবার** নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা শাস্ত্রবিদ ছিলেন না, সরল-হৃদয় ভক্ত। আরাধ্য দেবতার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে সহজ কবিতায় ও গানে হাজার হাজার মানুষের মনে প্রেম-ভক্তির জোয়ার এনেছিলেন। কবিতাগুলো সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ধর্মীয় দার্শনিক ঃ ভাবপ্রবণ শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তগণ (নায়নার ও আলবার)

ছাড়াও কয়েকজন ধর্মীয় দর্শনের প্রবক্তা সর্ব-ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ'দের মধ্যে প্রধান ছিলেন কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, রামানুজ, বসব ও মাধবাচার্য।

কুমারিল ভট্ট : অষ্টম শতাব্দীর হিন্দুধর্মের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সারা ভারত পরিভ্রমণ করে হিন্দুধর্ম ও সমাজে নবীন তেজ সঞ্চার করেন। নানা স্থানে বৌদ্ধ-শ্রমণদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তিনি তাঁদের পরাজিত করে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে সাহায্য করেন। সেযুগে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জীবনযাত্রার দুর্নীতির চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তিনি প্রচার করেন, বৌদ্ধধর্মে নতুন কিছু নেই, বুদ্ধের ধর্মমত বেদ-উপনিষদ থেকেই গৃহীত।

শংকরাচার্য : ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের নাম্বুদ্রি পরিবারে শংকরাচার্যের জন্ম। তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় প্রতিভা-শালী পণ্ডিত, হিন্দুশাস্ত্র বিশারদ এবং অপরাজেয় তর্কাচার্য। কুমারিল ভট্টের মত শংকরাচার্য শাস্ত্র আলোচনায় বৌদ্ধ ও জৈন-পণ্ডিতদের পরাভূত করে হিন্দুধর্মের নব-উন্মেষ ঘটান। গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের যে টীকা তিনি রচনা করেছিলেন আজও তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত। অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য তিনি ভারতের চারপ্রান্তে ৪টি মঠস্থাপন করেন—মহীশূরে শৃঙ্গেরীমঠ, হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ, পুরীতে গোবর্ধনমঠ এবং দ্বারকায় সারদামঠ। হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে এবং ভারতীয় মূলগত ঐক্যের অন্যতম উৎসরূপে মঠগুলো অদ্যাপি সক্রিয়। শংকরাচার্য ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগী।

রামানুজ : ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের নিকট এক ক্ষুদ্র গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে রামানুজের জন্ম। তিনি ছিলেন ভক্তিবাদী সাধক, শংকরাচার্যের মত জ্ঞানবাদী নন। তিনি প্রচার করেন, ভক্তিই মানুষের মুক্তি লাভের একমাত্র পথ। রামানুজের শিষ্যরা বৈষ্ণবনামে পরিচিত। তিনি বহু বৌদ্ধ ও জৈনকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন।

বসব : লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বসব শৈব ধর্মের প্রচার করেন। জাতিভেদ বিলোপ, সামাজিক কুসংস্কার অপনোদন প্রভৃতি কল্যাণকর কাজের ভেতর দিয়ে লিঙ্গায়েৎরা হিন্দুসমাজ গ্লানিমুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

মাধবাচার্য : ১৩শ শতাব্দীতে রামানুজের মত বিষ্ণুর উপাসনা প্রবর্তন করে মাধবাচার্য হিন্দুসমাজে সঞ্জীবতা আনেন। তিনি ধর্মসূত্র ও গীতার সহজ-বোধ্য টীকা রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

তাঞ্জোরের শিবমন্দির : চোলরাজ-বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি রাজরাজ চোল ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সামরিক শক্তিবলে দক্ষিণের চের, পাণ্ড্য এবং পূর্ব-চালুক্যদের পরাজিত করে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন। নৌবাহিনীর সাহায্যে লঙ্কা-দ্বীপ ও মালয়ও তিনি জয় করেন। স্থাপত্য

নটরাজ

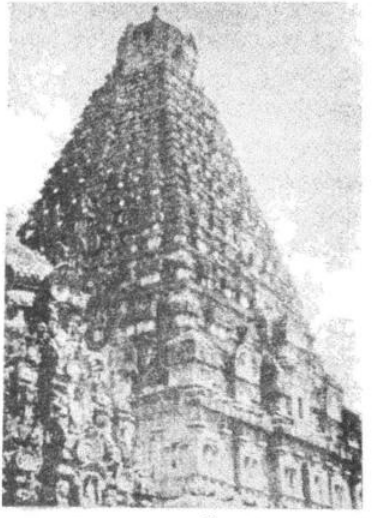

রাজরাজেশ্বরের মন্দির (তাঞ্জোর)

শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ তারই নিদর্শন তাঞ্জোরের বিখ্যাত শিব-মন্দির আজও বিদ্যমান। তাঁর রাজ্য জয় চিহ্ন মুছে গেছে কিন্তু শিল্পকীর্তি অম্লান।

মধ্যভারত, বাঙলা ও উড়িষ্যার কথা

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে উত্তর ভারতে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা (৬৪৭ থেকে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোড়নের কাল। শক্তিশালী এমন শাসক এ যুগে দেখা যায়নি যিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ রেখে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন। এরই মধ্যে খণ্ড খণ্ড অঞ্চলে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠী এবং বাঙলার পাল রাজারা হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।

শিল্প সাহিত্য শিক্ষা : রাজপুতগণ স্থাপত্য শিল্প সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। চিতোর, রণথমভোর, মাণ্ডু, গোয়ালিয়র প্রভৃতি দুর্গ স্থাপত্য কৌশলের জন্য খ্যাত। এছাড়া অনেক সুরম্য অট্টালিকা সজ্জিত নগর রুচির পরিচয় বহন করছে। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের **লিঙ্গরাজ মন্দির**, কোনারকের সূর্য মন্দির আবু পাহাড়ের **তেজোপাল মন্দির**, খাজুরাহোর **মহাদেব মন্দির** আজও বিখ্যাত দর্শনীয় বস্তু।

পালযুগের ধর্ম, সমাজ ও শিল্পসাহিত্য

আনুমানিক ৭৫০ খ্রিঃ থেকে ১১৬১ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০০ বৎসরের অধিককাল পাল রাজবংশ বাঙলায় রাজত্ব করেছিলেন। এ সময়ে শুধু বাঙলা নয়, বিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপরও পাল রাজাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছিল। পাল রাজাগণ ছিলেন বাঙালী এবং বৌদ্ধ। পালযুগ বাঙলার ইতিহাসে গৌরবের যুগ। এই যুগে ধর্ম ও বাঙালীর শিল্প সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। পালযুগের প্রধান গুরুত্ব হল বহির্বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব-ভারতের তথা বাঙলার যোগাযোগ।

ধর্ম : পাল সম্রাটগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে পূর্ব-ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারতের বাইরে শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যবদ্বীপে নয়, তিব্বতেও বাঙালী বৌদ্ধপণ্ডিতগণ

মহাদেব মন্দির (খাজুরাহো)

পালযুগের শিল্পকর্ম

সমাদরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

বিহার প্রতিষ্ঠা ঃ বৌদ্ধবিহার ছিল ধর্মতত্ত্ব ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। পালযুগে ওদন্তপুরী, সোমপুর ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধ-বিহার নির্মিত হয়েছিল।

শিল্প ও সাহিত্য ঃ বিদ্যা ও শিল্পের প্রতি পাল সম্রাটদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। **ধীমান ও বীতপাল** ছিলেন পালযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও স্থপতি। তাঁদের নির্মিত পাথরের ও অষ্টধাতুর চমৎকার দেবদেবীমূর্তি এখনও বিদ্যমান আছে। এ যুগে সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' কাব্য এবং কবিরাজ চক্রপাণি দত্ত চরক ও সুশ্রুতের টীকা লিখে যশস্বী হয়েছেন। এগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ ঃ পাল-যুগ বাঙলা ভাষার উৎপত্তির যুগ। এই সময় মাগধী প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ থেকে প্রাচীন বাঙলা ভাষা বিকাশ লাভ করে। ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'বৌদ্ধগান' ও 'দোহা' এইরূপ প্রাচীন বাঙলায় লিখিত। এগুলি চর্যাপদ বা চর্যাগীত নামে পরিচিত।

বাঙলার রাজনৈতিক তৎপরতার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ যুগের অবদান বাঙালীর কাছে স্মরণীয়। পালযুগে বাঙালী মনীষী বিদেশে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছেন যেমন, বৌদ্ধপণ্ডিত কুমারঘোষ যবদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন, বৌদ্ধ-আচার্য শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব এবং শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধ-মতবাদ প্রচার করেন; বাঙালী কবি সংস্কৃত কাব্য রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন, বাঙালী চিকিৎসক আয়ুর্বেদশাস্ত্রে নতুন ঔষধ প্রয়োগের উপায় দেখিয়েছেন। বাঙলা ভাষার উৎপত্তি এই যুগে। এসব থেকে পালযুগকে বাঙলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা চলে।

সেনযুগে বাঙলার ধর্ম ও সমাজ

সেনরাজগণ আদিতে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট (বর্তমান কর্ণাটক) প্রদেশের ব্রাহ্মণ অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গদেশে এসে তাঁরা অস্ত্রবলে রাজ্য স্থাপন করেন। ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে ১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ২০০ বৎসর বাঙলার সেনযুগ।

পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। পাল-রাজত্বের শেষ দিকে বৌদ্ধধর্মে নানা রকম অনাচার প্রবেশ করেছিল। সেন রাজারা ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করলেও এদেশে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং বেদপাঠ,

হোম, নানা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন তিথিতে পূজাপার্বণের প্রচলন হয়। বৃদ্ধ বয়সে সেন রাজারা যেখানে বাস করতেন, সেখানে বেদপাঠ, হোমাগ্নিধূম, হরিণকুলের নিঃশঙ্ক বিচরণে প্রাচীনকালের তপোবনের মত পরিবেশ সৃষ্টি হত। সেন রাজাদের অনুগ্রহপুষ্ট পণ্ডিতরা হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে অনেক বই লিখেছিলেন। সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় মতের উপাসকই ছিল।

রাজা বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন বাঙলার সমাজে কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। প্রবাদ এই, প্রাচীন বাঙলার রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ এনে বঙ্গদেশে বসতি করিয়েছিলেন। বল্লালসেনের সময়ে সমাজে অনাচার ও দুর্নীতি দেখা দেয়, তা দূর করার জন্য বল্লালসেন আদিশূর-আনীত পঞ্চকায়স্থের সন্তানদের মধ্যে যারা বিদ্যা বিনয়, আচার, প্রভৃতি নয়টি গুণে ভূষিত, তাদের কুলীন আখ্যা দিয়ে সামাজিক মর্যাদা দান করেন। সমাজের মানুষ যাতে সদাচার পালন করে এবং শুদ্ধ জীবনযাপন করে কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের এইটিই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর ফলে সমাজে কৃত্রিম ভেদবুদ্ধি এবং কতকগুলি কু-প্রথার সৃষ্টি হয়। যেমন, কুলীন ভিন্ন অকুলীনে কন্যা সম্প্রদান অবাঞ্ছিত হওয়ায় বহু কুলীনকন্যা চিরকুমারী থাকতে বাধ্য হয়, অনেকক্ষেত্রে কুলীন বরের সঙ্গে নামমাত্র বিবাহের অনুষ্ঠান করে বিবাহিতা কন্যাকে পিত্রালয়েই রেখে দেওয়া হয়, ইত্যাদি।

সাহিত্য ঃ সেনরাজারা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভা সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবিদের দ্বারা অলংকৃত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণসর্বস্ব নামক শাস্ত্রগ্রন্থ রচয়িতা হলায়ুধ সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় যে পঞ্চকবি থাকতেন তাঁরা হলেন জয়দেব, উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধনাচার্য ও ধোয়ী। তৎকালীন রীতি অনুসারে এঁরা সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখতেন। জয়দেবের প্রসিদ্ধ 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলা সুললিত ভাষায় বর্ণিত। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বল্লালসেন 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

সেন আমলে বাঙলার জনজীবন ও জ্ঞানচিন্তাকর্মের ক্ষেত্রে যে শান্ত প্রবাহ ধীরগতিতে চলছিল, অকস্মাৎ মুসলিম আক্রমণের ফলে তাতে নানা ঘাত প্রতিঘাতের সূচনা হল। সমাজ, ধর্ম, দেশশাসন—সকল ক্ষেত্রেই নতুন সমস্যা উপস্থিত হল, ভারতের একপ্রান্তস্থিত বাঙলা উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার মঞ্চ হয়ে উঠল। সে কাহিনী ও তার জের টেনে আমরা মধ্যযুগ পার হয়ে বর্তমান যুগের দিকে এগিয়ে আসব।

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

ভারত ও ভারতবাসী ● ভূগোল

আগের পাঠে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের আলোচনা শেষ হয়েছে। তাহলে এস, আজ আমরা পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত পরের ভৌগোলিক অঞ্চল—**দাক্ষিণাত্য মালভূমি** নিয়ে আলোচনা করি।

এর আগে পার্বত্য অঞ্চল, সমভূমি অঞ্চল, মরু অঞ্চল ইত্যাদি পড়েছ, কিন্তু মালভূমি পড়নি। এই মালভূমি অঞ্চলটি আয়তনেও বেশ বড়। তাই বলছি—এই নতুন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলো খুব মন দিয়ে পড়।

দাক্ষিণাত্য মালভূমি

ভারতের ঠিক কোন অংশের নাম দাক্ষিণাত্য মালভূমি ঃ ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণ অংশের নাম দাক্ষিণাত্য মালভূমি। এ থেকে কিছু বুঝতে পারলে না—এই ত? ঠিক আছে তাহলে আলাদা করে আগে জেনে নাও ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চল কাকে বলে—

ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চল ঃ তোমরা গঙ্গা সমভূমি ও মরুস্থলী পড়েছ। এই অঞ্চল দুটির দক্ষিণে ভারতের যে বিরাট ত্রিভুজাকৃতি ভূ-ভাগ আছে তার নাম—উপদ্বীপ অঞ্চল। এতেও হয়ত অনেকে বুঝতে পারলে না—তাই আরও ভেঙে বলে দিচ্ছি—

ভারতের মানচিত্র খোল। একেবারে পশ্চিমে কচ্ছ থেকে একটি রেখা কল্পনা কর। রেখাটিকে কচ্ছ থেকে আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিম দিয়ে দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে চল। তারপর দিল্লি থেকে প্রথমে যমুনা ও পরে গঙ্গার সমান্তরাল করে পূর্বে একেবারে বিহারের রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বাড়িয়ে দাও। পশ্চিমে কচ্ছ থেকে পূর্বে রাজমহল পর্যন্ত এই যে আঁকাবাঁকা রেখাটি হল—এর দক্ষিণ থেকে শুরু করে একেবারে ভারতের শেষ সীমা—কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত অঞ্চলকে বলে উপদ্বীপ।

ত্রিকোণ এই জায়গাটিকে উপদ্বীপ বলা হচ্ছে কেন নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছ। কারণ আগের পাঠে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ আলোচনার সময় তোমাদের বলে দিয়েছি—যে জায়গার তিনদিকে জল ও একদিকে স্থল সেই জায়গাকে বলে উপদ্বীপ। ভারতের এই দক্ষিণাংশেরও তিনদিকে জল—পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং শুধুমাত্র উত্তরে স্থলভাগ—উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি। এই পর্যন্ত বুঝেছ ত? ঠিক আছে, এর পরে দেখ—

উপদ্বীপের দুধার বাদ দাও ঃ উপদ্বীপের দুদিকে বঙ্গোপসাগর ও আরব-সাগরের তীরে সরু একফালি করে সমভূমি আছে। ঐ সমভূমি হল আলাদা ভৌগোলিক অঞ্চল, নাম—উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল। উপদ্বীপের বাকি অংশ হল মালভূমি। ঐ মালভূমির দুটি ভাগ—

(ক) মধ্য ভারতের উচ্চভূমি
(খ) দাক্ষিণাত্য মালভূমি

উপদ্বীপের মালভূমিকে দুভাগ করা হল ঃ বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মাঝখানে নর্মদা নদী উপত্যকা থেকে উত্তর-পূর্বে শোন নদী উপত্যকা বরাবর যদি একটি রেখা কল্পনা কর তবে ঐ রেখার উত্তরে উপদ্বীপের যে অংশটুকু পড়বে

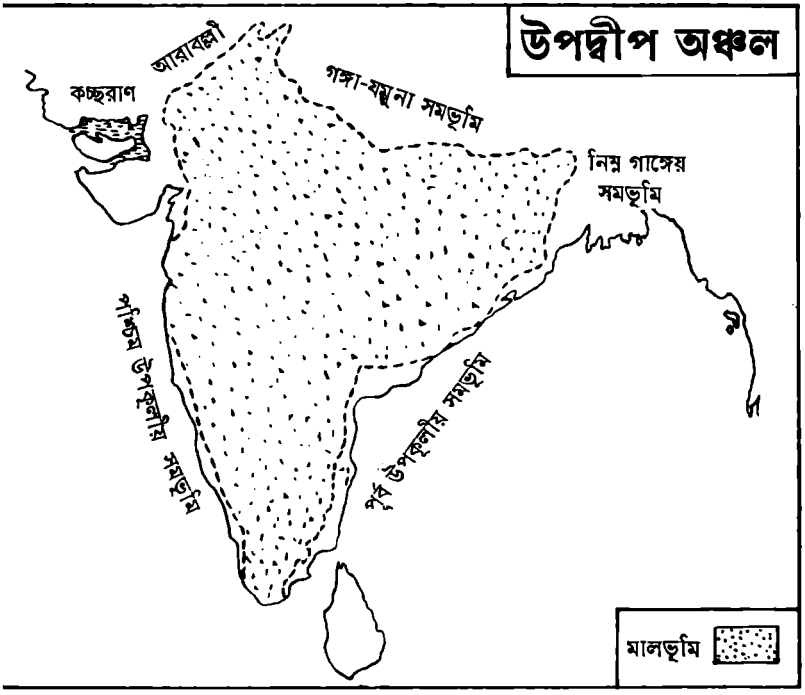

তার নাম মধ্য ভারতের উচ্চভূমি, আর দক্ষিণাংশের নাম দাক্ষিণাত্য মালভূমি। আমরা আজ এই দাক্ষিণাত্য মালভূমি নিয়ে আলোচনা করব।

তাহলে দাক্ষিণাত্য মালভূমি দেখতে হল কিছুটা ত্রিভুজের মত। এর তিনদিক পর্বত দিয়ে ঘেরা—উত্তরে সাতপুরা, মহাদেব ও মহাকাশ, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পূর্বে পূর্বঘাট বা মহেন্দ্রগিরি।

কোন কোন রাজ্য দাক্ষিণাত্য মালভূমির অন্তর্ভুক্ত : ভারতের ৫টি রাজ্য—মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উড়িষ্যার বেশির ভাগ জায়গা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের কিছু কিছু অংশও এই মালভূমির মধ্যে পড়ে।

এবার দেখ নীচের প্রশ্নগুলো পার কিনা—

প্রশ্ন

১. ভারতের কোন কোন অংশের নাম দাক্ষিণাত্য মালভূমি ও মধ্য ভারতের উচ্চভূমি ?
২. দাক্ষিণাত্য মালভূমির অবস্থান বর্ণনা কর।
৩. ভারতের কোন কোন রাজ্য দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ?
৪. দাক্ষিণাত্য মালভূমির তিনদিকে কি কি পর্বত আছে ?

ভূ-প্রকৃতি : নামের মধ্যে দেখেছ যে দাক্ষিণাত্য হল মালভূমি অঞ্চল। তাহলে এস, মালভূমি কাকে বলে আগে তা জেনে নাও—

মালভূমি : প্রকৃত মালভূমি দেখতে অনেকটা টেবিলের মত—ওপরটা কিছুটা

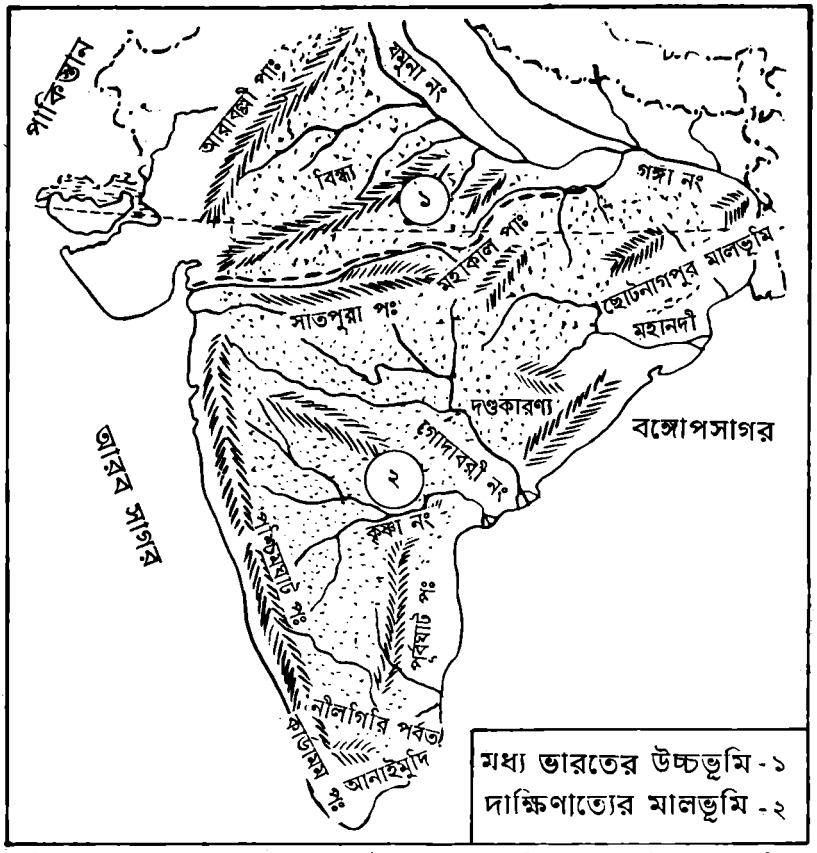

চেটাল এবং দুদিকে খাড়া ঢাল। তাই মালভূমির আর এক নাম টেবিল ল্যাণ্ড (Table land)। তবে টেবিলের মত ওপর একেবারে সমতল নয়, কিছুটা ঢেউ খেলান। ওপরে অনেক ছড়ান পাহাড় থাকে। মালভূমির উচ্চতার কোন মাপ-কাঠি নেই অর্থাৎ অনেকে যে বলেন এত মিটার থেকে এত মিটার পর্যন্ত হল মালভূমি—এরকম কোন বাঁধাধরা মাপ নেই, যে কোন উচ্চতায় মালভূমি থাকতে পারে। যেমন ধর, ভারতীয় উপদ্বীপের মালভূমি গড়ে ৬২০ মিটার উঁচু আবার তিব্বত মালভূমি গড়ে ৪০০০ মিটারেরও বেশি উঁচু।

মালভূমি সম্বন্ধে যদি এত সব কিছু মনে না থাকে, আপাতত তুমি ঘরের ঐ টেবিলটিই মনে রাখ—মালভূমি কিছুটা টেবিলের মত দেখতে। তাহলে মালভূমি সম্বন্ধে যা জানলে এবার দাক্ষিণাত্যের ওপর তা প্রয়োগ কর—

ত্রিভুজাকৃতি দাক্ষিণাত্যেরও তিনদিকে পর্বত থাকায় খাড়া ঢাল তৈরি হয়েছে—

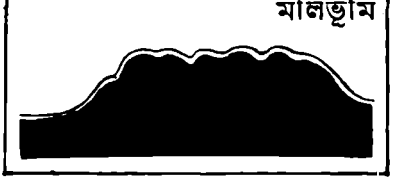

উত্তরে সাতপুরা, মহাদেব ও মহাকাল পর্বত, পূর্বে পূর্বঘাট পর্বত ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বত এই খাড়া ঢাল তৈরি করেছে। আর মাঝখানটাও ঢেউ খেলান। কারণ ঐ মাঝখানে আছে উঁচুভূমি, পাহাড়, নদীর সমভূমি ইত্যাদি। তাহলে দাক্ষিণাত্য হল মালভূমি।

এতক্ষণ ত আশপাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে, এবার সরাসরি দাক্ষিণাত্যেই চল—দেখা যাক দেহখানা কিরকম—

১. বয়স অনেক ঃ দাক্ষিণাত্য মালভূমি হল পৃথিবীর এক অতি প্রাচীন ভূখণ্ড—এর বয়স অনেক। বেশির ভাগ অংশ তৈরি হয়েছে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ কোটি বছর আগে।

মালভূমিকে এখন যে অবস্থায় দেখছ, আগে কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি উঁচু ছিল। কোটি কোটি বছর ধরে ক্ষয় হবার ফলে পর্বতগুলো নীচু হয়ে গেছে আর অন্যান্য জায়গাগুলোও সমপ্রায় ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

২. আশ্চর্যের কথা ঃ ভূ-বিজ্ঞানীদের মত হল যে আজ থেকে বহু কোটি বছর আগে আরব, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মালভূমির সঙ্গে দাক্ষিণাত্য মালভূমি জড়িয়ে ছিল। তখন ঐ জড়ান ভূখণ্ডটির নাম ছিল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। পরে মালভূমিগুলো ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে সরে গেছে।

৩. কোন দিকে ঢালু ঃ নদীগুলো দেখে বুঝে ফেল—উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ঢালু। যদি সহজ করে বলতে চাও ত বলবে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঢালু।

৪. পশ্চিমঘাট পর্বত ঃ মালভূমির পশ্চিম সীমানায় দেখ—একটানা পাঁচিলের মত একটি উঁচু পর্বতশ্রেণী উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে, এর নাম পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্বত। গড় উচ্চতা ১৬০০ মিটার। সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মধ্যে পশ্চিম-ঘাট হল সবচেয়ে উঁচু। তাই এর কথা আলাদা করে মনে রাখ—

ক. পশ্চিম ঢাল খাড়া ঃ পশ্চিম-ঘাটের পশ্চিম ঢাল আরব সাগরের উপকূল থেকে একেবারে খাড়াভাবে প্রায় ১০০০ মিটার পর্যন্ত ওপরে উঠেছে।

খ. পূর্বে ঢাল কম ঃ পূর্ব ঢাল ধীরে ধীরে মধ্যের মালভূমির সঙ্গে মিশেছে।

গ. উত্তরাংশে লাভার টুপি ঃ পশ্চিমঘাটের উত্তরাংশ ব্যাসল্ট লাভায় ঢাকা বলে চ্যাপ্টা দেখায়—ঠিক যেন লাভার টুপি। পশ্চিমঘাট এখানে ধাপে ধাপে পূর্ব দিকে নেমেছে।

ঘ. গিরিশৃঙ্গ ঃ উত্তরাংশের গড় উচ্চতা ৯০০-১২০০ মিটার। এখানে কতকগুলো উঁচু শৃঙ্গ আছে—কালসুবাই (১৬৪৬ মি.), মহাবালেশ্বর (১৪৩৮ মি.) হরিশ্চন্দ্রগড় (১৪২৪ মি.) প্রভৃতি।

ঙ. গিরিপথ ঃ উত্তরাংশের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—দুটি বড় গিরিপথ আছে। নাসিকের কাছে থলঘাট গিরিপথ এবং পুনের কাছে ভোরঘাট গিরিপথ। এ দুটি না থাকলে মালভূমি থেকে পশ্চিম উপকূলে যাওয়া খুব মুশকিল হত, কারণ মাঝখানে ত সহ্যাদ্রির বিরাট পাঁচিল। গিরিপথ দিয়ে রেলপথ তৈরি করা হয়েছে—তাহলে যাতায়াতের কত সুবিধা হচ্ছে বলত।

চ. দক্ষিণাংশে গ্রানাইট নিস ঃ গোয়ার দক্ষিণে পশ্চিমঘাটের যে অংশ আছে তা লাভার বদলে গ্রানাইট নিস পাথরে তৈরি। এখানে পর্বতের মাথাগুলো গোল গোল।

৪. নীলগিরি পর্বত ঃ পশ্চিম-ঘাটের দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতগ্রন্থি। উত্তর-পশ্চিম থেকে পশ্চিমঘাট ও উত্তর-পূর্ব

থেকে পূর্বঘাট পর্বত এসে এই গ্রন্থিতে মিলেছে। নীলগিরিতে দুটি খুব উঁচু শৃঙ্গ আছে—দোদাবেতা (২৬৩৭ মি.) ও মার্কুর্তি (২৫৫৪ মি.)।

৫. পালঘাট ফাঁক ঃ নীলগিরি পর্বতের দক্ষিণে পালঘাট ফাঁক (**Palghat gap**)। পালঘাটের মধ্যে দিয়ে মালভূমি থেকে কেরালার উপকূলে যাবার রাস্তা তৈরি হয়েছে।

৬. পালঘাটের দক্ষিণে আবার পর্বত ঃ পালঘাটের দক্ষিণে ঘন গাছ-পালায় ঢাকা তিনটি পর্বত আছে—আন্নামালাই, কার্ডামম ও পালনি। এই পর্বতগুলোও শক্ত পাথরে তৈরি।

৭. সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ঃ সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ হল আনাইমুদি (২৬৯৫ মি.)। এই শৃঙ্গটি নীলগিরির দক্ষিণে আন্নামালাই পর্বতে অবস্থিত।

৮. পূর্বঘাট বা মহেন্দ্রগিরি ঃ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম সীমানায় যেমন পশ্চিমঘাট পর্বত তেমনি পূর্ব সীমানায় হল পূর্বঘাট বা মহেন্দ্রগিরি পর্বত।

পূর্বঘাটের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ঃ পশ্চিমঘাটের মত পূর্বঘাট কিন্তু একটানা ও খাড়া নয়। আর পূর্বঘাটের উচ্চতাও কম—গড়ে ৪৫০-৬০০ মি.।

সত্যি কথা বলতে কি পূর্বঘাট এত ক্ষয়ে গেছে যে একে পর্বত না বলে পাহাড় বলা ভাল। আর এই পাহাড়গুলোর মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ায় একটি আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন। এইসব বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের মধ্যে কতকগুলোর নাম জেনে নাও—নাল্লা-মালাই, পালকোণ্ডা, ভেলীকোণ্ডা, পচা-মালাই, জাভাদি শেভারয় প্রভৃতি। তোমাদের কাছে নামগুলো একটু খটমট লাগবে—কারণ বেশির ভাগ দক্ষিণ ভারতীয় নাম। পশ্চিমঘাটের মত পূর্বঘাটও দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতে মিলেছে।

দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম ও পূর্ব সীমানা দেখা হল, এবার উত্তরে চল—

৯. সাতপুরা পর্বত ঃ দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর সীমানায় এই পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত।

সাতপুরার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) পূর্ব থেকে পশ্চিমে এই পর্বতটি প্রায় ৯০০ কি. মি. লম্বা।

(খ) সাতপুরার গড় উচ্চতা ৫০০ মিটারের সামান্য বেশি। তবে কতকগুলো শৃঙ্গ আছে ১০০০ মিটারেরও বেশি উঁচু।

(গ) পাচমারির কাছে ধূপগড় (১৩৫০ মি.) সাতপুরার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ।

(ঘ) অনেকে বলেন সাতপুরা হল একটি স্তূপ পর্বত আর এর দুদিকে নর্মদা ও তাপ্তী নদী দুটি গ্রস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে ছোট্ট করে তোমাদের বলে দিচ্ছি স্তূপ পর্বত ও গ্রস্ত উপত্যকা কাকে বলে—

ধর, ভূগর্ভে প্রচণ্ড আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠ সমান্তরালভাবে দু জায়গায় ফেটে গেছে। ফাটলের মাঝখানের জমি যদি চাপের ফলে ওপরে উঠে পড়ে তাতে যে পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকে বলে স্তূপ পর্বত। ওপরে না উঠে দুপাশ যদি বসে যায় তাহলেও মাঝখানে স্তূপ পর্বত তৈরি হয়।

আর ফাটলের মাঝখানের জমি যদি বসে যায় তবে ঐ নীচু অংশকে বলে গ্রস্ত উপত্যকা। দাক্ষিণাত্য মালভূমির বয়স ত অনেক হল—তাই কত চাপ, কত তাপ, কত ভূ-আন্দোলন যে একে সহ্য করতে হয়েছে তার হিসেব নেই। ফলে কোথাও একটু উঠে গেছে, কোথাও একটু বসে গেছে—তৈরি হয়েছে স্তূপ পর্বত ও গ্রস্ত উপত্যকা। কোথাও এত বড় ফাটল তৈরি হয়েছে যে তার মধ্যে দিয়ে লাভা বেরিয়ে এসে বিরাট জায়গা ঢেকে দিয়েছে।

স্তূপ পর্বত ও গ্রস্ত উপত্যকা বুঝলে ত,

তাহলে আবার দাক্ষিণাত্যের উত্তর সীমানার আলোচনায় ফিরে যাই চল—

(ঙ) সাতপুরার পূর্ব দিকে মহাদেব ও মহাকাল পর্বত আরও উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত হয়েছে। সাতপুরার মত মহাদেব পর্বত কিছুটা লাভায় ঢাকা।

১০. অজন্তা পর্বতশ্রেণী : সাতপুরার দক্ষিণে আর একটি ছোট পর্বত আছে, নাম —অজন্তা পর্বতশ্রেণী। এই পর্বতশ্রেণীটি হল পশ্চিমঘাটের একটি শাখা এবং পশ্চিম-ঘাটের উত্তরাংশের মত লাভায় ঢাকা।

ত্রিভুজাকৃতি দাক্ষিণাত্য মালভূমির তিনদিকের পরিচয় পেলে। এবার মাঝের জায়গাগুলো কি রকম দেখ—

১১. উত্তর-পশ্চিমাংশ লাভায় ঢাকা : দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ ব্যাসল্ট লাভায় ঢাকা মালভূমি। প্রায় ৬/৭ কোটি বছর আগে দাক্ষিণাত্যের এই অংশটি লাভায় ঢাকা পড়ে। পরে ঐ লাভা শক্ত হয়ে মালভূমি তৈরি করেছে—নাম লাভা মালভূমি। (এই লাভা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য তোমাদের আলাদা করে বুঝিয়ে দেব)

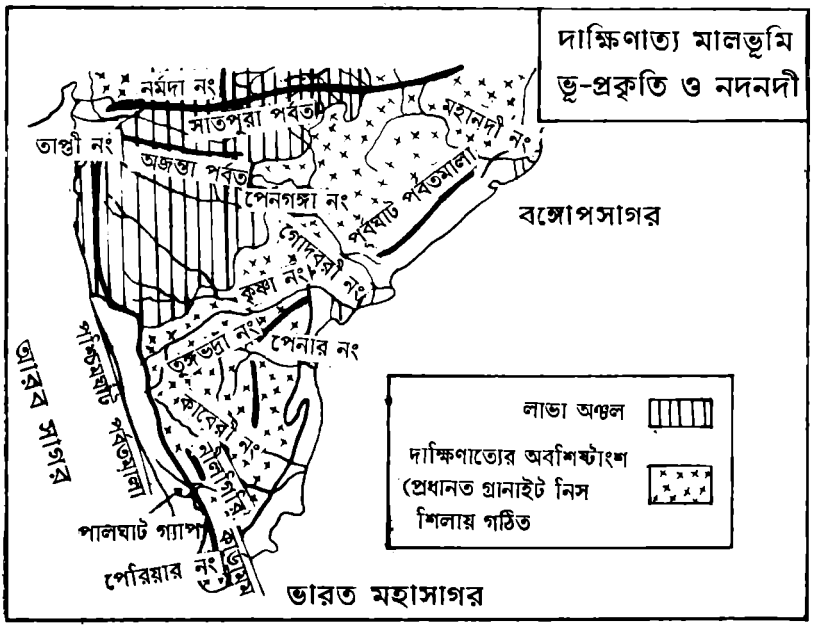

১২. দাক্ষিণাত্যের অবশিষ্টাংশ : দাক্ষিণাত্যের বাকি অংশ গ্রানাইট নিস পাথরে তৈরি, বহুদিন ধরে ক্ষয় হবার ফলে ঐসব জায়গাও অনেক সমতল হয়ে গেছে—ভূমির ঢাল গেছে কমে এবং নদীর খাতগুলো হয়েছে চওড়া। তবে মালভূমির মাঝে মাঝে এখনও অনেক গোলাকার বা গম্বুজাকার পাহাড় আছে।

দাক্ষিণাত্য মালভূমির এই অবশিষ্টাংশের কোথায় কি আছে দেখ :

ক. বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগে মালভূমির যে অংশ আছে তাকে অনেকে পূর্বের মালভূমি বা উচ্চভূমি বলেন।

খ. ছোটনাগপুর মালভূমি : পূর্বের এই উচ্চভূমির সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ হল ছোটনাগপুর মালভূমি। এর গড় উচ্চতা ৪০০-১০০০ মি. এবং সবচেয়ে উঁচু অংশ হল পশ্চিমদিকের পাট অঞ্চল (১১০০ মি.)। এই মালভূমির উত্তর-পূর্ব কোণে রাজমহল পাহাড়। (এই ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আলাদা করে বুঝিয়ে দেব)

গ. মহানদী অববাহিকা : ছোটনাগপুরের দক্ষিণে মহানদী অববাহিকা গড়ে ২০০ মিটার উঁচু। এই অববাহিকার মধ্যভাগের নাম ছত্রিশগড় সমতলক্ষেত্র।

ঘ. দণ্ডকারণ্য অঞ্চল : ছত্রিশগড় সমতলক্ষেত্রের দক্ষিণে দণ্ডকারণ্য অঞ্চল। এই অঞ্চলের মধ্যে কোরাপুট সবচেয়ে উঁচু (৩২০০ মি.)।

ঙ. দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণাংশের দুটি ভাগ—কর্ণাটক বা মহীশূর মালভূমি এবং তেলেঙ্গানা মালভূমি। এই দুটি মালভূমিরও কিছু কিছু অংশ প্রায় সমতল এবং মাঝে মাঝে গোলাকার পাহাড় আছে। (কর্ণাটক মালভূমি অঞ্চল আলাদা করে বুঝিয়ে দেব)

দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমাদের মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পরের দুটি পাঠে লাভা অঞ্চল, কর্ণাটক মালভূমি ও ছোটনাগপুর মালভূমি সম্পর্কে যখন বিস্তৃত আলোচনা করব দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের আরও কিছু পরিচয় পাবে।

ভূ-প্রকৃতি কতটা বুঝলে এখন দেখ :

প্রশ্ন

১. দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২. দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম সীমানার পর্বতশ্রেণী দুটির নাম কর। ঐ পর্বতশ্রেণী দুটির মধ্যে কি পার্থক্য আছে?
৩. পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
৪. দাক্ষিণাত্যকে 'মালভূমি' বলা হয় কেন?
৫. সাতপুরা পর্বত দাক্ষিণাত্যের কোন অংশে বিস্তৃত?

নদনদী : এখানে আমরা তিনটি বিষয় আলোচনা করব :

ক. দাক্ষিণাত্যের প্রধান নদীগুলোর নাম, উৎস ও মোহানা।

খ. এই নদীগুলোর বৈশিষ্ট্য।

গ. উত্তর ভারতের নদীগুলোর সঙ্গে এই নদীগুলোর পার্থক্য।

ক. দাক্ষিণাত্যের প্রধান নদীগুলোর নাম, উৎস ও মোহনা : মানচিত্রে দেখ, এখানে প্রধানত দু ধরনের নদী আছে :

১. পূর্ববাহিনী নদী অর্থাৎ যেগুলো পূর্ব দিকে বয়ে গেছে।

২. পশ্চিমবাহিনী নদী অর্থাৎ যেগুলো পশ্চিম দিকে বয়ে গেছে।

১. পূর্ববাহিনী নদী : পশ্চিমঘাট পর্বতে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং ভূমির ঢাল পূর্বদিকে—এই দুটি কারণে দাক্ষিণাত্যের বেশির ভাগ নদী পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে, যেমন—মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, পেন্নার প্রভৃতি।

দাক্ষিণাত্যের এই পূর্ববাহিনী নদীগুলো পড়েছে বঙ্গোপসাগরে এবং এজন্য নদী-গুলোকে দাক্ষিণাত্যের বিরাট পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। আগেই বলেছি ভূমির ঢাল পূর্বদিকে বলে নদীগুলোর এই প্রাণান্ত-কর অবস্থা। দাক্ষিণাত্যের এই নদীগুলোর উৎস কোথায় এখন তা বলে দিচ্ছি। লক্ষ্য করে দেখ—নদীগুলোকে কতটা রাস্তা পেরোতে হচ্ছে :

মহানদী : (৮৪২ কি. মি.) এই নদীটির জন্ম হয়েছে মহাকাল পর্বতের পূর্ব ঢালের কয়েকটি ঝর্ণার মিলিত জলধারা থেকে। এর প্রধান দুটি উপনদী হল : বৈতরণী ও ব্রাহ্মণী।

গোদাবরী : (১৫৬২ কি. মি.) দাক্ষিণাত্যের সবচেয়ে বড় ও পবিত্র নদী হল এই গোদাবরী। এর আর এক নাম 'দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা।' পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে গোদাবরীর জন্ম—ঠিক জায়গাটা হল মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ট্রিম্বাক ফোয়ারা থেকে। মঞ্জিরা, পেনগঙ্গা, ওয়েনগঙ্গা প্রভৃতি গোদাবরীর প্রধান উপনদী।

গোদাবরী ও তার শাখা-প্রশাখা

কৃষ্ণা : (১৪০০ কি মি.) মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর শৃঙ্গের কাছে কৃষ্ণার উৎপত্তি হয়েছে। এর প্রধান দুটি উপনদী হল ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা।

কাবেরী : (৮০৫ কি. মি.) কর্ণাটকের কুর্গ জেলার ব্রহ্মগিরি পর্বতে কাবেরীর জন্ম। গোদাবরীর মত কাবেরীও দক্ষিণ ভারতের পবিত্র নদী। হিমাবতী, ভবানী ও সুবর্ণমতী—এই তিনটি হল কাবেরীর উল্লেখযোগ্য উপনদী।

পেন্নার : পূর্ববাহিনী অন্য নদীগুলোর তুলনায় আয়তনে ছোট। এর উৎপত্তি কর্ণাটকের নন্দীদুর্গ পাহাড়ে।

২. পশ্চিমবাহিনী নদী : দাক্ষিণাত্যের খুব কম নদী পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং এদের মধ্যে উল্লেখ

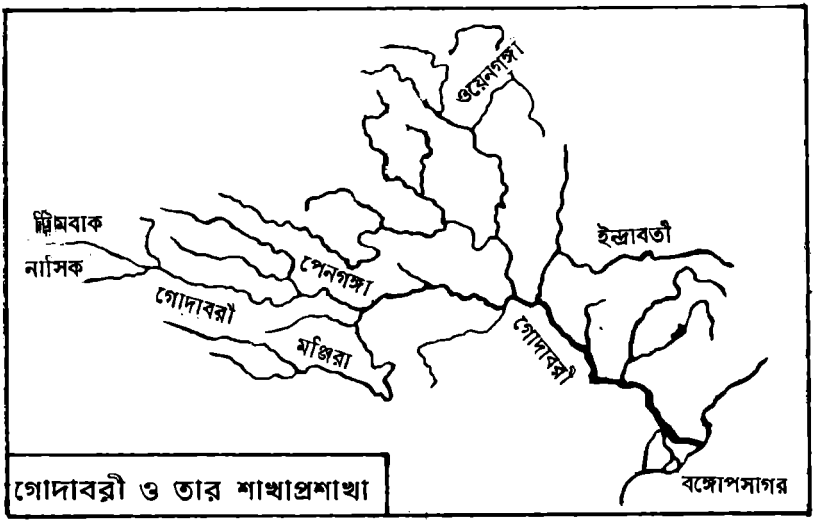

গোদাবরী ও তার শাখাপ্রশাখা

করার মত নদী হল দুটি—নর্মদা ও তাপ্তী (তাপী)। দুটিই পশ্চিমে কাম্বে উপসাগরে পড়েছে।

নর্মদা : (১৩১২ কি. মি.) মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক পাহাড়ে এর উৎপত্তি। জব্বলপুরের কাছে শক্ত মার্বেল পাথর অঞ্চলে নর্মদার একটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে।

তাপ্তী : (৭২৪ কি. মি) মধ্যপ্রদেশের মহাদেব পাহাড়ে তাপ্তীর উৎপত্তি। এ পর্যন্ত গেল নদীগুলোর সাধারণ পরিচয়। এখন তোমরা হয়ত ভাবছ যে দাক্ষিণাত্যের বেশির ভাগ নদী যখন ঢাল অনুসারে পূর্বে বয়ে যাচ্ছে তখন এই নর্মদা ও তাপ্তী কেন সে নিয়ম মানল না?

উত্তর কিন্তু তোমরা নিজেরা দিতে পারবে—শুধু সামান্য বুদ্ধি খরচ করতে হবে। একটু আগে সাতপুরা পর্বত আলোচনার সময় তোমাদের যে গ্রস্ত উপত্যকার কথা বলেছি—উত্তরটা তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। গ্রস্ত উপত্যকা দিয়ে বয়ে গেছে বলে নর্মদা ও তাপ্তী দাক্ষিণাত্যের সাধারণ ঢালের তোয়াক্কা করেনি।

খ. দাক্ষিণাত্যের এই নদীগুলোর বৈশিষ্ট্য : পূর্ব বা পশ্চিম যে বাহিনী হোক না কেন, সব নদীগুলোরই উৎস দাক্ষিণাত্য মালভূমি। তোমরা এখানকার ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে জেনেছ যে দাক্ষিণাত্যে পর্বত আছে ঠিক, কিন্তু সেগুলো বেশি উঁচু নয়। নীচু পর্বতের মাথায় ত আর বরফ জমতে পারে না। তাই নদীগুলো হিমালয়ের নদীর মত বরফগলা জল পায় না। বর্ষাকালে দাক্ষিণাত্যের নদীগুলো জলে টুবটুব করলেও অন্যসময় অনেক জায়গায় শুকিয়ে যায়।

২. মানচিত্রে দেখ মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি পূর্ববাহিনী নদীগুলোর মোহানায় বড় বড় বদ্বীপ, কিন্তু পশ্চিমবাহিনী নদীগুলোর মোহানায় একটুও বদ্বীপ নেই।

৩. দাক্ষিণাত্যের পুরোটা প্রায় ঢেউ-খেলান। তাই নদীগুলোতে অনেক জলপ্রপাত তৈরি হয়েছে। ভাবছ ত—নদীতে জলপ্রপাত থাকলে সুবিধা কি? সুবিধা হল নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে সহজে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা যায়।

গ. উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোর মধ্যে পার্থক্য : গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হল উত্তর ভারতের প্রধান নদী—নদীগুলোর হিমালয়ে উৎস। এর মধ্যে তোমরা গঙ্গা নদীর কথা পড়েছ। গঙ্গা সমভূমির মধ্যে আর হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে কিছুটা সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পরিচয় পেয়েছ। এখন পড়ছ দাক্ষিণাত্যের নদীগুলোর কথা। তাহলে এবার ভেবে দেখ—হিমালয়ের নদী আর দাক্ষিণাত্যের নদীগুলোর মধ্যে কি কি অমিল আছে। দেখত, এগুলো কিনা—

উত্তর ভারতের নদী

১. বৃষ্টির জল ছাড়াও সুউচ্চ হিমালয়ের বরফগলা জল পায় বলে নদীগুলোতে সারা বছর জল থাকে অর্থাৎ নিত্যবহ।
২. পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমভূমিতে নদীগুলোর স্রোত কম তাই নাব্য এবং জলসেচের উপযুক্ত।
৩. সমভূমিতে স্রোত কম বলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না।
৪. নদীগুলো খুব বড় এবং এদের বয়স কম। ফলে প্রায়ই রাস্তা পাল্টায়
৫. পার্বত্য অঞ্চলে নদীর খাত খুব গভীর।

দক্ষিণ ভারতের নদী

১. নিচু পর্বতের জন্য বরফগলা জল পায় না—বৃষ্টির জল প্রধান ভরসা। তাই বৃষ্টিহীন ঋতুতে অনেক নদী শুকিয়ে যায়।

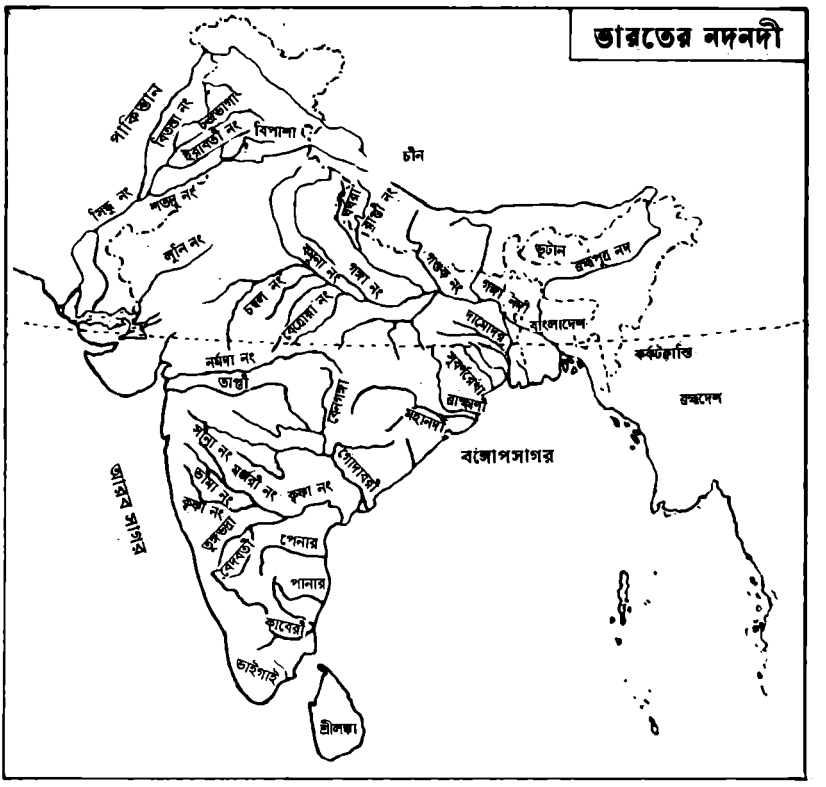

২. মালভূমির ওপর দিয়ে যায় বলে খর-স্রোতা। তাই অনাব্য এবং বর্ষার অতিরিক্ত জল জলাধারে ধরে না রাখলে জলসেচের উপযুক্ত নয়।

৩. মালভূমির জন্য খরস্রোতা এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী।

৪. নদীগুলো আয়তনে ছোট এবং বয়স খুব বেশি। নির্দিষ্ট পথে চলে।

৫. শক্ত পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যায় বলে নদীর ক্ষয় করার শক্তি কম। তাই খাতগুলো অগভীর।

জলবায়ু ঃ দাক্ষিণাত্যের জলবায়ুর ওপর অবস্থান, সমুদ্র ও ভূ-প্রকৃতির প্রভাব খুব বেশি। কিভাবে দেখ ঃ

১. অবস্থানের প্রভাব ঃ কর্কটক্রান্তি রেখা কাকে বলে জান? নিরক্ষরেখা পেরিয়ে উত্তরদিকে সূর্য যতদূর পর্যন্ত আসে সেখানে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। ঐ রেখাটি হল কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উঃ অক্ষাংশ)। অর্থাৎ সূর্যের উত্তরদিকে আসার শেষ সীমা হল ঐ কর্কটক্রান্তি। একইভাবে নিরক্ষরেখার দক্ষিণে সূর্যের

প্রশ্ন

১. দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলের প্রধান নদীগুলোর নাম কি?

২. পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী নদী বলতে কি বোঝায়?

৩. দাক্ষিণাত্যের নদীগুলোর সঙ্গে উত্তর ভারতের নদীগুলোর পার্থক্য কি?

চলার পথের শেষ যে সীমা তাকে বলে মকরক্রান্তি রেখা (২৩½° দঃ অক্ষাংশ)। সূর্য হল পৃথিবীর তাপের উৎস। তাই সূর্যের চলার পথের মধ্যে যেসব জায়গা পড়ে সেখানে গরম বেশি। কর্কটক্রান্তি ও মকর-ক্রান্তির মধ্যের জায়গাটুকুতে, যার আর এক নাম ক্রান্তীয় অঞ্চল, এ কারণে গরম।

সমগ্র দাক্ষিণাত্য হল কর্কটক্রান্তি রেখার দক্ষিণে অর্থাৎ ক্রান্তীয় অঞ্চলে—তাই বেশ গরম। এখানে গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা ২৫°—৩০° সে. আর শীতকালের গড় হল ২০°—২৫° সে.। একই কারণে দাক্ষিণাত্যের উত্তর থেকে যত দক্ষিণে যাবে গরম বাড়বে।

২. **সমুদ্রের প্রভাব :** লক্ষ্য করে দেখ শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য কম। তাহলে বলা যায় এখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। এর কারণ দাক্ষিণাত্যের তিনদিকে সমুদ্র। বিষয়টা আরেকটু ভেঙে বুঝিয়ে দিচ্ছি : জল দেরিতে গরম ও ঠাণ্ডা হয় বলে যেসব জায়গা জলভাগের পাশে থাকে সেখানে খুব বেশি গরম বা ঠাণ্ডা পড়ে না। লোকে এজন্যই ত সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়, যেমন—পুরী, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি।

৩. **ভূ-প্রকৃতির প্রভাব :** দাক্ষিণাত্য তিনদিকে পর্বত দিয়ে ঘেরা বলে মাঝখানে বৃষ্টি কম। আরও একটু বিস্তৃতভাবে বলে দিচ্ছি—আরবসাগর থেকে আসা মৌসুমী বায়ু পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে বাধা পায় বলে ওখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়—বছরে গড়ে ২০০ সে. মি.-এরও বেশি। কিন্তু এর বিপরীতদিকে অর্থাৎ পূর্বদিক হল বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল, তাই বৃষ্টি খুব কম—বছরে গড়ে ৬০ সে. মি.-এরও কম। মালভূমির অন্যত্র বৃষ্টি এর চেয়ে একটু বেশি।

মালভূমির দক্ষিণ-পূর্বাংশে শীতকালে কিছু বৃষ্টি হয়। এর কারণ শীতকালে

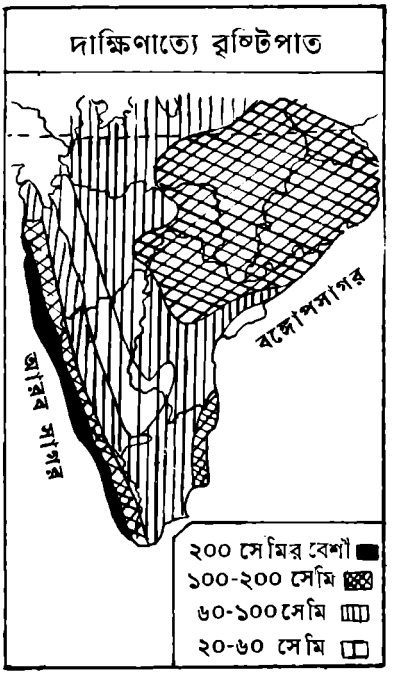

ভারতের উত্তর পূর্বদিক থেকে আসা শুকনো মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে যখন এখানে আসে জলীয় বাষ্পে পূর্ণ হয়ে যায়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ ঐ বায়ু পূর্বঘাটে বাধা পেয়ে বৃষ্টি হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : গাছ কোথায় কি ধরনের হবে তা নির্ভর করে জলের ওপর। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি ত এক ধরনের নয়, তাই প্রধানত তিন ধরনের গাছ হয় :

১. **চিরসবুজ গাছ :** পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে বৃষ্টি বেশি বলে চন্দন, সেগুন, শিশু, বাঁশ প্রভৃতি চিরসবুজ গাছ হয়। এই গাছগুলোর কাঠ খুব মূল্যবান।

২. **কাঁটাগাছ, ঘাস ও ঝোপ :** পশ্চিমঘাটের পূর্ব ঢালে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে বৃষ্টি খুব কম। তাই বড় গাছ বিশেষ হয় না—ঘাস, ঝোপ ইত্যাদি বেশি, এর মাঝে কিছু কিছু কাঁটাগাছ দেখা যায়।

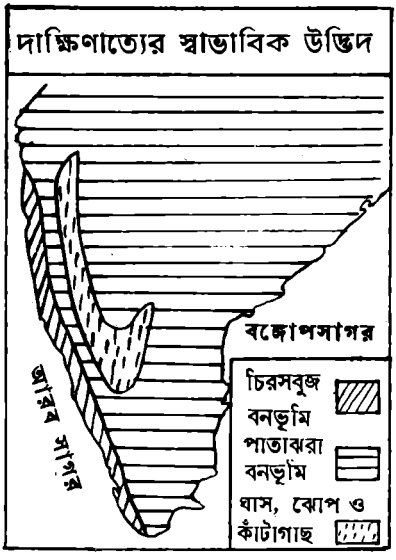

৩. **পাতাঝরা গাছ :** দাক্ষিণাত্য মালভূমির বাকি অংশে বৃষ্টি মাঝামাঝি বলে পাতাঝরা গাছ জন্মে, যেমন—শাল, শিমূল, কুল পলাশ ইত্যাদি। বৃষ্টিহীন ঋতুতে এইসব গাছে পাতা থাকে না।

মাটি : দাক্ষিণাত্যে ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মাটির বেশ ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। এখানে প্রধানত তিন ধরনের মাটি দেখা যায়। এই মাটিগুলো লক্ষ্য করে দেখ—যেখানে যে পাথর দেখা যায় সেই অনুসারে বেশির ভাগ মাটি তৈরি হয়েছে :

১. **কালোমাটি বা রেগুর :** উত্তর পশ্চিমাংশের লাভা অঞ্চলে উর্বর কালো মাটি (Black soil) দেখা যায়। লাভা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এই মাটি তৈরি হয়েছে। এতে তুলোর চাষ এত ভাল হয় যে চলতি কথায় একে তুলোমাটিও বলে।

২. **লালমাটি :** দাক্ষিণাত্যের যে সব অংশে গ্রানাইট-নিস পাথর বেশি, যেমন কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে এবং ছোটনাগপুরে লালমাটি দেখা যায়। এতে লোহার ভাগ বেশি থাকে বলে রং লাল।

৩. **ল্যাটেরাইট :** দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টি বেশি সেখানে এই ল্যাটেরাইট দেখা যায়। কাঁকরেপূর্ণ এই মাটিতে চাষ আবাদ বিশেষ হয় না।

খনিজ : মনে রাখ, সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে ভাল খনিজ এই দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়। এক কথায় দাক্ষিণাত্যকে খনিজের ভাঁড়ার বলতে পার। একমাত্র খনিজ ও প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়া ভারতের সব প্রধান খনিজ এখান থেকে তোলা হয়। এখানকার খনিজগুলোর নাম এবং ওগুলো কোথায় পাওয়া যায় বলে দিচ্ছি—একেবারে মুখস্থ করে নাও—

কয়লা : ছোটনাগপুরের ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি, করণপুরা ও রাজমহল ; মধ্যপ্রদেশের কোরবা, উমারিয়া ও পেঞ্চ উপত্যকা ; অন্ধ্রপ্রদেশের সিঙ্গারেণী ; মহারাষ্ট্রের চান্দা ও কাম্পটি প্রভৃতি।

লৌহ আকরিক : বিহারের নোয়ামুণ্ডি, বুদাবুরু ও পানশিরাবুরু ; উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ জেলার গুরুমহিষানী, সুলাইপাত, বাদামপাহাড় ও বোনাই এবং কেওনঝাড় জেলার বাগিয়াবুরু ; মধ্যপ্রদেশের দুর্গ জেলার দাল্লীরাজহারা ও বস্তার ; কর্ণাটকের বাবাবুদান পাহাড়, বেলারী, হসপেট ও চিত্রদুর্গ ; অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর, কুডাপ্পা ও কুর্ণুল ; মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি, চান্দা প্রভৃতি।

ম্যাঙ্গানীজ : উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ, কালাহাণ্ডি, কোরাপুট, বোনাই, কেওনঝাড় ও গাংপুর ; মধ্যপ্রদেশের ছিন্দোয়ারা, জব্বলপুর, মহারাষ্ট্রের নাগপুর ও ভাণ্ডারা ; অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম ; কর্ণাটকের বেলগাঁও, সিমোগা, টুম্কুর ও চিত্রদুর্গ ;

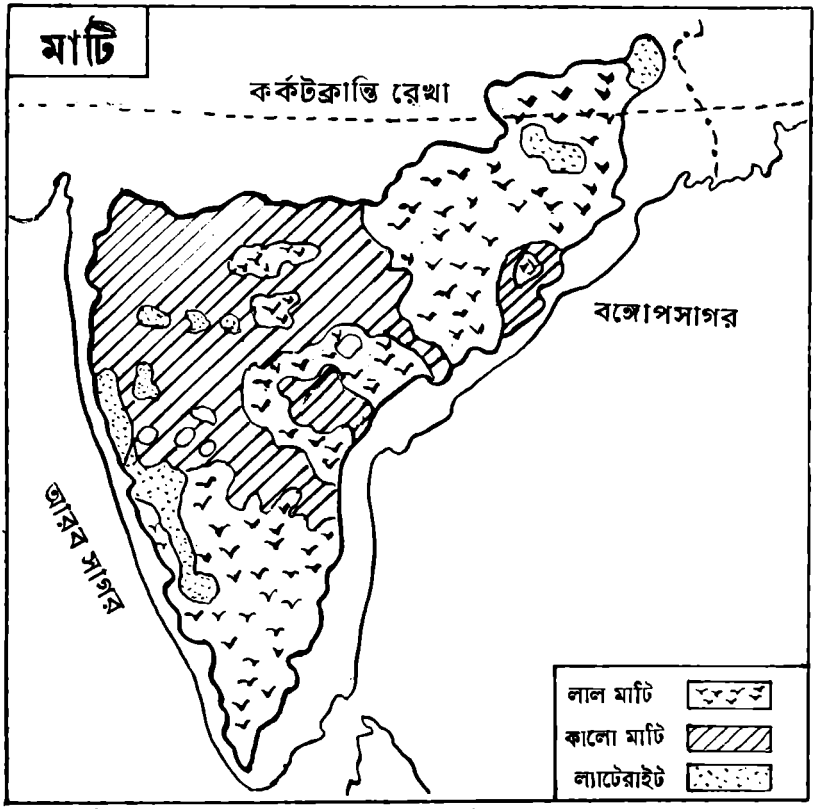

বিহারের সিংভূম প্রভৃতি।

বক্সাইট ঃ বক্সাইট গলিয়ে পাওয়া যায় অ্যালুমিনিয়াম। এই বক্সাইটের প্রধান খনিগুলো হল—বিহারের লোহারডাগা; উড়িষ্যার সম্বলপুর ও কালাহাণ্ডি, মধ্য-প্রদেশের বালাঘাট; মহারাষ্ট্রের শোলাপুর, কর্ণাটকের বাবাবুদান পাহাড় ও বেলগাঁও প্রভৃতি।

অভ্র ঃ বিহারের মুঙ্গের, হাজারীবাগ ও গয়া, অন্ধ্রের নেলোরে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভ্র পাওয়া যায়।

তামা ঃ বিহারের সিংভূম জেলার

প্রশ্ন

১. দাক্ষিণাত্য মালভূমির জলবায়ু কিভাবে অবস্থান, সমুদ্র ও ভূ-প্রকৃতির জন্য নিয়ন্ত্রিত হয় আলোচনা কর।

২. পশ্চিমঘাটের পশ্চিম ঢালে বৃষ্টি বেশি কিন্তু পূর্ব ঢালে কম কেন?

৩. দাক্ষিণাত্যের কোথায় কোথায় কি কি বনভূমি দেখা যায়?

৪. দাক্ষিণাত্যের প্রধান মাটিগুলো কি? ওগুলো কোথায় কোথায় দেখা যায়?

৫. দাক্ষিণাত্যের প্রধান খনিজগুলোর নাম কি? কয়লা ও লৌহ আকরিক দাক্ষিণাত্যের কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?

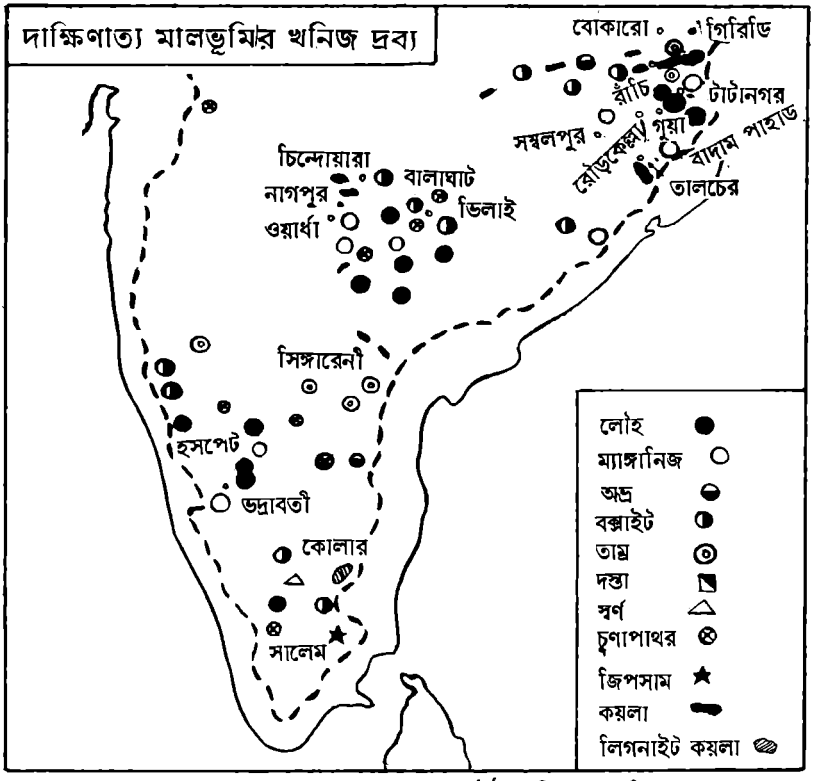

ঘাটশিলা ও মোসাবনি প্রভৃতি।

চুণাপাথর ঃ উড়িষ্যার বীরমিত্রপুর ও গাংপুর ; মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর, রায়পুর ; কর্ণাটকের ভাণ্ডিগুডা প্রভৃতি।

সোনা ঃ কর্ণাটকের কোলার ও রায়চুড়।

হীরে ঃ কর্ণাটকের গোলকুণ্ডা।

ইউরেনিয়াম ঃ বিহারের যদুগোড়া।

আজ আলোচনা এখানেই শেষ। দাক্ষিণাত্য মালভূমি এবং এর তিনটি উপঅঞ্চল নিয়ে পরের দুটি পাঠেও আলোচনা করব।

গৌতম মল্লিক

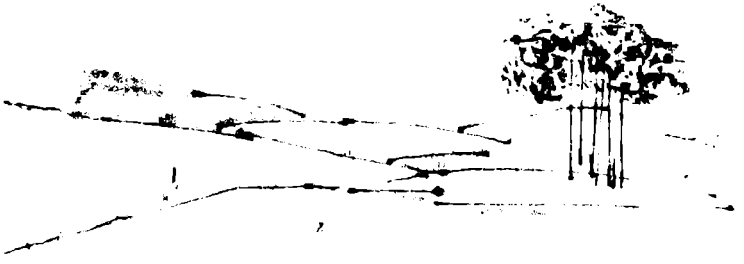

গণিত

পাটিগণিত

গত সংখ্যায় পাটিগণিতে আমরা 'মিশ্রণ' নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম সেখানে একই পদার্থের দুরকম দরের দ্রব্যের মিশ্রণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ দুরকম পদার্থের মিশ্রণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এই দুরকম পদার্থ হবে তরল পদার্থ। কারণ মিশ্রণটি সমসত্ত্ব হওয়া প্রয়োজন। মিশ্রণের যে কোন অংশে মিশ্রিত পদার্থের অনুপাত একরকম থাকলে সেই মিশ্রণকে সমসত্ত্ব বলা হয়। আজকের সমস্যা মিশ্রণের দ্বিতীয় সমস্যা যদিও এর শাখা সমস্যা আমরা আলোচনা করব।

দ্বিতীয় সমস্যা ঃ দুটি তরলের মিশ্রণের মোট পরিমাণ এবং দুটি তরলের অনুপাত দেওয়া আছে। এই মিশ্রণে দুটির মধ্যে যে কোন একটি তরল আরও মেশালে ঐ তরল দুটির অনুপাত পরিবর্তিত হবে। এখন এই পরিবর্তিত অনুপাত জানা থাকলে কি পরিমাণ তরল ঢালা হয়েছিল তা বের করতে হবে।

। নম্বর প্রশ্ন ঃ 55 লিটার জল মিশ্রিত দুধে, দুধ ও জলের অনুপাত 9 : 2। ঐ মিশ্রণে আর কত লিটার জল ঢাললে দুধ ও জলের অনুপাত 15 : 4 হবে ?

পদ্ধতি ঃ প্রথমে সমানুপাতিক ভাগহারের পদ্ধতিতে 55 লিটার দুধ ও জলের পরিমাণ বের কর। এবার আরও জল মেশানর ফলে দুধ ও জলের অনুপাত 15 : 4 হল। অতএব, $\frac{\text{দুধের পরিমাণ}}{\text{জলের পরিমাণ}} = \frac{15}{4}$.....(1) এখন দুধের পরিমাণ প্রথম মিশ্রণে যা ছিল এখনও তাই আছে, কারণ দ্বিতীয়বারে শুধু জল মেশান হয়েছে। এখন দুধের পরিমাণ (1) নম্বরে বসালে জলের পরিমাণ বেরিয়ে যাবে। প্রথম মিশ্রণে জলের পরিমাণ থেকে এই দ্বিতীয় মিশ্রণে জলের পরিমাণ কত বেশি বিয়োগ করে দেখ ; এই অতিরিক্ত জলই প্রথম মিশ্রণে ঢালা হয়েছিল।

সমাধান ঃ

জল মিশ্রিত দুধের মোট পরিমাণ = 55 লিটার

এই মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত = 9 : 2

এখন 9 + 2 = 11

মিশ্রণে দুধের পরিমাণ $= \frac{\overset{5}{\cancel{55}}}{\cancel{11}} \times 9$ লিটার = 45 লিটার

এবং জলের পরিমাণ $= \frac{\overset{5}{\cancel{55}}}{\cancel{11}} \times 2$ লিটার = 10 লিটার

এখন এই 55 লিটার মিশ্রণে আরও কিছু জল ঢালার ফলে যে দ্বিতীয় মিশ্রণটি তৈরি হল,তার মধ্যে দুধ ও জলের অনুপাত 15 : 4।

কিন্তু দ্বিতীয় মিশ্রণে দুধের পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে ; অর্থাৎ 45 লিটারই আছে। এখন এই মিশ্রণে

$$\frac{\text{দুধের পরিমাণ}}{\text{জলের পরিমাণ}} = \frac{15}{4}$$

$$\text{or,} \quad \frac{45 \text{ লিটার}}{\text{জলের পরিমাণ}} = \frac{15}{4}$$

$$\text{or,} \quad \frac{\text{জলের পরিমাণ}}{45 \text{ লিটার}} = \frac{4}{15} \quad [\text{ দুপক্ষেই লব ও হর উল্টান হল }]$$

$$\therefore \quad \text{জলের পরিমাণ} = \frac{4}{\cancel{15}} \times \overset{3}{\cancel{45}} \text{ লিটার}$$

$$= 12 \text{ লিটার}$$

তাহলে জল ঢালার আগে মিশ্রণে 10 লিটার জল ছিল। কিন্তু জল ঢালার পর 12 লিটার জল হল।

∴ মিশ্রণে (12 − 10) লিটার বা 2 লিটার জল ঢালা হয়েছিল।

উত্তর ঃ মিশ্রণে 2 লিটার জল ঢালা হয়েছে।

অনুশীলনের জন্য ঃ 84 ঘন সেণ্টিমিটার লঘু এসিডে (জল মিশ্রিত করে এসিড লঘু করা হয়) এসিড ও জলের অনুপাত 5 : 2। ঐ লঘু এসিডে আরও কত ঘন সেণ্টিমিটার জল মেশালে এসিড ও জলের অনুপাত 2 : 1 হবে ? [উত্তর—6 লিটার]

[K. C. Nag—Ex. 6-এর 9 নম্বর অঙ্ক দেখ।]

জটিলতা বৃদ্ধি ঃ দুটি তরলের মিশ্রণের পরিমাণ দেওয়া নাই, কিন্তু তরল দুটির অনুপাত দেওয়া আছে। আগের প্রশ্নে একটি তরল মিশ্রণে সরাসরি ঢালা হয়েছিল। এখন যদি মিশ্রণের কিছু অংশ তুলে ঠিক সেই পরিমাণ দুটি তরলের যে কোন একটি মেশান হয়, তবে তরল দুটির অনুপাতও পাল্টে যাবে। এই পরিবর্তিত অনুপাত জানিয়ে দেওয়া হল। বের করতে হবে কত অংশ মিশ্রণ তুলে ফেলা হয়েছিল।

2 নম্বর প্রশ্ন ঃ জল মিশ্রিত দুধে, দুধ ও জলের অনুপাত 3 : 2। ঐ মিশ্রণের কত অংশ তুলে নিয়ে সেই পরিমাণ জল ঢাললে দুধ ও জলের অনুপাত 18 : 17 হবে ?

পদ্ধতি ঃ প্রথম মিশ্রণে সমানুপাতিক ভাগহার পদ্ধতিতে দুধ ও জলের **অংশ** বের কর।

সাধারণত সমানুপাতিক ভাগহার পদ্ধতিতে বিভিন্ন পদার্থের পরিমাণ বের করা হয়। সেক্ষেত্রে মোট পদার্থের পরিমাণ দেওয়া থাকে। এক্ষেত্রে তা দেওয়া নাই। কিন্তু মোট অংশ **1 অংশ** ধরা হয়। কাজেই সমানুপাতিক ভাগহার পদ্ধতিতে দুধ ও জলের অংশ বের করা যাবে।

এবার কিছু মিশ্রণ তুলে ফেলে আবার কিছু জল ঢালার পর যে দ্বিতীয় মিশ্রণটি হল সেটিতেও সমানুপাতিক ভাগহার পদ্ধতিতে শুধু দুধের **অংশ** বের কর। অর্থাৎ **যে দ্রব্যটি আবার ঢালা হয় নাই** সেটির অংশ বের কর। মিশ্রণে জল ঢালা হয়েছিল, দুধ ঢালা হয় নাই। কাজেই দুধের অংশ কমে যাবে। কতটা অংশ দুধ কমে গেল তা বের কর। মিশ্রণ যতটা তুলে ফেলা হয়েছিল তার মধ্যে দুধের এই অংশটুকু ছিল। এখন তুলে ফেলা মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত 18 : 17। অতএব $\frac{\text{দুধের অংশ}}{\text{জলের অংশ}} = \frac{18}{17}$। দুধের অংশ জানা

আছে। কাজেই জলের অংশ বেরিয়ে যাবে। এই দুধ ও জলের অংশ যোগ করলে মিশ্রণের ফেলে দেওয়া অংশটি পাওয়া যাবে।

সমাধান ঃ জল মিশ্রিত দুধে, দুধ ও জলের অনুপাত $= 3 : 2$

এখন $3 + 2 = 5$

$\therefore$ প্রথম মিশ্রণে দুধ $\frac{1}{5} \times 3$ অংশ $= \frac{3}{5}$ অংশ আছে

এবং " " জল $\frac{1}{5} \times 2$ " $= \frac{2}{5}$ " "

এবার কিছুটা মিশ্রণ তুলে নিয়ে সমপরিমাণ জল ঢালা হল। এই দ্বিতীয় মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত $18 : 17$।

এখন $18 + 17 = 35$

দ্বিতীয় মিশ্রণে দুধ $\frac{1}{35} \times 18$ অংশ $= \frac{18}{35}$ অংশ আছে।

দ্বিতীয় মিশ্রণে জল অতিরিক্ত ঢালা হয়েছিল, দুধ ঢালা হয় নাই। কাজেই দুধের অংশ কমে গেল।

এখন, প্রথম মিশ্রণ থেকে দ্বিতীয় মিশ্রণে দুধ $\left(\frac{3}{5} - \frac{18}{35}\right)$ অংশ কমে গেল

$= \frac{21 - 18}{35}$ " " "

$= \frac{3}{35}$ " " "

তুলে ফেলা মিশ্রণে দুধ $\frac{3}{35}$ অংশ ছিল।

এখন, যেহেতু প্রথম মিশ্রণেরই কিছুটা তুলে ফেলা হয়েছিল, অতএব তুলে ফেলা মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত প্রথম মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাতের সমান অর্থাৎ $3 : 2$ হবে।

$$\frac{\text{দুধের অংশ}}{\text{জলের অংশ}} = \frac{3}{2}$$

or, $$\frac{\frac{3}{35}}{\text{জলের অংশ}} = \frac{3}{2}$$

or, $$\frac{3}{35 \times \text{জলের অংশ}} = \frac{3}{2}$$

or, $$\frac{1}{35 \times \text{জলের অংশ}} = \frac{1}{2}$$

or, $35 \times$ জলের অংশ $= 2$ [বজ্রগুণন করে]

$\therefore$ জলের অংশ $= \frac{2}{35}$

$\therefore$ প্রথম মিশ্রণের তুলে ফেলা অংশ

= তুলে ফেলা দুধের অংশ + তুলে ফেলা জলের অংশ

$= \frac{3}{35} + \frac{2}{35} = \frac{3+2}{35} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$

উত্তর ঃ $\frac{1}{7}$ অংশ প্রথম মিশ্রণ তুলে ফেলা হয়েছিল।

অনুশীলনের জন্য ঃ একটি পাত্রে দুধ ও জলের অনুপাত 5 : 2। ঐ মিশ্রণের কত অংশ তুলে নিয়ে সমপরিমাণ জল ঢাললে দুধ ও জলের অনুপাত 2 : 1 হবে ?

[উঃ $\frac{1}{14}$ অংশ]

[K. C. Nag—Ex.6-এর 8 ও 10 নম্বর দেখ। K. P. Bose—Ex.6-এর 6 নম্বর অঙ্ক দেখ]

সমস্যার ভিন্নমুখী গতি ঃ

A. নির্দিষ্ট দুটি তরলের দুরকম মিশ্রণ তৈরি হল। অর্থাৎ ঐ দুটি মিশ্রণে তরল দুটির অনুপাত ভিন্ন। এই দুটি ভিন্ন অনুপাত জানিয়ে দেওয়া হল। এবার ঐ দুটি মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে আর একটি মিশ্রণ তৈরি হল। এই তৃতীয় মিশ্রণে তরল দুটির অনুপাত প্রথম দুটি থেকে পৃথক হবে। এই অনুপাতও জানিয়ে দেওয়া হল। বের করতে হবে কি অনুপাতে প্রথম দুটি মিশ্রণ নিয়ে তৃতীয় মিশ্রণটি তৈরি হল।

3 নম্বর প্রশ্ন ঃ

এসিড ও জল একটি পাত্রে 2 : 3 এবং আর একটি পাত্রে 5 : 2 অনুপাতে মেশান হল। পাত্র দুটি থেকে কি অনুপাতে মিশ্রণ দুটি নিয়ে মেশালে নতুন মিশ্রণে এসিড ও জলের অনুপাত 5 : 7 হবে ?

পদ্ধতি ব্যাখ্যা ঃ

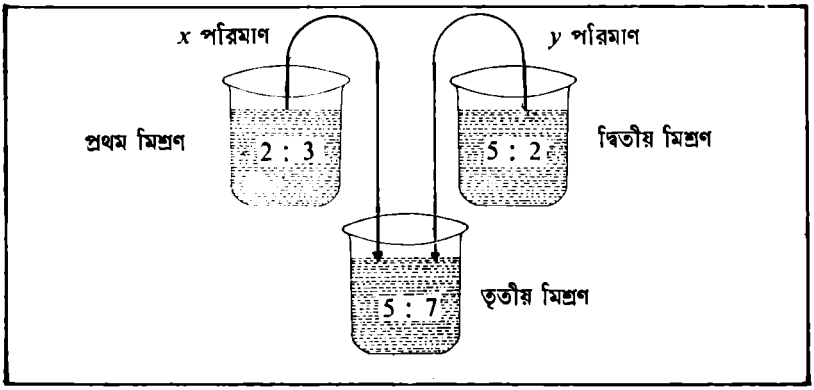

ছবি দেখ। প্রথম মিশ্রণে এসিড ও জলের অনুপাত 2 : 3। দ্বিতীয় মিশ্রণে ঐ অনুপাত 5 : 2। ধর প্রথম মিশ্রণ থেকে x পরিমাণ এবং দ্বিতীয় মিশ্রণ থেকে y পরিমাণ নিয়ে তৃতীয় মিশ্রণ তৈরি হল। কিন্তু x পরিমাণের মধ্যে এসিড ও জলের অনুপাত একরকম আর y পরিমাণের মধ্যে এসিড ও জলের অনুপাত একরকম। কাজেই এই দুটি মেশালে তৃতীয় মিশ্রণে এসিড ও জলের অনুপাত অন্যরকম হবে। তৃতীয় মিশ্রণে এই অনুপাত 5 : 7।

এখন তৃতীয় মিশ্রণে যে x পরিমাণ প্রথম মিশ্রণ আছে তার মধ্যে এসিড ও জলের পরিমাণ সমানুপাতিক ভাগহার পদ্ধতিতে বের কর। অনুরূপভাবে তৃতীয় মিশ্রণে যে y পরিমাণ দ্বিতীয় মিশ্রণ আছে তার মধ্যে এসিড ও জলের পরিমাণ সমানুপাতিক ভাগহার পদ্ধতিতে বের কর। এবার এই x এবং y পরিমাণের মধ্যে মোট এসিডের পরিমাণ এবং

মোট জলের পরিমাণ বের কর। এই দুটির মোট পরিমাণ তৃতীয় মিশ্রণে যথাক্রমে এসিড ও জলের পরিমাণ হবে। আবার এই মিশ্রণে এসিড ও জলের অনুপাত 5 : 7। অতএব তৃতীয় মিশ্রণে এসিডের পরিমাণ / তৃতীয় মিশ্রণে জলের পরিমাণ $= \frac{5}{7}$

এই সম্পর্কটি থেকে x ও y-এর একটি সমীকরণ হবে। সমীকরণটি সরল করে বামপক্ষে x যুক্ত পদগুলো এবং ডানপক্ষে y যুক্ত পদগুলো এনে আবার সরল কর। এরপর পক্ষান্তর করে $\frac{x}{y}$-এর মান বের কর। অর্থাৎ তৃতীয় মিশ্রণে প্রথম মিশ্রণের পরিমাণ / দ্বিতীয় মিশ্রণের পরিমাণ পাওয়া গেল। অর্থাৎ তৃতীয় মিশ্রণে প্রথম দুটি মিশ্রণের অনুপাত পাওয়া গেল।

সমাধান ঃ মনে করি প্রথম মিশ্রণ থেকে x পরিমাণ এবং দ্বিতীয় মিশ্রণ থেকে y পরিমাণ নিয়ে তৃতীয় মিশ্রণটি তৈরি হল।

প্রথম মিশ্রণে এসিড ও জলের অনুপাত 2 : 3

এখন $2+3=5$

$\therefore$ x পরিমাণ প্রথম মিশ্রণে এসিডের পরিমাণ $= \frac{x}{5} \times 2 = \frac{2x}{5}$

এবং x " " " জলের " $= \frac{x}{5} \times 3 = \frac{3x}{5}$

পুনরায়, দ্বিতীয় মিশ্রণে এসিড ও জলের অনুপাত 5 : 2

এখন $5+2=7$

$\therefore$ y পরিমাণ দ্বিতীয় মিশ্রণে এসিডের পরিমাণ $= \frac{y}{7} \times 5 = \frac{5y}{7}$

এবং y " " " জলের " $= \frac{y}{7} \times 2 = \frac{2y}{7}$

$\therefore$ তৃতীয় মিশ্রণে এসিডের পরিমাণ $= \frac{2x}{5} + \frac{5y}{7}$

এবং " " জলের " $= \frac{3x}{5} + \frac{2y}{7}$

এখন তৃতীয় মিশ্রণে এসিড ও জলের অনুপাত $= 5 : 7$

$\therefore$ $\frac{\text{এসিডের পরিমাণ}}{\text{জলের পরিমাণ}} = \frac{5}{7}$

or, $\frac{\frac{2x}{5} + \frac{5y}{7}}{\frac{3x}{5} + \frac{2y}{7}} = \frac{5}{7}$

or, $\frac{\frac{14x+25y}{35}}{\frac{21x+10y}{35}} = \frac{5}{7}$

or, $\frac{14x+25y}{21x+10y} = \frac{5}{7}$

or, $7(14x+25y) = 5(21x+10y)$ [বজ্র গুণন করে]

$$\text{or,} \quad 98x + 175y = 105x + 50y$$
$$\text{or,} \quad 98x - 105x = 50y - 175y$$
$$\text{or,} \quad -7x = -125y$$
$$\text{or.} \quad 7x = 125y \qquad [\text{ উভয়পক্ষে বাদ গেল }]$$
$$\text{or,} \quad \frac{x}{y} = \frac{125}{7}$$
$$\text{অর্থাৎ} \quad \frac{\text{প্রথম মিশ্রণের পরিমাণ}}{\text{দ্বিতীয় মিশ্রণের পরিমাণ}} = \frac{125}{7}$$

উত্তর ঃ তৃতীয় মিশ্রণে 125 : 7 অনুপাতে প্রথম দুটি মিশ্রণ নিতে হবে।

অনুশীলনের জন্য ঃ দুটি পাত্রে সিরাপ ও জলের অনুপাত যথাক্রমে 2 : 1 এবং 1 : 2. কি অনুপাতে দুটি পাত্র থেকে তৃতীয় পাত্রে ঢাললে ঐ পাত্রে সিরাপ ও জলের পরিমাণ সমান হবে ? (দুটির পরিমাণ সমান হলে অনুপাত 1 : 1 হয়) [**উঃ 1 : 1**]

[K.C. Nag—Ex. 6-এর 12 ও 13 নম্বর অঙ্ক দেখ। 13 নম্বরের অঙ্কে x ধরতে হবে না। কারণ $x = 3$ লিটার দেওয়া আছে। y-এর মানই বের করতে বলা হয়েছে।]

B. একটি পাত্র কোন তরল দ্বারা পূর্ণ আছে এবং তার পরিমাণও দেওয়া আছে। এখন ঐ পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল তুলে নিয়ে অপর একটি তরল দিয়ে পাত্রটি আবার পূর্ণ করা হল। আবার ঐ পাত্র থেকে আগে যে পরিমাণ তরল তোলা হয়েছিল, সেই পরিমাণ মিশ্রণ তুলে নিয়ে ঐ দ্বিতীয় তরল দিয়ে পাত্রটিকে আবার পূর্ণ করা হল। এইরকম কয়েকবার করার পর মিশ্রণে তরল দুটির অনুপাত কত হবে তা বের করতে হবে।

4 নম্বর প্রশ্ন ঃ একটি পাত্র 24 লিটার দুধে পূর্ণ আছে। 3 লিটার দুধ তুলে নিয়ে পাত্রটি জল ঢেলে পূর্ণ করা হল। আবার ঐ পাত্র থেকে 3 লিটার জল মেশান দুধ তুলে নিয়ে পাত্রটি জল ঢেলে পূর্ণ করা হল। তৃতীয়বার এইরকম করার পর পাত্রে দুধ ও জলের অনুপাত কত হবে ?

পদ্ধতি ব্যাখ্যা ঃ এখানে তিনবার জল ঢেলে তিনরকম মিশ্রণ তৈরি হচ্ছে। ছবি দেখ।

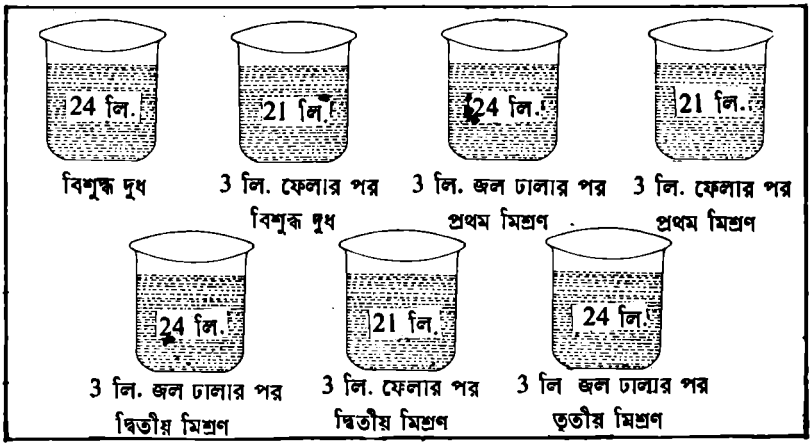

3 লিটার তুলে ফেলা এবং 3 লিটার জল ঢেলে ভরার 6টি প্রক্রিয়া চিত্রে দেখান হল। 24 লিটার দুধের 3 লিটার তুলে 3 লিটার জল ঢালা হল। ফলে প্রথম মিশ্রণ তৈরি হল। এই মিশ্রণে দুধ $24-3=21$ লিটার এবং জল 3 লিটার আছে। কাজেই প্রথম মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত বের করা যাবে। প্রথম মিশ্রণ থেকে 3 লিটার তুলে 3 লিটার জল ঢালার ফলে দ্বিতীয় মিশ্রণ তৈরি হল। এই মিশ্রণে প্রথম মিশ্রণ $(24-3)=21$ লিটার আছে এবং অতিরিক্ত জল 3 লিটার আছে। অতএব দ্বিতীয় মিশ্রণে প্রথম মিশ্রণ ও অতিরিক্ত জলের অনুপাত বের করা যাবে। স্পষ্টতই এই অনুপাত আগের অনুপাতেরই সমান হবে। কারণ পূর্বরাশি ও উত্তর রাশির মান ত একই। দ্বিতীয় মিশ্রণ থেকে 3 লিটার তোলার পর $(24-3)=21$ লিটার থাকবে। এই 21 লিটারে প্রথম মিশ্রণের পরিমাণ সমানুপাতিক ভাগহার পদ্ধতিতে বের কর। প্রথম মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত আগেই বের করেছ। কাজেই এই পরিমাণ প্রথম মিশ্রণে দুধের পরিমাণ সমানুপাতিক ভাগহার পদ্ধতিতে বের করা যাবে। এটাই হবে 21 লিটার দ্বিতীয় মিশ্রণে দুধের পরিমাণ। এবার আরও 3 লিটার জল ঢেলে তৃতীয় মিশ্রণ তৈরি হল। এই তৃতীয় মিশ্রণে দুধ ত আর অতিরিক্ত ঢালা হয় নাই। কাজেই দ্বিতীয় মিশ্রণের 21 লিটারে যে পরিমাণ দুধ আছে (যা বের করা হল) তৃতীয় মিশ্রণেও সেই পরিমাণ দুধ থাকবে। 24 লিটারের বাকি অংশটুকু জল। এখন $\frac{\text{দুধের পরিমাণ}}{\text{জলের পরিমাণ}}$ বের কর। ফলে তৃতীয় মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত পেয়ে গেলে।

সমাধান ঃ প্রথমে পাত্রটি 24 লিটার খাঁটি দুধে পূর্ণ ছিল। প্রথমবার 3 লিটার তুলে ফেলায় ($24-3$) লি. $=21$ লিটার দুধ থাকল।

আবার প্রথমবার 3 লিটার জল ঢালার পর এই মিশ্রণে (প্রথম মিশ্রণে) দুধ ও জলের অনুপাত $=21:3=(3\times7):(3\times1)=7:1$

এই মিশ্রণ থেকে আবার (দ্বিতীয়বার) 3 লিটার তোলা হল।

অবশিষ্ট রইল ($24-3$) লিটার $=21$ লিটার। এই 21 লিটার প্রথম মিশ্রণে আবার (দ্বিতীয়বার) 3 লিটার জল ঢেলে দ্বিতীয় মিশ্রণ তৈরি হল।

$\therefore$ এই দ্বিতীয় মিশ্রণে প্রথম মিশ্রণ ও অতিরিক্ত জলের অনুপাত $21:3=7:1$.

দ্বিতীয় মিশ্রণ থেকে আবার (তৃতীয়বার) 3 লিটার তোলা হল। ফলে ($24-3$) লিটার $=21$ লিটার অবশিষ্ট থাকল।

এখন $7+1=8$

$\therefore$ 21 লিটার দ্বিতীয় মিশ্রণে প্রথম মিশ্রণের পরিমাণ

$$\left(\frac{21}{8}\times7\right) \text{ লি. } =\left(21\times\frac{7}{8}\right) \text{ লি.}$$

আগেই বের করা হয়েছে প্রথম মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত $=7:1$

এখন $7+1=8$

$\left(21\times\frac{7}{8}\right)$ লিটার প্রথম মিশ্রণে দুধের পরিমাণ

$$=\left(\frac{21\times\frac{7}{8}}{8}\times7\right) \text{ লিটার}$$

$$= \left(21 \times \frac{7}{8} \times \frac{7}{8}\right) \text{ লিটার}$$

$$= \frac{1029}{64} \text{ লিটার}$$

$\therefore$ 21 লিটার দ্বিতীয় মিশ্রণে $\frac{1029}{64}$ লিটার দুধ আছে। এই লিটার দ্বিতীয় মিশ্রণে আবার (তৃতীয়বার) 3 লিটার জল ঢেলে তৃতীয় মিশ্রণে তৈরি হল। আর জল ফেলা হল না। কাজেই $21 + 3 = 24$ লিটার তৃতীয় মিশ্রণে দুধের পরিমাণ $\frac{1029}{64}$ লিটারই থাকল।

$\therefore$ এই 24 লিটার তৃতীয় মিশ্রণের জলের পরিমাণ

$$= \left(24 - \frac{1029}{64}\right) \text{ লিটার}$$

$$= \frac{1536 - 1029}{64} \text{ লিটার}$$

$$= \frac{507}{64} \text{ লিটার}$$

তৃতীয় মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত

$$\frac{1029}{64} : \frac{507}{64} = 1029 : 507$$

$$= (3 \times 343) : (3 \times 169)$$

$$= 343 : 169$$

উত্তর ঃ তৃতীয় মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত 343 : 169।

অনুশীলনের জন্য ঃ একটি পাত্র 20 লিটার সিরাপে পূর্ণ ছিল। 2 লিটার তুলে পাত্রটি জল ঢেলে পূর্ণ করা হল। আবার 2 লিটার তুলে 2 লিটার জল ঢেলে পূর্ণ করা হল। এইভাবে তিনবার জল ঢালার পর পাত্রে সিরাপ ও জলের অনুপাত কত হবে ?

[উঃ 729 : 271]

[K. C. Nag—Ex. 6-এর 15 নম্বর অঙ্কটি দেখ]

বীজগণিত

গত সংখ্যায় আমরা সরল সমীকরণের সাধারণ পদ্ধতি আলোচনা করেছি এবং সমীকরণের উভয়পক্ষের রাশিগুলো কিভাবে সরল করতে হয় তাও আলোচনা করেছি। আজও আমরা সরল সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে যাব। এর আগে তোমরা গত সংখ্যার বীজগণিত অংশ আবার দেখে নাও।

গত সংখ্যায় যে সব সমীকরণ আমরা আলোচনা করেছিলাম সেক্ষেত্রে অজ্ঞাত রাশি x ছাড়া অন্যান্য অংশগুলো সাংখ্যমানযুক্ত ছিল। যদি সেগুলো আক্ষরিক মানযুক্ত হয় (যেমন a, b, c ইত্যাদি) তাহলেও একই ভাবে সরল করে সমাধান করতে হবে। সেক্ষেত্রে x-এর মান আক্ষরিক মানযুক্ত হবে। তৃতীয় ব্র্যাকেটের অংশগুলো লিখবে না।

উদাহরণ ঃ $\frac{m^2}{nx} + \frac{n^2}{mx} = m^2 - mn + n^2$

হরগুলোর ল.সা গু mnx

mnx দিয়ে উভয়পক্ষকে গুণ করে পাই

$$mnx.\frac{m^2}{nx}+mnx.\frac{n^2}{mx}=mnx(m^2-mn+n^2)$$

or, $m^3+n^3=mnx(m^2-mn+n^2)$

or, $(m+n)(m^2-mn+n^2)=mnx(m^2-mn+n^2)$

[বামপক্ষে $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ সূত্র প্রয়োগ করা হল]

or, $m+n=mnx$

[উভয়পক্ষ থেকে m^2-mn+n^2 উৎপাদকটি বাদ গেল]

or, $mnx=m+n$

[বামপক্ষটি ডানপক্ষে এবং ডানপক্ষটি বামপক্ষে আনা হল]

$$x=\frac{m+n}{mn}$$

উত্তর ঃ $\mathbf{x=\frac{m+n}{mn}}$

অনুশীলনের জন্য

$$\frac{x-1}{bc}+\frac{x-1}{ca}+\frac{x-1}{ab}=0$$ [উত্তর ঃ $x=1$]

[K. C. Nag—Ex. 17-র 6—9, 15, 17 অঙ্কগুলো দেখ]

আলোচনা ঃ গত সংখ্যায় আমাদের একটি বিশেষ আলোচনা বাকি ছিল। সেটি হল—উভয়পক্ষে যোগ-বিয়োগ থাকলে পক্ষান্তরের সময় চিহ্ন পাল্টাতে হয়, কিন্তু উভয়পক্ষে রাশিগুলো গুণ বা ভাগ আকারে থাকলে কিভাবে পক্ষান্তর করা যায় সেটা জানা দরকার। নিয়ম হল গুণ থাকলে পক্ষান্তরের সময় ভাগ করতে হয় আর ভাগ থাকলে গুণ করতে হয়।

1. ধর $ab=cd$

এখানে উভয়পক্ষে রাশিগুলো গুণ আকারে আছে। ধর b-কে ডানপক্ষে নেবে। যেহেতু বামপক্ষে b গুণ আকারে আছে, অতএব ডানপক্ষে নেবার সময় ভাগ করতে হবে।

অর্থাৎ $ab=cd$

$$\therefore \quad a=\frac{cd}{b}$$

এই কারণে $\frac{ab}{c}=d$ হবে।

2. ধর $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$

বামপক্ষে b ভাগ করা আছে। অতএব এটিকে ডানপক্ষে নিতে হলে গুণ করতে হবে।

অর্থাৎ $a=\frac{bc}{d}$ হবে

একই কারণে $\frac{ad}{b}=c$ হবে।

1 নম্বরের পক্ষে যুক্তি

$$ab = cd$$

উভয়পক্ষকে b দিয়ে ভাগ করে পাই

$$\frac{ab}{b} = \frac{cd}{b}$$

$$\text{or,} \quad a = \frac{cd}{b}$$

2 নম্বরের পক্ষে যুক্তি

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

উভয়পক্ষে b দিয়ে গুণ করে পাই

$$\frac{a}{b} \times b = \frac{c}{d} \times b$$

$$\text{or,} \quad a = \frac{bc}{d}$$

এবার সমীকরণ সমাধানের কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতি দেখ। এই বিশেষ পদ্ধতিগুলো সমীকরণটির বিশেষ আকারের ওপর নির্ভর করে।

1. **সুবিধামত পক্ষান্তরকরণ ঃ** অনেক সময় সমীকরণের পদগুলো ভগ্নাংশ আকারে থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হরে সাংখ্যমান থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হরে x-যুক্ত বীজগাণিতিক রাশি থাকে।

উদাহরণ ঃ $\dfrac{51x-7}{15} + \dfrac{4x-14}{7x-6} = \dfrac{17x-3}{5}$

পদ্ধতি ঃ সাংখ্যমানের হর-যুক্ত ভগ্নাংশগুলোকে একপক্ষে আন, আবার বীজগাণিতিক রাশির হর-যুক্ত ভগ্নাংশগুলো আর একপক্ষে আন। এরপর দুপক্ষ সরল করে যাও পৃথকভাবে। সরল করার পর দুপক্ষে একটি করে ভগ্নাংশ আকারের রাশি থাকবে। এরপর গত সংখ্যার আলোচনা অনুসারে সমাধান কর।

সমাধান ঃ

$$\frac{51x-7}{15} + \frac{4x-14}{7x-6} = \frac{17x-3}{5}$$

$$\text{or,} \quad \frac{4x-14}{7x-6} = \frac{17x-3}{5} - \frac{51x-7}{15}$$

[সাংখ্যমানের হর-যুক্ত পদগুলো ডানপক্ষে আনা হল]

$$\text{or,} \quad \frac{4x-14}{7x-6} = \frac{3(17x-3)-(51x-7)}{15}$$

$$\text{or,} \quad \frac{4x-14}{7x-6} = \frac{51x-9-51x+7}{15}$$

$$\text{or,} \quad \frac{4x-14}{7x-6} = \frac{-2}{15}$$

[এই কয়টি step-এ ডানপক্ষ সরল করা হল]

$$\text{or,} \quad 15(4x-14) = -2(7x-6)$$ [বজ্রগুণন করা হল]

or, $60x-210=-14x+12$ [ব্র্যাকেট ওঠান হল]

or, $60x+14x=210+12$ [পক্ষান্তর করা হল]

or, $74x=222$ [উভয়পক্ষ সরল করা হল]

$$x=\frac{222}{74}=3$$

[ডানপক্ষের সাংখ্যমান 222-কে x-এর সহগ 74 দিয়ে ভাগ করা হল]

উত্তর ঃ $x=3$

অনুশীলনের জন্য ঃ

$$\frac{4x+7}{6}=\frac{3x-1}{5x-7}+\frac{6x+5}{9}$$ [উঃ $x=4$]

[K. C Nag—Ex. 19-এর 8, 9 নম্বর দেখ। K. P. Bose—Ex. 22-এর 14, 15 নম্বর দেখ]

2. **সুবিধামত বিচ্ছিন্নকরণ ঃ** অনেক সময় সমীকরণের তিনটি পদ ভগ্নাংশ আকারের থাকে। কিন্তু হরগুলোতে x-এর সঙ্গে একটি সাংখ্যমান + বা − চিহ্নসহ থাকে। ভগ্নাংশগুলোর আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে—কোন একটির লব, অপর দুটি লবের যোগফলের সমান।

উদাহরণ ঃ $\frac{3}{x+5}+\frac{5}{x+2}=\frac{8}{x+3}$

পদ্ধতি ঃ দেখ বাঁদিকের দুটি লবে 3 ও 5 আছে এবং ডানদিকের লবে 8 আছে। এখন $3+5=8$। একটি লবকে দুটি লবের যোগফল হিসাবে প্রকাশ করে ভাঙিয়ে দাও। ফলে সেটি দুটি ভগ্নাংশে পরিণত হবে। এবার একই লবযুক্ত দুটি ভগ্নাংশকে এক এক পক্ষে রাখ। এরপর সরল কর। দেখবে উভয়পক্ষে লবে x থাকবে না। এরপর গত সংখ্যার আলোচনা অনুসারে সমাধান কর।

সমাধান ঃ $\frac{3}{x+5}+\frac{5}{x+2}=\frac{8}{x+3}$

or, $\frac{3}{x+5}+\frac{5}{x+2}=\frac{3+5}{x+3}$ [$8=3+5$ বসান হল]

or, $\frac{3}{x+5}+\frac{5}{x+2}=\frac{3}{x+3}+\frac{5}{x+3}$

[ডান পক্ষের ভগ্নাংশটিকে বিচ্ছিন্ন করা হল]

or, $\frac{3}{x+5}-\frac{3}{x+3}=\frac{5}{x+3}-\frac{5}{x+2}$

[একই লব যুক্ত ভগ্নাংশগুলোকে পক্ষান্তর করে এক এক পক্ষে আনা হল]

or, $\frac{3(x+3)-3(x+5)}{(x+5)(x+3)}=\frac{5(x+2)-5(x+3)}{(x+3)(x+2)}$

[পাটিগণিতের নিয়মে উভয়পক্ষকে সরল করার কাজ আরম্ভ হল]

$$\text{or, } \frac{3x+9-3x-15}{(x+5)(x+3)}=\frac{3x+10-3x-15}{(x+3)(x+2)}$$

$$\text{or, } \frac{-6}{(x+5)(x+3)}=\frac{-5}{(x+3)(x+2)}$$

$$\text{or, } \frac{6}{(x+5)(x+3)}=\frac{5}{(x+3)(x+2)}$$

[উভয়পক্ষ থেকে − বাদ গেল]

$$\text{or, } 6(x+3)(x+2)=5(x+5)(x+3)$$ [বজ্রগুণন করা হল]

[সাধারণ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষে একই রাশি উৎপাদক আকারে থাকলে কেটে যায়। কিন্তু অজ্ঞাতরাশি x-যুক্ত উৎপাদক থাকলে কাটা গেলেও কাটবে না। কারণ তার থেকে x-এর একটি মান পাওয়া যেতে পারে]

$$\text{or, } 6(x+3)(x+2)-5(x+5)(x+3)=0$$ [পক্ষান্তর করা হল]

$$\text{or, } (x+3)\{6(x+2)-5(x+5)\}=0$$ [$(x+3)$ কমন নেওয়া হল]

$$\text{or, } (x+3)(6x+12-5x-25)=0$$

$$\text{or, } (x+3)(x-13)=0$$

[কোন সংখ্যাকে 0 দিয়ে গুণ করলে গুণফল 0 হয়]

হয় $(x+3)=0$, নতুবা $(x-13)=0$ হবে।

কিন্তু $(x+3)=0$ হলে প্রদত্ত সমীকরণের $\frac{8}{x+3}=\frac{8}{0}$। এর সংজ্ঞা আমাদের জানা নাই।

$$\therefore \quad x+3\neq 0 \qquad [\neq \text{'সমান নয়' চিহ্ন}]$$

$$\therefore \quad x-13=0$$

$$\therefore \quad x=13$$

উত্তর ঃ $\mathbf{x=13}$

অনুশীলনের জন্য ঃ $\frac{p}{x-p}+\frac{q}{x-q}=\frac{p+q}{x-p-q}$ $\left[\text{ উঃ } x=\frac{p+q}{2}\right]$

[এছাড়া K. C. Nag—Ex. 19-এর 13, 15, 24 নম্বর অঙ্ক দেখ। K. P. Bose —Ex. 22-এর 17, 21, 24 নম্বর অঙ্ক দেখ]

আলোচনা ঃ কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের অঙ্কে হরের x-এর সহগ 1 ছাড়া অন্য কিছু থাকে। তখন লবকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় একটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যাক।

উদাহরণ ঃ $\frac{9}{3x-4}-\frac{8}{x+7}+\frac{20}{4x+1}=0$

পদ্ধতি ঃ প্রত্যেক ভগ্নাংশের $\frac{\text{লব}}{x\text{-এর সহগ}}=$কত দেখ। দেখবে একটির মান বাকী দুটির যোগফলের সমান। কাজেই এই দুটির যোগফল হিসাবে বড়টিকে ভাঙাবে। এরপর পদ্ধতি আগের মতই। দেখ, প্রথম ভগ্নাংশটির $\frac{\text{লব}}{x\text{-এর সহগ}}=\frac{9}{3}=3$ দ্বিতীয়টির $\frac{8}{1}=8$, তৃতীয়টির $\frac{20}{4}=5$। এখন $5+3=8$। কাজেই 8 ($5+3$) হিসাবে ভাঙাবে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য কর যেটি ভাঙাবে সেটিতে কিন্তু x-এর সহগ 1।

সমাধান ঃ $\frac{9}{3x-4}-\frac{8}{x+7}+\frac{20}{4x+1}=0$

or, $\frac{9}{3x-4}-\frac{5+3}{x+7}+\frac{20}{4x+1}=0$

or, $\frac{9}{3x-4}-\frac{5}{x+7}-\frac{3}{x+7}+\frac{20}{4x+1}=0$

or, $\frac{9}{3x-4}-\frac{3}{x+7}=\frac{5}{x+7}-\frac{20}{4x+1}$

or, $\frac{9(x+7)-3(3x-4)}{(3x-4)(x+7)}=\frac{5(4x+1)-20(x+7)}{(x+7)(4x+1)}$

or, $\frac{9x+63-9x+12}{(3x-4)(x+7)}=\frac{20x+5-20x-140}{(x+7)(4x+1)}$

or, $\frac{75}{(3x-4)(x+7)}=\frac{-135}{(x+7)(4x+1)}$

or, $\frac{5}{(3x-4)(x+7)}=\frac{-9}{(x+7)(4x+1)}$

[15 কমন, লব থেকে বাদ গেল]

or, $5(x+7)(4x+1)=-9(3x-4)(x+7)$

or, $5(x+7)(4x+1)+9(3x-4)(x+7)=0$

or, $(x+7)\{5(4x+1)+9(3x-4)\}=0$

or, $(x+7)(20x+5+27x-36)=0$

or, $(x+7)(47x-31)=0$

$\therefore$ হয় $x+7=0$, নতুবা $47x-31=0$

কিন্তু $x+7=0$ হলে প্রদত্ত সমীকরণের $\frac{8}{x+7}=\frac{8}{0}$ যার মান জানা নাই।

$\therefore$ $x+7\neq 0$ [$\neq$ 'সমান নয়' চিহ্ন]

$\therefore$ $47x-31=0$

or, $47x=31$

$\therefore$ $x=\frac{31}{47}$

উত্তর ঃ $x=\frac{31}{47}$

অনুশীলনের জন্য ঃ $\frac{6}{3x+4}+\frac{12}{4x+3}=\frac{5}{x+1}$

[উঃ $x=3$]

3. **বিয়োগ প্রক্রিয়া ঃ** পদগুলো ভগ্নাংশ আকারের এবং লব ও হরে x-যুক্ত বীজগাণিতিক রাশি আছে।

উদাহরণ ঃ $\frac{2x-7}{x-4}+\frac{3x-5}{x-2}=\frac{4x-3}{x-1}+\frac{x-4}{x-5}$

পদ্ধতি ঃ উভয়পক্ষে এক একটি ভগ্নাংশ থেকে এমন এক একটি সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে যাতে দুটি কাজ সিদ্ধ হয়। 1. প্রত্যেক ভগ্নাংশের লব x বিহীন হয়, 2. উভয়পক্ষে সমান সংখ্যা বিয়োগ করা হয়। এরপর উভয়পক্ষে দুটি ভগ্নাংশ থাকলে ভগ্নাংশগুলো এমনভাবে পক্ষান্তর করবে যাতে উভয়পক্ষেই একটি ভগ্নাংশ + চিহ্নসহ এবং আর একটি ভগ্নাংশ − চিহ্নসহ থাকে। এবার উভয়পক্ষ সরল করে সমাধানের পথে এগোতে হবে।

কোন ভগ্নাংশ থেকে কত বিয়োগ করবে তা বের করার নিয়ম।

ধর একটি ভগ্নাংশ $\frac{6x-7}{2x-3}$. লব ও হরে x-যুক্ত পদ দুটি যথাক্রমে $6x$ ও $2x$. এখন $\frac{6x}{2x}=3$. অতএব এই ভগ্নাংশটি থেকে 3 বিয়োগ করতে হবে।

সমাধান ঃ $\frac{2x-7}{x-4}+\frac{3x-5}{x-2}=\frac{4x-3}{x-1}+\frac{x-4}{x-5}$

or, $\frac{2x-7}{x-4}-2+\frac{3x-5}{x-2}-3=\frac{4x-3}{x-1}-4+\frac{x-4}{x-5}-1$

[উভয়পক্ষে পৃথকভাবে 5 বিয়োগ করা হল]

or, $\frac{2x-7-2(x-4)}{x-4}+\frac{3x-5-3(x-2)}{x-2}$

$=\frac{4x-3-4(x-1)}{x-1}+\frac{x-4-(x-5)}{x-5}$

or, $\frac{2x-7-2x+8}{x-4}+\frac{3x-5-3x+6}{x-2}=\frac{4x-3-4x+4}{x-1}+\frac{x-4-x+5}{x-5}$

or, $\frac{1}{x-4}+\frac{1}{x-2}=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-5}$ [বিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল]

or, $\frac{1}{x-4}-\frac{1}{x-5}=\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x-2}$

[সুবিধামত পক্ষান্তর করা হল যাতে লবে x না থাকে]

or, $\frac{x-5-(x-4)}{(x-4)(x-5)}=\frac{x-2-(x-1)}{(x-1)(x-2)}$

or, $\frac{x-5-x+4}{(x-4)(x-5)}=\frac{x-2-x+1}{(x-1)(x-2)}$

or, $\frac{-1}{(x-4)(x-5)}=\frac{-1}{(x-1)(x-2)}$

or, $\frac{1}{(x-4)(x-5)}=\frac{1}{(x-1)(x-2)}$ [−কমন বাদ গেল]

or, $(x-1)(x-2)=(x-4)(x-5)$ [বজ্র গুণন করা হল]

or, $x^2-2x-x+2=x^2-5x-4x+20$

or, $-3x+2=-9x+20$ [উভয়পক্ষ থেকে $+x^2$ বাদ গেল]

or, $-3x+9x=20-2$ [পক্ষান্তর করা হল]

or, $6x = 18$

$\therefore \quad x = \frac{18}{6} = 3$

উত্তর ঃ $\mathbf{x = 3}$

Stepগুলোর ব্যাখ্যা আগের অঙ্ক অনুসারে হবে।

অনুশীলনের জন্য ঃ $\frac{2x-1}{x-1} + \frac{x-7}{x-8} = \frac{x-5}{x-6} + \frac{2x-5}{x-3}$

[**উত্তর ঃ** $x = 4\frac{1}{2}$]

[এছাড়া K. C. Nag—Ex 19-এর 18 – 22 পর্যন্ত অঙ্ক দেখ]

আলোচনা ঃ যদি কোন ভগ্নাংশ—চিহ্নসহ থাকে তাহলে এটির সঙ্গে কোন সাংখ্যমান যোগ করতে হবে। কারণ সেক্ষেত্রে লব x-বিহীন হবে। যোগ বা বিয়োগ যাই করা হোক না কেন বামপক্ষে **মোট** যত যোগ বা বিয়োগ করা হবে ডানপক্ষেও **মোট** তত যোগ বা বিয়োগ করতে হবে।

যেমন $\frac{2x+3}{x+1} - \frac{4x+5}{4x+4} = \frac{3x+3}{3x+1}$

এখানে $\frac{2x+3}{x+1} - 2 + 1 - \frac{4x+5}{4x+4} = \frac{3x+3}{3x+1} - 1$

এখানে বামপক্ষে $-2+1=-1$ আছে, অর্থাৎ মোট 1 বিয়োগ করা হয়েছে। আবার ডানপক্ষেও 1 বিয়োগ করা হয়েছে।

একটা কথা সব সময় মনে রাখবে যে সমীকরণের রাশিগুলো সরল করার সময় কোন একটি Step এমন আকার ধারণ করল যার সরল করার পদ্ধতি আগেই আলোচনা করা হয়েছে, তখন সেই আলোচনা অনুসারেই সরল করে সমাধান করবে।

শেষ কথা—পাঠ্য বই-এর থেকেও সমাধান করবে।

জ্যামিতি

আজ জ্যামিতিতে দুটি উপপাদ্য আমরা আলোচনা করব। **প্রথম উপপাদ্যটি,** গত সংখ্যায় প্রথমে যে উপপাদ্যটি আলোচনা করেছিলাম, তার বিপরীত। দ্বিতীয়টি, একটি ত্রিভুজ ও একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই সংক্রান্ত। মনে রেখ **লেখার জন্য** অংশটি লিখবে। **আলোচনার জন্য** অংশটি লিখবে না।

প্রথম উপপাদ্য

লেখার জন্য

সূত্র ঃ একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পাশে অবস্থিত সমান সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজগুলো একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত।

আলোচনার জন্য ঃ সূত্রটিকে ভেঙে ভেঙে অর্থ বোঝার চেষ্টা করা যাক। দেখ, সূত্রটিকে এভাবে ভাঙা যায়।

1. কতকগুলো ত্রিভুজ আছে। এক্ষেত্রে আমরা দুটি ত্রিভুজ নিয়েই আলোচনা করব।

2. ত্রিভুজ দুটি একই ভূমির ওপর অবস্থিত।

3. ত্রিভুজ দুটি ভূমির একই পাশে অবস্থিত।

4. ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান।

5. ত্রিভুজ দুটি একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত। এই পাঁচটি বিষয় অনুসারে চিত্র এঁকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

অঙ্কনের জন্য

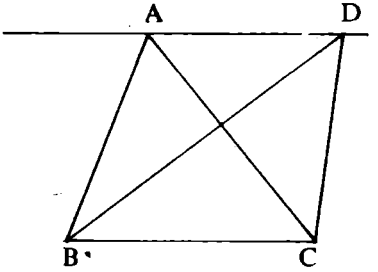

আলোচনার জন্য ঃ চিত্র থেকে ওপরের পাঁচটি বিষয় মিলিয়ে দেখা যাক।

1. ABC ও DBC দুটি ত্রিভুজ।

2. ত্রিভুজ দুটি একই ভূমি $\overline{BC}$-র ওপর অবস্থিত।

3. ত্রিভুজ দুটি $\overline{BC}$ ভূমির একই পাশে অবস্থিত।

4. ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান।

5. ত্রিভুজ দুটি $\overline{BC}$ ও $\overline{AD}$-র মধ্যে অবস্থিত। অর্থাৎ $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$.

এখন সূত্রটি আবার পড়ে নিয়ে বিষয়-গুলোকে দুভাগে ভাগ কর। একটি ভাগে থাকবে যেসব তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একটি ভাগে থাকবে যে তথ্যটি প্রমাণ করতে হবে এবার 5টি বিষয় থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে প্রথম চারটি বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চম বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে। যেসব তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলো **স্বীকার** এই হেডিং দিয়ে লিখবে। অর্থাৎ প্রথম চারটি বিষয় স্বীকারে থাকবে এবং পঞ্চম বিষয়টি যুক্তি সহকারে প্রমাণ করতে হবে।

লেখার জন্য

স্বীকার ঃ ABC ও DBC এই দুটি ত্রিভুজ একই ভূমি $\overline{BC}$-র ওপর এবং $\overline{BC}$-র একই পাশে অবস্থিত। এই দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান।

প্রমাণ করতে হবে যে ত্রিভুজ দুটি একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত। অর্থাৎ $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$.

আলোচনার জন্য ঃ অনেক সময় কোন তথ্য প্রমাণ করার জন্য কিছু অতিরিক্ত অঙ্কনের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে A ও D বিন্দু থেকে $\overleftrightarrow{BC}$-র ওপর যথাক্রমে $\overline{AP}$ ও $\overline{DQ}$ লম্বপাত করতে হবে। ফলে জ্যামিতিক চিত্রের চেহারাটা এইরকম দাঁড়ায়—

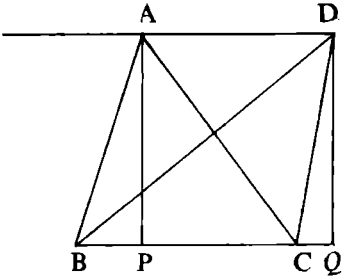

[তোমাদের খাতায় আগে যে চিত্রটি এঁকেছ তার মধ্যেই এই অতিরিক্ত অঙ্কনটুকু করবে এবং যা আঁকলে তা **অঙ্কন** এই হেডিং দিয়ে লিখবে।]

লেখার জন্য

অঙ্কন ঃ A ও D বিন্দু থেকে $\overleftrightarrow{BC}$-র ওপর যথাক্রমে $\overline{AP}$ ও $\overline{DQ}$ লম্ব-পাত করা হল।

আলোচনার জন্য

প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ঃ

1. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা।

2. একই সরলরেখার ওপর দুটি লম্ব পরস্পর সমান্তরাল হয়। দেখ, $\overline{AB}$-র ওপর $\overline{CD}$ ও $\overline{EF}$ দুটি লম্ব।

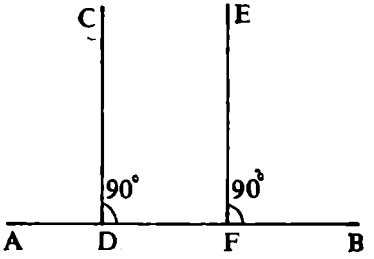

$\therefore \angle CDF = 1$ সমকোণ আবার $\angle EFB = 1$ সমকোণ।

$\therefore \angle CDF = \angle EFB$. কিন্তু এরা অনুরূপ কোণ।

$\therefore \overline{CD} \parallel \overline{EF}$.

3. চতুর্ভুজের একজোড়া বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল হলে চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক হবে। আর সামান্তরিকের যেকোন বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল।

লেখার জন্য

প্রমাণ : ABC ও DBC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমি $\overline{BC}$ বা $\overline{BC}$-র বর্ধিতাংশের ওপর যথাক্রমে $\overline{AP}$ ও $\overline{DQ}$ লম্ব। অতএব এগুলো ত্রিভুজ দুটির উচ্চতা বোঝাবে।

এখন $\triangle ABC$-র ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \overline{BC} \times \overline{AP}$.

এবং $\triangle DBC$-র ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \overline{BC} \times \overline{DQ}$.

আলোচনার জন্য : 1 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : কিন্তু স্বীকারে বলা আছে $\triangle ABC$ ও $\triangle DBC$-র ক্ষেত্রফল সমান।

$\therefore \frac{1}{2} \overline{BC} \times \overline{AP} = \frac{1}{2} \overline{BC} \times \overline{DQ}$.

$\therefore \overline{AP} = \overline{DQ}$.

আবার $\overline{AP}$ ও $\overline{DQ}$ উভয়েরই $\overline{BC}$-র ওপর লম্ব।

$\therefore \overline{AP} \parallel \overline{DQ}$.

আলোচনার জন্য : 2 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : এখন যেহেতু $\overline{AP}$ ও $\overline{DQ}$ পরস্পর সমান ও সমান্তরাল।

$\therefore$ ADQP একটি সামান্তরিক।

$\therefore \overline{AD} \parallel \overline{PQ}$

আলোচনার জন্য : 3 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : কিন্তু $\overline{PQ}$ ও $\overline{BC}$ একই সরলরেখায় অবস্থিত।

$\therefore \overline{AD} \parallel \overline{BC}$

অতএব ABC ও DBC ত্রিভুজ দুটি একই সমান্তরাল যুগল $\overline{AD}$ ও $\overline{BC}$-র মধ্যে অবস্থিত।

দ্বিতীয় উপপাদ্য

লেখার জন্য

সূত্র : একটি ত্রিভুজ ও একটি সামান্তরিক একই ভূমির ওপর এবং একই সমান্তরাল সরলরেখাদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক হবে।

আলোচনার জন্য : সূত্রটিকে ভেঙে ভেঙে প্রথমে অর্থ পরিষ্কার করে নাও। দেখ ত্রিভুজটি এভাবে ভাঙা যায়—

1. একটি ত্রিভুজ ও একটি সামান্তরিক আছে।
2. এই দুটি ক্ষেত্র একই ভূমির ওপর অবস্থিত।
3. এই দুটি ক্ষেত্র একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত।
4. ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক।

এবার এই চারটি বিষয় অনুসারে

জ্যামিতিক চিত্র এ'কে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া যাক।

অঙ্কনের জন্য

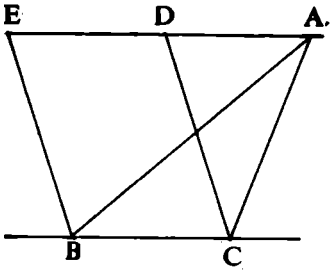

আলোচনার জন্য : চিত্র থেকে চারটি বিষয় মিলিয়ে দেখা যাক।

1. ABC একটি ত্রিভুজ এবং BCDE একটি সামান্তরিক।

2. এই দুটি ক্ষেত্র একই ভূমি $\overline{BC}$-র ওপর অবস্থিত।

3. ক্ষেত্র দুটি $\overline{BC}$ ও $\overline{AE}$ এই দুটি সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে অবস্থিত।

4. ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল BCDE সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক।

এই চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং চতুর্থ বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে। অতএব প্রথম তিনটি বিষয় স্বীকার এই হেডিং দিয়ে লিখতে হবে এবং চতুর্থ বিষয়টি যুক্তিসহকারে প্রমাণ করতে হবে।

লেখার জন্য

স্বীকার : ABC ত্রিভুজ এবং BCDE সামান্তরিক একই ভূমি $\overline{BC}$-র ওপর অবস্থিত এবং একই সমান্তরাল যুগল $\overline{BC}$ ও $\overline{AE}$-র মধ্যে অবস্থিত।

প্রমাণ করতে হবে যে ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল BCDE সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক।

আলোচনার জন্য : তথ্যটি প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত অঙ্কনের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে $\overline{BA}$-র সমান্তরাল করে C বিন্দু থেকে একটি সরলরেখা আঁকতে হবে যেটি $\overline{EA}$-র বর্ধিতাংশকে একটি বিন্দুতে ছেদ করবে। তাহলে চিত্রের চেহারাটা দাঁড়াল এইরকম—

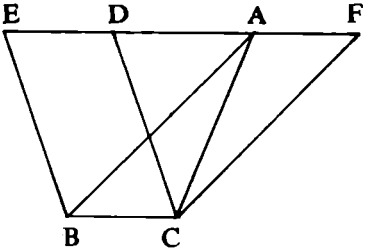

[তোমাদের খাতায় আগে যে চিত্রটি এ'কেছ তার মধ্যেই এই অতিরিক্ত অঙ্কনটুকু সংযোজন কর। যা আঁকলে তা **অঙ্কন** হেডিং দিয়ে লেখ।]

লেখার জন্য

অঙ্কন : C বিন্দু থেকে $\overline{BA}$-র সমান্তরাল $\overline{CF}$ আঁকা হল। $\overline{CF}$, $\overline{EA}$-র বর্ধিতাংশর সঙ্গে F বিন্দুতে মিলিত হল।

আলোচনার জন্য

প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য :

1. চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল হলে চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক হবে।

2. সামান্তরিকের কর্ণ সামান্তরিককে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

3. দুটি সামান্তরিক একই ভূমি ও একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে থাকলে তাদের ক্ষেত্রফল সমান হবে।

লেখার জন্য

প্রমাণ :

যেহেতু $\begin{cases} \overline{BC} \parallel \overline{AF} & (\text{স্বীকার অনুসারে}) \\ \text{এবং } \overline{AB} \parallel \overline{FC} & (\text{অঙ্কন অনুসারে}) \end{cases}$

অতএব ABCF একটি সামান্তরিক।

আলোচনার জন্য : 1 নম্বর

প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : ∵ ABCF সামান্তরিকের $\overline{AC}$ একটি কর্ণ।

∴ ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = ABCF সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক।

আলোচনার জন্য : 2 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : পুনরায়, BCDE ও ABCF সামান্তরিক দুটি একই ভূমি $\overline{BC}$ এবং একই সমান্তরাল যুগল $\overline{BC}$ ও $\overline{EF}$-এর মধ্যে অবস্থিত।

∴ সামান্তরিক ABCF = সামান্তরিক BCDE।

আলোচনার জন্য : 3 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য

∴ ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = BCDE সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক।

দীপক সেনশর্মা

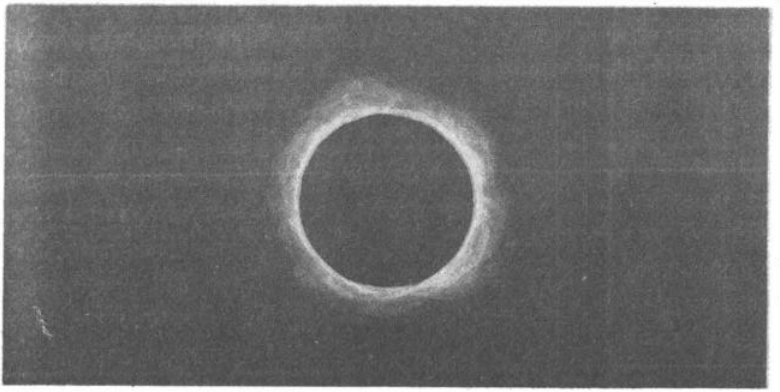

সৌরকথা

পৃথিবীর যেরকম আবহমণ্ডল আছে আর তার বিভিন্ন ভাগও আছে যেমন : স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere), ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere), আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere) ইত্যাদি, সূর্যেরও তেমনি আবহমণ্ডল কল্পনা করা হয়। সূর্যেরও তিনটি আবহমণ্ডল আছে যার নাম আলোকমণ্ডল (Photosphere), বর্ণমণ্ডল (Chronosphere) এবং ছটামণ্ডল (Corona)। তীব্র ঔজ্জ্বল্যের জন্য সূর্যের দিকে খালি চোখে কয়েক সেকেণ্ডের বেশি তাকান যায় না। তাই অত্যুজ্জ্বল অংশের নাম আলোকমণ্ডল। তাই আলোকমণ্ডলের বেধ সূর্যপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২৫০ মাইল বিস্তৃত। এই মণ্ডল থেকেই আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হয়ে সৌরজগতের যাবতীয় বস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলে। বর্ণ ও ছটামণ্ডল খালি চোখে দেখা যায় না। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় যখন আলোকমণ্ডল চাঁদের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়, তখনই কেবল বর্ণ ও ছটা দৃশ্যমান হয়। বর্ণমণ্ডল বা গ্যাসীয়মণ্ডল কয়েক হাজার মাইল বিস্তৃত। ছটামণ্ডল বা Corona-র বিস্তৃতি ঊর্ধ্বাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে ছড়ান।

ভৌতবিজ্ঞান

পদার্থ বিদ্যা

আলোকবিজ্ঞান

গত সংখ্যায় আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের পার্থক্য নিয়ে আলোচনার সময়ে আমরা প্রতিবিম্ব শব্দটি ব্যবহার করেছি। সমতল দর্পণে অর্থাৎ আয়নাতে আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব দেখি। পুকুরের স্থির জলে পার্শ্ববর্তী গাছপালার, আকাশের মেঘের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু এই প্রতিবিম্ব জিনিসটা কী ?[1]

মনে কর তোমার দক্ষিণখোলা ঘরের ঠিক মুখোমুখি, বিয়েবাড়িতে, মাইক বাজছে। মাইকের শব্দ সরাসরি তোমার কানে এসে পৌঁছচ্ছে। তুমি চোখ বুজেও বলে দিতে পার শব্দ দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। কিন্তু তোমার অনুমান সব ক্ষেত্রেই ঠিক না হতেও পারে। মনে কর, মাইক বাজছে তোমার ঘরের উত্তর দিকে, যে দিকে কোনও জানলা দরজা নেই। এক্ষেত্রে মাইকের শব্দ মোড় ঘুরে, খোলা দক্ষিণ দিয়ে, তোমার ঘরে প্রবেশ করবে। ফলে তোমার মনে হবে মাইকটা বুঝি দক্ষিণ দিকেই কোথাও বাজছে।

আলোকের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটে থাকে। কোনও আলোক প্রভব থেকে অপসৃত রশ্মিগুচ্ছ যদি কোথাও কোনও বাঁক না নিয়ে, সোজা আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় তাহলে আমরা আলোক প্রভবটাকেই দেখতে পাব এবং তাকে তার ঠিক জায়গাতেই দেখতে পাব। কিন্তু যদি কোনও কারণে ঐ রশ্মিগুচ্ছ, পথের মধ্যে এক বা একাধিকবার অভিমুখ পরিবর্তন করে, অর্থাৎ বাঁক নিয়ে, আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়, তাহলে আমরা আর আলোক প্রভবটিকে দেখব না, দেখব তার প্রতিবিম্বকে। এবং প্রতিবিম্বটি দেখব যেখানে প্রভবটি আছে, সেখানে নয়, অন্যত্র।

এখন, পথের মধ্যে আলোকরশ্মির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটতে পারে, দুটি কারণে। এক—আলোকরশ্মির প্রতিফলনের জন্য। এবং দুই—আলোকরশ্মির প্রতিসরণের ফলে।

1 নং চিত্রে দেখ, P বিন্দু প্রভব থেকে অপসৃত দুটি রাশি $\overrightarrow{PQ}$ এবং $\overrightarrow{PS}$ কী ভাবে MM′ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে বাঁক ঘুরে $\overrightarrow{QR}$ ও $\overrightarrow{ST}$ পথে দর্শকের চোখে

[1] প্রতিবিম্ব বোঝাতে আমরা অনেক সময়ে ছায়া কথাটা ব্যবহার করে থাকি। যেমন, পুকুরের জলে তালগাছটার ছায়া দেখা যাচ্ছে কিংবা আয়নাতে তার মুখের ছায়া পড়ল। ছায়া শব্দটির এরকম ব্যবহার কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত নয়। আলোকের গতি পথে কোনও প্রতিবন্ধক অর্থাৎ অস্বচ্ছ বস্তু থাকলে, আলোক তাকে ভেদ করে বিপরীত দিকে যেতে পারে না। ফলে প্রতিবন্ধকটির বিপরীত দিকে, আলোকের অভাবে, অন্ধকারের সৃষ্টি হয়। একেই বলে ছায়া। সুতরাং প্রতিবিম্ব ও ছায়া সমার্থক নয়। পথিক বিশ্রাম করে বটগাছের ছায়ায় সে কিন্তু পুকুরের জলে দেখে বটগাছটির প্রতিবিম্ব। ছায়া হল shadow, প্রতিবিম্ব হল image।]

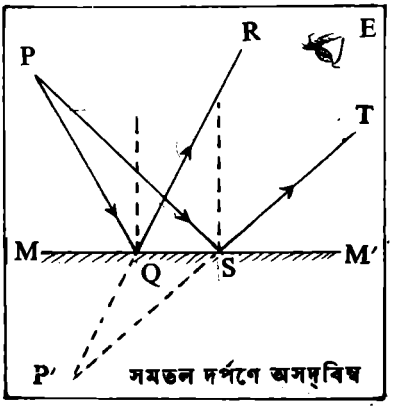

সমতল দর্পণে অসদ্‌বিম্ব

এসে পৌঁছচ্ছে। মনে কর RQ এবং TS-কে বর্ধিত করায় তারা P′ বিন্দুতে মিলিত হল। দর্শকের স্বভাবতই মনে হবে যেন P′ বিন্দু থেকেই P′R ও P′T রশ্মি দুটি অপসৃত হয়ে তার চোখে পৌঁছচ্ছে। P-এর পরিবর্তে সে P′ বিন্দুতে একটি বিন্দু প্রভব দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে P′ হবে P বিন্দু প্রভবটির প্রতিবিম্ব।

এবার 2 নং চিত্রে দেখ, P বিন্দু প্রভব থেকে অপসৃত $\overrightarrow{PL}$ এবং $\overrightarrow{PO}$ রশ্মি দুটি AB লেন্সটির মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে, কীভাবে প্রতিসরণের ফলে অভিমুখ পাল্টিয়ে, P′ বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। দর্শকের চোখে মনে হবে P′-ই বুঝি আলোকের উৎস। এক্ষেত্রেও P′ হবে P বিন্দু প্রভবটির প্রতিবিম্ব।

তাহলে আমরা প্রতিবিম্বের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিতে পারি। **যখন কোনও বিন্দু প্রভব থেকে অপসৃত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন কিংবা প্রতিসরণের ফলে অন্য কোনও একটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়** (যেমন 2 নং চিত্রে, P′ বিন্দুতে) **অথবা অন্য কোনও একটি বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়** (যেমন 1 নং চিত্রে, P′ বিন্দু থেকে) **তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুটির প্রতিবিম্ব (image) বলা হয়।**

মনে থাকে যেন আমরা যখন কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখি তখন আমরা—

1. আসল বস্তুটিকে দেখি না।
2. বস্তুটি যেখানে আছে প্রতিবিম্বটি সেখানে দেখি না।

প্রশ্ন

1. কোন অবস্থায় আমরা আসল বস্তুকেই দেখি আর কোন অবস্থাতেই বা আমরা দেখি বস্তুর প্রতিবিম্ব?
2. কোন কোন কারণে আলোকরশ্মির গতি পথের অভিমুখের পরিবর্তন ঘটে থাকে?
3. প্রতিবিম্বের সংজ্ঞা দাও।
4. ছায়া ও প্রতিবিম্বের মধ্যে প্রভেদ কী?

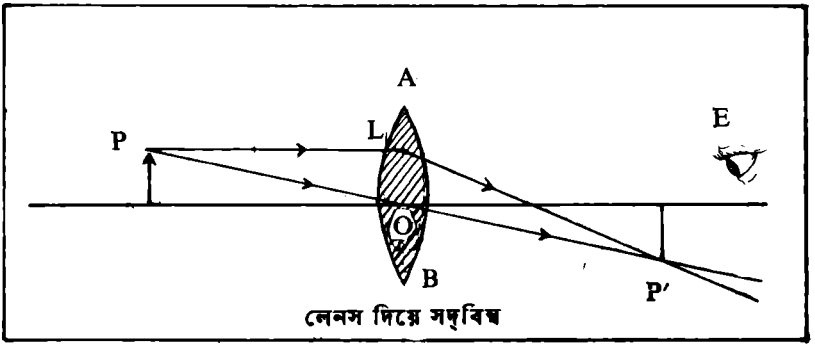

লেনস দিয়ে সদ্‌বিম্ব

ওপরে প্রতিবিম্বের যে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে সে দুটির মধ্যে কিন্তু একটি ব্যাপারে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লক্ষ্য করে দেখ 2 নং চিত্রে প্রতিসৃত $\overrightarrow{LP'}$ এবং $\overrightarrow{OP'}$ রশ্মি দুটি অভিসারী এবং তারা সত্য সত্যই P′ বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। এই ভাবে গঠিত বিম্বকে বলা হয় সদ্‌বিম্ব। পক্ষান্তরে 1 নং চিত্রে $\overrightarrow{QR}$ এবং $\overrightarrow{ST}$ প্রতিফলিত রশ্মিদুটি অপসারী। সুতরাং তারা কখনই পরস্পরের সাথে মিলিত হতে পারে না। দর্শকের কাছে মনে হচ্ছে, বুঝিবা রশ্মি-দুটি P′ থেকে অপসৃত হয়ে চোখে এসে পড়ছে। এভাবে সৃষ্ট প্রতিবিম্বকে বলা হয় অসদ্‌বিম্ব।

সংজ্ঞা হিসাবে বলতে পারি—

যদি কোনও বিন্দু প্রভব থেকে অপসৃত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন কিংবা প্রতিসরণের ফলে গতিপথের অভি-মুখের পরিবর্তনের জন্যে দ্বিতীয় কোনও একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুটির সদ্‌বিম্ব (real image) বলা হয়। আর, যদি কোনও বিন্দু প্রভব থেকে অপসৃত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন কিংবা প্রতিসরণের ফলে গতিপথের অভিমুখের পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় কোনও একটি বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুটির অসদ্‌বিম্ব (virtual image) বলা হয়।

সদ্‌বিম্ব এবং অসদ্‌বিম্ব দুরকম বিম্বই চোখে দেখা যায়। কিন্তু সদ্‌বিম্ব গঠিত হয় আলোকরশ্মির সত্যি সত্যি উপস্থিতিতে। তাই বিম্বের জায়গাটিতে একটি পর্দা রাখলে বিম্বটি পর্দায় ধরা যায়। অপরপক্ষে অসদ্‌-বিম্ব আলোকরশ্মির প্রকৃত উপস্থিতিতে সৃষ্ট হয় না। তাই অসদ্‌বিম্বের জায়গায় পর্দা রাখলে পর্দার ওপর কোনও বিম্ব ধরা পড়ে না। অর্থাৎ—

সদ্‌বিম্বকে চোখে দেখা যায় এবং পর্দাতেও ধরা যায় কিন্তু অসদ্‌বিম্বকে চোখে দেখা গেলেও পর্দাতে ধরা যায় না।

সিনেমার পর্দায় যে বিম্ব দেখ তা হল সদ্‌বিম্ব। ক্যামেরায় **film**-এর ওপর, চোখের **retina**-র ওপরও সদ্‌বিম্ব গঠিত হয়। কিন্তু আয়নাতে যে বিম্ব গঠিত হয় তা হল অসদ্‌বিম্ব। আয়নার পেছনে কোনও পর্দা রাখলে তার ওপর কোনও বিম্বই ধরা যাবে না।

প্রশ্ন

1. সদ্‌বিম্ব এবং অসদ্‌বিম্বের সংজ্ঞা দাও। দুরকম বিম্বের একটি করে দৃষ্টান্ত দাও।
2. সদ্‌বিম্বকে পর্দায় ধরা যায় কিন্তু অসদ্‌বিম্বকে পর্দায় ধরা যায় না। এর কারণ কী?

সমতল দর্পণে কীভাবে বিম্ব গঠিত হয় তা 1 নং চিত্রে দেখান হয়েছে। চিত্রটিতে P ও P′ বিন্দু দুটিকে সরলরেখা দিয়ে যুক্ত কর। PP′ রেখাংশটি MM′-কে যে বিন্দুতে ছেদ করল তার নাম দাও N। মেপে দেখ যে—

i. $\angle PNM = 90°$। অর্থাৎ PP′ ও MM′ পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে।

ii. $PN \cong P'N$.

অর্থাৎ দর্পণের সামনে কোনও বিন্দু প্রভবকে যতটা লম্ব দূরত্বে রাখা হয় তার অসদ্‌বিম্বটি দর্পণের ঠিক বিপরীতে ঐ একই লম্ব দূরত্বে গঠিত হয়। এরকমটা যে হবেই তা জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করেও দেখান যায়।

তুমি আয়নার সামনে যতটা দূরে থাকবে আয়নার পেছনে তোমার প্রতিবিম্বটি ঠিক

ততটাই দূরে গঠিত হবে। তুমি যদি আয়নার দিকে দু'ফুট এগিয়ে আস ; আয়নার পেছনে তোমার প্রতিবিম্বও আয়নার দু'ফুট কাছে চলে আসবে।

1 নং চিত্রে আমরা দেখেছি কীভাবে সমতল দর্পণে একটি বিন্দু প্রভবের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এবার দেখা যাক সমতল দর্পণে বিস্তৃত প্রভবের বিম্ব কীভাবে গঠিত হয়। বিস্তৃত প্রভবকে আমরা অসংখ্য বিন্দু প্রভবের সমাবেশ বলে ধরে নিতে পারি।

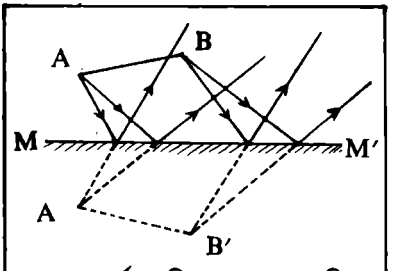

সমতল দর্পণে বিস্তৃত প্রভবের বিম্ব

3 নং চিত্রে AB একটি বিস্তৃত প্রভাব। MM′ সমতল দর্পণ। A বিন্দু প্রভবটির অসদ্‌বিম্ব গঠিত হয়েছে A′ বিন্দুতে। এবং B বিন্দু প্রভবটির অসদ্‌বিম্ব গঠিত হয়েছে B′ বিন্দুতে। সুতরাং AB বিস্তৃত প্রভবটির প্রতিবিম্ব হল A′B′।

এবার 4 নং চিত্রটি দেখ। MM′ সমতল দর্পণটি কাগজের ওপর খাড়াভাবে রাখা আছে। আয়নাটির সামনে কাগজের ওপর একটি পুতুল চিৎ করে শোয়ান আছে। H হল পুতুলটির মাথা। A(R) এবং A (L) হল যথাক্রমে পুতুলটির ডান ও বাঁ হাত। এবং F (R) ও F (L) হল ডান ও বাঁ পা। H′, A (R)′, A (L)′, F (R)′ এবং F (L)′ হল যথাক্রমে পুতুলটির মাথা, ডান ও বাঁ হাত এবং ডান ও বাঁ পায়ের প্রতিবিম্ব। E দর্শকের চোখ। একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবে দর্শকের চোখে কিন্তু A(R)′ মোটেই প্রতিবিম্বের ডান হাত বলে মনে হবে না, মনে হবে বাঁ হাত বলে। তেমনি A (L)′-কে মোটেই প্রতিবিম্বের বাঁ হাত বলে মনে হবে না, মনে হবে ডান হাত বলে। F (R)′ এবং F (L)′ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সমতল দর্পণের প্রতিবিম্বে এই যে বস্তুর ডানদিককে বাঁদিক এবং বাঁদিককে ডানদিক মনে হওয়া একে বলে পার্শ্বীয় পরিবর্তন (**Lateral displacement**)। একখণ্ড কাগজে বড় হাতের P লিখে আয়নার সামনে ধর। প্রতিবিম্ব

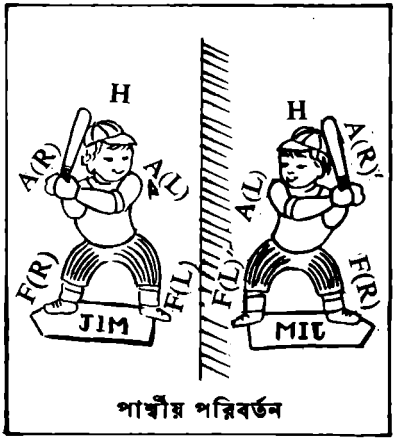

পার্শ্বীয় পরিবর্তন

দেখ q লেখা আছে। P-এর পুটলিটা ডান পাশ থেকে চলে গেছে বাঁ পাশে পার্শ্বীয় পরিবর্তনের ফলেই এটা ঘটেছে। B, K, R প্রভৃতিকে পার্শ্বীয় পরিবর্তনের ফলে প্রতিবিম্বে দেখাবে ꓭ, ꓘ, ꓤ ইত্যাদি। এইসব অক্ষরগুলো পার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম নয়। অর্থাৎ এদের ডানপাশ ও বাঁপাশ একই রকম নয়। তাই এদের ক্ষেত্রে পার্শ্বীয় পরিবর্তন সহজেই ধরা পড়ছে। কিন্তু যে সব অক্ষর পার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম অর্থাৎ যেসব অক্ষরের ডানপাশ ও বাঁপাশ একই রকম বা প্রায় একই রকম, তাদের ক্ষেত্রে পার্শ্বীয় পরিবর্তন ঘটবে ঠিকই, কিন্তু সহজে ধরা যাবে না। A, M, T, O প্রভৃতিকে প্রতিবিম্বেও A M. T. O.

ইত্যাদিই দেখাবে। বাংলা বর্ণমালার কোনও অক্ষরই পার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম নয়।

সাধারণত আমাদের দেহ পার্শ্বীয়ভাবে প্রায় প্রতিসম। কিন্তু আমাদের কারও বাঁ গালে একটা তিল আছে, কারও বা ডান কপালে কাটা দাগ। কেউ বাঁ হাতে ঘাঁড় পরে আছে, কেউ ডান হাতের আঙুলে আংটি। মেয়েদের বাঁ কাঁধে আঁচল ঝুলছে। তাই আয়নাতে আমাদের প্রতিবিম্বে পার্শ্বীয় পরিবর্তন সহজেই ধরা পড়ে।

প্রশ্ন

1. সমতল দর্পণের সামনে অবস্থিত কোনও বিন্দু প্রভবের অবস্থান এবং তার প্রতিবিম্বের অবস্থানের মধ্যে সম্পর্ক কী রকম? মনে কর তুমি তোমাদের ড্রেসিং টেবিলটার আয়নাটা থেকে 5 ফুট লম্ব দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি ও তোমার প্রতিবিম্বের মধ্যে ব্যবধান মত? তুমি আয়নার দিকে 2 ফুট এগিয়ে এলে তুমি ও তোমার বিম্বের মধ্যে ব্যবধান কতটা কমবে?
2. পার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম বলতে কী বোঝ? পার্শ্বীয় প্রতিসমতার এবং পার্শ্বীয় অপ্রতিসমতার একটি করে দৃষ্টান্ত দাও।
3. 'সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে পার্শ্বীয় পরিবর্তন ঘটে' বলতে কী বোঝায়?
4. A, O, M প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রতিবিম্বে কোনও পার্শ্বীয় পরিবর্তন নজরে পড়ে না কেন?
5. 'বন্দে মাতরম' শব্দ দুটি একখণ্ড কাগজে এমনভাবে লেখ যাতে আয়নার সামনে ধরলে লেখাটি স্বাভাবিক দেখায়। [উত্তর পাঠের শেষে আছে]
6. Block letters দিয়ে এমন দু-একটি ইংরাজী word লেখ যেগুলোকে সমতল দর্পণের সামনে ধরলে প্রতিবিম্বে কোনও পার্শ্বীয় পরিবর্তন দেখা যাবে না। [উত্তর পাঠের শেষে]

রসায়ন বিদ্যা

তড়িৎ বিশ্লেষণ

একথা তোমাদের সকলেরই জানা যে ধাতব পদার্থের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ অর্থাৎ বিদ্যুৎ অতি সহজেই চলাচল করতে পারে, কিন্তু কাঠ, প্ল্যাস্টিক, রবার প্রভৃতি অধাতব পদার্থের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চলাচল করতে পারে না। **যেসব পদার্থ তাদের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম তাদেরকে বলা হয় তড়িতের পরিবাহী (Conductor) আর যেসব পদার্থ তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম নয় তাদেরকে বলা হয় তড়িতের অপরিবাহী (non conductor or insulator)।**

তড়িতের পরিবাহী পদার্থগুলোকে তাদের তড়িৎ পরিবহণের ক্ষমতার ভিত্তিতে সুপরিবাহী (good conductor) এবং কুপরিবাহী (bad conductor) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তামা ও রূপা হল তড়িতের অতি উত্তম পরিবাহী অর্থাৎ সুপরিবাহী। মানুষের দেহ, বায়ু তড়িতের কুপরিবাহী।

পরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে তড়িতের পরিবহণ কিন্তু দুটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে

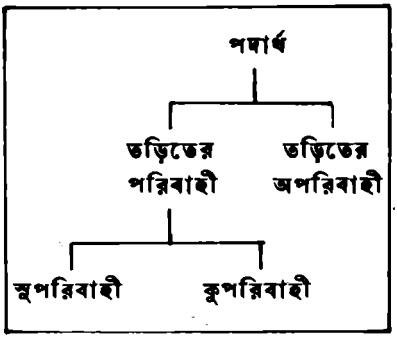

ঘটে থাকে। তদনুসারে তড়িৎ পরিবাহী পদার্থ সমূহকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

1. ধাতব পরিবাহী (metallic conductor)
2. তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ (Electrolyte)

যেসব পরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ পরিবহণের ফলে পদার্থের কোনও স্থায়ী রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না তাদেরকে বলা হয় ধাতব পরিবাহী। সমস্তরকম ধাতু এবং ধাতুশংকর এবং কয়েকটি অধাতুও যেমন গ্র্যাফাইট, গ্যাস কার্বন (কার্বনের দুটি রূপভেদ) এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

যেসব পদার্থ গলিত (অর্থাৎ তরলীভূত) অবস্থায় কিম্বা কোনও দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম কিন্তু তড়িৎ পরিবহণের ফলে যাদের মধ্যে স্থায়ী রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সেই সব পদার্থকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে।

ভোল্টামিটারে কিছুটা বিশুদ্ধ জল নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) যোগ করে, সেই অম্লায়িত জলের মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে, জলকে কীভাবে হাইড্রোজেন (H_2) এবং অক্সিজেন (O_2) গ্যাসে বিশ্লিষ্ট করা হয়, তা তোমরা অষ্টম শ্রেণীতেই পড়েছ। বিভিন্ন অ্যাসিডের ক্ষেত্রে, (যেমন HCl, H_2SO_4-এর ক্ষেত্রে) লবণের ক্ষেত্রে (যেমন NaCl, $AgNO_3$ প্রভৃতির ক্ষেত্রে) এবং ক্ষারের ক্ষেত্রে (যেমন NaOH, KOH প্রভৃতির ক্ষেত্রে) এই-রকম তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্ভব। সুতরাং এগুলো সবই তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ।

যেসব পদার্থকে গলিত অবস্থাতে কিংবা দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থাতে, কোনও অবস্থাতেই তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাদের বলা হয় তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ (non electrolyte)। সাধারণত জৈব উৎস থেকে পাওয়া পদার্থগুলো, যেমন চিনি, কেরোসিন, গ্লিসারিন প্রভৃতি তড়িৎ অবিশ্লেষ্য।

প্রশ্ন

1. তড়িতের পরিবাহী এবং তড়িতের অপরিবাহী বলতে আমরা কী বুঝি ? পরিবাহী ও অপরিবাহী প্রত্যেকটির দুটি করে দৃষ্টান্ত দাও।
2. তড়িতের সুপরিবাহী ও তড়িতের কুপরিবাহীর দুটি করে দৃষ্টান্ত দাও।
3. ধাতব পরিবাহী বলতে কী বোঝ ? একটি ধাতব পরিবাহীর নাম কর, যা ধাতু নয়।
4. তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কাকে বলে ? তিনটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের নাম কর যার একটি অ্যাসিড, একটি ক্ষার ও একটি লবণ।
5. তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ বলতে কী বোঝ ? কোন ধরনের পদার্থ সাধারণত তড়িৎ অবিশ্লেষ্য হয়ে থাকে ? দুটি তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের নাম কর।

গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-

প্রবাহ চালনা করে পদার্থটিকে বিশ্লেষিত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis) বলে।

তড়িৎ বিশ্লেষ্যের তড়িৎবিশ্লেষণ ঘটাবার জন্য যে পাত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম ভোল্টামিটার (voltameter) বা তড়িৎবিশ্লেষণ কোষ (electrolytic cell)। ভোল্টামিটার বিভিন্ন আকার প্রকারের হতে পারে। এখানে ভোল্টামিটারের একটি নকশা চিত্র দেখান হল। ভোল্টামিটার হল একটি কাচপাত্র বিশেষ, যার মধ্যে গলিত অথবা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যটি নেওয়া হয়। পাত্রটির মধ্যে উত্তম তড়িৎ পরিবাহী পদার্থের (যথা তামা, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদির) দুটি পাত এমন ভাবে যুক্ত থাকে যাতে পাত দুটি তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে আংশিক নিমজ্জিত হয়। পাত দুটির একটিকে কোষ সমবায় অর্থাৎ ব্যাটারীর , ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে এবং অন্যটিকে ব্যাটারীর ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হলে তড়িৎ বিশ্লেষ্যটির মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়।

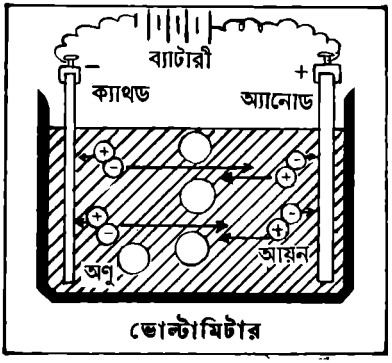

ভোল্টামিটার

ভোল্টামিটারের যে ধাতব পাত দুটি তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে অংশত নিমজ্জিত থাকে এবং যাদের ব্যাটারীর মেরুদ্বারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় তাদেরকে বলা হয় তড়িৎদ্বার (electrodes)।

যে তড়িৎদ্বারটিকে ব্যাটারীর ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয় সেই তড়িৎদ্বারটিকে বলা হয় ধনাত্মক তড়িৎদ্বার (positive electrode) বা অ্যানোড (anode)।

যে তড়িৎদ্বারটিকে ব্যাটারীর ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার (negative electrode) বা ক্যাথড (cathode / kathode)।

ব্যাটারীর ধনাত্মক মেরু থেকে তড়িৎ প্রবাহ অ্যানোডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষ্যে প্রবেশ করে, এবং তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ক্যাথড মারফৎ ব্যাটারীর ঋণাত্মক মেরুতে ফিরে যায়।

প্রশ্ন

1. ভোল্টামিটার বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ কাকে বলে ? ভোল্টামিটারের তড়িৎদ্বার বলতে কী বোঝ ? কোনটিকে ধনাত্মক তড়িৎদ্বার এবং কোনটি ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বলে ? এদের মধ্যে কোনটিকে অ্যানোড এবং কোনটিকে ক্যাথড বলে ?
2. ভোল্টামিটারের একটি চিহ্নিত নকশা চিত্র আঁক।
3. তড়িৎবিশ্লেষণ বলতে কী বোঝ ?

আচ্ছা, তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে এই যে তাদের তড়িৎবিশ্লেষণ ঘটে, এর কারণটা কী ? 1887 খ্রিস্টাব্দে সুইডিশ বিজ্ঞানী আরেনিয়াস (Arrhenius) সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে তাঁর তড়িৎ-বিয়োজনবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, কোনও তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থকে গলিত করলে কিংবা দ্রাবকে দ্রবীভূত করলে ঐ পদার্থের বেশ কিছু সংখ্যক অণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুটি

করে তড়িতাহিত অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এইরূপ বিভাজনকে আরেনিয়াস নাম দিয়েছিলেন বিয়োজন (dissociation)। বর্তমানে এইরূপ বিভাজন প্রক্রিয়াকে বিয়োজন না বলে আয়নন (ionisation) বলা হয়ে থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থটির অণুগুলো যে দুটি করে অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে তাদেরকে বলা হয় আয়ন (ion)। পদার্থ মাত্রেরই অণু সামগ্রিকভাবে নিস্তড়িৎ অর্থাৎ গোটা অণুটিতে কোনও তড়িৎ ধর্ম প্রকাশ পায় না। কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের অণু যে দুটি আয়নে (দুটির বেশি আয়নও হতে পারে) বিভক্ত হয়ে পড়ে তার একটি হয় ধন তড়িৎগ্রস্ত, অন্যটি ঋণ তড়িৎগ্রস্ত। ধন তড়িৎগ্রস্ত আয়নটিকে বলা হয় ধনাত্মক আয়ন (positive ion) এবং ঋণ তড়িৎগ্রস্ত আয়নটিকে ঋণাত্মক আয়ন (negative ion)।

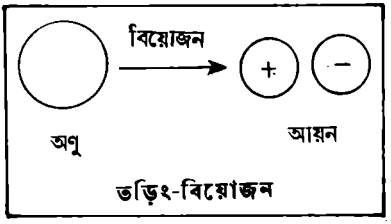

তড়িৎ-বিয়োজন

5 নং নকশা চিত্র ভোল্টামিটারের মধ্যে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের কতকগুলো অণুকে এইরূপ আয়নিত অবস্থাতে দেখান হয়েছে। চিত্রে দেখ ধনাত্মক আয়নগুলো কী ভাবে ঋণ তড়িৎগ্রস্ত ক্যাথডের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এবং ঋণাত্মক আয়নগুলো আকৃষ্ট হচ্ছে ধন তড়িৎগ্রস্ত অ্যানোডের দিকে। বুঝতেই পারছ এর ফলে ধনাত্মক আয়নগুলো ক্যাথডের দিকে এবং ঋণাত্মক আয়নগুলো অ্যানোডের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। **ধনাত্মক আয়নগুলো ক্যাথডের দিকে যায় বলে তাদেরকে বলা হয় ক্যাটায়ন** (cation বা kation)। **অনুরূপ কারণে ঋণাত্মক আয়নগুলোকে বলা হয় অ্যানায়ন** (anion)।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ খাদ্য লবণের কথা ধরা যাক। সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত হল NaCl। জলে দ্রবীভূত করলে NaCl-এর বেশ কিছু সংখ্যক অণুর বিয়োজন বা আয়নন ঘটে এবং ধনাত্মক সোডিয়াম আয়ন ও ঋনাত্মক ক্লোরিন আয়ন উৎপন্ন হয়। ঘটনাটিকে নিচের মত করে সমীকরণের আকারে দেখান হয়—

$$NaCl = Na^+ + Cl^-$$

Na হল সোডিয়াম পরমাণুর চিহ্ন। Na^+ দ্বারা বোঝান হচ্ছে ধন তড়িৎগ্রস্ত সোডিয়াম আয়ন। তেমনি Cl হল ক্লোরিন পরমাণুর চিহ্ন। Cl^- দ্বারা বোঝান হচ্ছে ঋণ তড়িৎগ্রস্ত ক্লোরিন আয়ন।

কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। NaCl-এর জলীয় দ্রবণের কিছু সংখ্যক অণু যেমন একদিকে Na^+ এবং Cl^- আয়নে বিয়োজিত হচ্ছে অন্য দিকে তেমনি কিছু সংখ্যক Na^+ ও Cl^- আয়নও পুনরায় যুক্ত হয়ে NaCl অণু গঠন করে চলেছে। অর্থাৎ সব সময়ে বিয়োজন ও সংযোজনের একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে দ্রবণটির মধ্যে। প্রক্রিয়াটির এই উভয়মুখীতা দেখাবার জন্য তাই '=' অর্থাৎ সমান চিহ্নের পরিবর্তে '$\rightleftharpoons$' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। লেখা হয়—

$$NaCl \rightleftharpoons Na^+ + Cl^-$$

নিচে তোমাদের পরিচিত কয়েকটি তড়িৎ বিশ্লেষ্যের তড়িৎ বিয়োজন বা আয়নন দেখান হল।

$$HCl \rightleftharpoons H^+ + Cl^-$$
$$NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^-$$
$$AgNO_3 \rightleftharpoons Ag^+ + NO_3^-$$
$$H_2SO_4 \rightleftharpoons H^+ + H^+ + SO_4^{-\,-}$$

লক্ষ্য কর আয়ন তড়িৎগ্রস্ত পরমাণুও

হতে পারে (যেমন H^+, Ag^+, Cl^- ইত্যাদি) আবার তড়িৎগ্রস্ত যৌগমূলকও হতে পারে (যেমন OH^-, NO_3^-, SO_4^{--} ইত্যাদি)।

প্রশ্ন

1. তড়িৎ বিশ্লেষ্যের অণুগুলো কী রূপ অবস্থাতে বিয়োজিত হয় ? বিয়োজনের ফলে কী উৎপন্ন হয় ?
2. ধনাত্মক আয়নকে ক্যাটায়ন এবং ঋণাত্মক আয়নকে অ্যানায়ন বলার কারণ কী ?
3. 'তড়িৎ বিয়োজন বা আয়নন একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া' বলার অর্থ কী ?

আজকের পাঠ শেষ করায় আগে আমি তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিতে চাই।

● নবম দশমের সপ্তম সংখ্যায় (তারিখ 1.4.82) আমরা নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রটি নিয়ে আলোচনা করেছি। বিষয়টি সম্পর্কে তোমাদের অনেকের মনে একটা খটকা জেগেছে বুঝতে পারলাম। বেশ কয়েকজনই অনেকটা এই ধরনের প্রশ্ন করেছ—'আচ্ছা, নিউটনের তৃতীয় সূত্রে ত বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত হয়। তাহলে, ঘোড়া যে বলের দ্বারা গাড়িকে টানছে গাড়িও ত ঠিক তারই সমান কিন্তু বিপরীতমুখী বলের দ্বারা ঘোড়াকে টানছে। সেক্ষেত্রে ঘোড়া গাড়িটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কী করে ?'

সংশয়টা খুবই স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কি, আমরাও যখন নিউটনের এই তৃতীয় সূত্রটা পড়ি তখন আমাদের মনেও এই একই সংশয় জেগেছিল।

এক্ষেত্রে গোলমালটা বাঁধছে কোথায় জান ? আমরা কেবলমাত্র ঘোড়া এবং গাড়িটাকে নিয়েই হিসাব মেলাতে চেষ্টা করছি। ঘোড়া এবং গাড়ি ছাড়াও এখানে কিন্তু আরও একটা জিনিসের কথা চিন্তা করতে হবে। এবং সেই জিনিসটি হচ্ছে ভূমি।

আরও একটা কথা। ঘোড়া যেহেতু এখানে গাড়ির সঙ্গে জোতা, ঘোড়া এবং গাড়িটিকে আলাদা দুটি বস্তু মনে করলে চলবে না। এখানে ঘোড়া ও গাড়ি মিলে একটি অবিভাজ্য সংগঠন (system)।

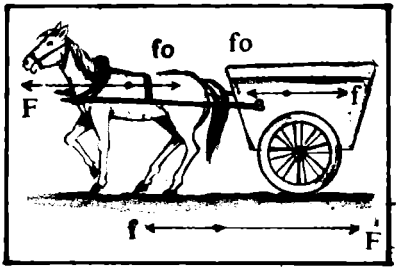

এবারে 7 নং চিত্রটি দেখ। সমান কিন্তু বিপরীত বলের তিনটি জুটি (pair) দেখতে পাবে চিত্রটিতে।

প্রথম জুটি। ঘোড়া fo বল দ্বারা গাড়িকে সামনের দিকে টানছে (ক্রিয়া)। গাড়িও বিপরীতমুখী fo বল দ্বারা ঘোড়াকে পেছনে টানছে (প্রতিক্রিয়া)।

দ্বিতীয় জুটি। ঘোড়া ভূমিকে F বল দ্বারা পেছনে ঠেলছে (ক্রিয়া), ভূমিও ঘোড়াকে বিপরীতমুখী F বল দ্বারা সামনের দিকে ঠেলছে (প্রতিক্রিয়া)।

তৃতীয় জুটি। গাড়ি ভূমিকে f বল দ্বারা পেছন দিকে ঠেলছে (ক্রিয়া)। ভূমিও গাড়িকে বিপরীতমুখী f বল দ্বারা সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিক্রিয়া)।

এখন, ঘোড়া ও গাড়ির যুক্ত সংগঠনটির ওপর ক্রিয়ারত বলগুলোর হিসাব নেওয়া যাক। সমান কিন্তু বিপরীতমুখী fo বল দুটির মধ্যে কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সংগঠনটির ওপর ক্রিয়া করছে (F—f) বল। এই বলই সংগঠনটিতে ত্বরণ সৃষ্টি করছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি ভূমির ওপরও বিপরীতমুখী (F-f) বল ক্রিয়া করছে, যার দরুণ ভূমিতেও একটি বিপরীতমুখী ত্বরণ সৃষ্ট হচ্ছে, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন।

আচ্ছা, ভূমিটা যদি খুবই মসৃণ অর্থাৎ পিছল হয়, তা হলে কী হবে? ঘোড়া ভূমির ওপর কোনও ক্রিয়া (F) প্রয়োগ করতে পারবে না। ফলে ঘোড়ার ওপরও ভূমির কোনও প্রতিক্রিয়া (F) থাকবে না। গাড়ি ও ভূমির মধ্যেও ক্রিয়া (f) এবং প্রতিক্রিয়া (f)-এর অস্তিত্ব থাকবে না। অবশিষ্ট থাকবে শুধু ঘোড়া ও গাড়ির মধ্যে ক্রিয়া (fo) এবং প্রতিক্রিয়া (fo)। কিন্তু যেহেতু ক্রিয়া fo এবং প্রতিক্রিয়া fo একই সংগঠনের ওপর কাজ করছে, তাদের নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভূমি যদি সম্পূর্ণ মসৃণ হয় তাহলে ঘোড়া কোনও মতেই গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। ভাগ্যিস ভূমি কখনই সম্পূর্ণ মসৃণ হওয়া সম্ভব নয়!

● শান্তিগড়, শ্যামনগর থেকে অনিন্দ্য ঘোষ কয়েকটি প্রশ্ন করে পাঠিয়েছে।

দেখ অনিন্দ্য, তোমার প্রশ্নগুলো ভাই ঠিক স্পষ্ট নয়। তোমার প্রথম প্রশ্ন 'বল-প্রয়োগ ছাড়া গতি সম্ভব কি?' 16.3.82-এর নবম দশম, ষষ্ঠ সংখ্যার 87 পৃষ্ঠা থেকে 90 পৃষ্ঠা পর্যন্ত আবার ভাল করে পড়ে দেখ। দেখবে, বল হচ্ছে তাই, যা বাইরে থেকে বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয়ে বস্তুটির স্থিতি বা গতির পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাবার চেষ্টা করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে বলপ্রয়োগ ছাড়া গতির **পরিবর্তন** সম্ভব নয়।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন 'বলপ্রয়োগ ছাড়া কোনও বস্তুর গতীয় শক্তির পরিবর্তন করা যায় কি?'

কোনও বস্তুর ভর যদি হয় m একক এবং তার বেগ হয় v একক, তাহলে তার গতীয় শক্তির পরিমাণ হয় $\frac{1}{2}mv^2$ একক। (16.4.82 তারিখের নবম দশম, অষ্টম সংখ্যা, পৃষ্ঠা 72 দ্রষ্টব্য)। বস্তুর গতীয় শক্তির পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই তার বেগ v-এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং বেগের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে অবশ্যই বলপ্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং বলপ্রয়োগ ছাড়া কোনও বস্তুর গতীয় শক্তির পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়।

তোমার তৃতীয় প্রশ্ন 'যান্ত্রিক সুবিধা বিশিষ্ট নততলের সাহায্যে 15 পাউণ্ড ভার বলপ্রয়োগ করে কত ভার তোলা সম্ভব?' প্রশ্ন পড়ে মনে হচ্ছে অনিন্দ্য, নততলের ব্যাপারটা তুমি একেবারেই বুঝতে পারনি। নততলের আলোচনাটা তুমি আবার ভাল করে বুঝে বুঝে পড়। (1.5.82-এর নবম দশম, নবম সংখ্যা পৃষ্ঠা 78-79 দ্রষ্টব্য)

আপাতত তুমি 79 পৃষ্ঠা খুলে নততলের নকশাটি দেখ। ওখানে প্রমাণ করে দেখান হয়েছে—

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \left(\frac{W}{P}\right) = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$$

স্পষ্টতই $\overline{BC}$-এর তুলনায় $\overline{AB}$ যত বড় হবে P-এর তুলনায় W-ও ততই বড় হবে। যদি $\overline{AB} = 2\overline{BC}$ হয় তাহলে $W = 2P$ হবে অর্থাৎ P বল প্রয়োগ করে 2P বোঝা তোলা যাবে। P যদি হয় 15 পাউণ্ড ভার, তাহলে ঐ বলপ্রয়োগ করে তোলা যাবে (15×2) পাউণ্ড ভার বোঝা বা 30 পাউণ্ড ভার বোঝা। আবার যদি $\overline{AB} = 3\overline{BC}$ হয় তাহলে 15 পাউণ্ড ভার বলপ্রয়োগ করে (15×3) পাউণ্ড ভার অর্থাৎ 45 পাউণ্ড ভার বোঝা তোলা যাবে। সুতরাং 15 পাউণ্ড ভার বলপ্রয়োগ করে কী পরিমাণ ভার তোলা যাবে তা নির্ভর

করবে $\overline{AB}/\overline{BC}$-এর অনুপাতের ওপর।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল। এবার বর্তমান পাঠের পার্শ্বীয় পরিবর্তন-সংক্রান্ত প্রশ্ন 5 এবং প্রশ্ন 6-এর উত্তর জানিয়ে শেষ করব।

৫ নং প্রশ্ন : [illegible]

৬ নং প্রশ্ন :

i. TOT (সবে হাঁটছে এমন শিশু)

ii. AHA (আনন্দসূচক interjec-
OHO tions)

iii. MOM (মা)

iv. TUT (মৃদু ধমকানি)

অমৃতসূ দাস

সৌরকথা

গত ১৯৮০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আমরা কলকাতায় সূর্যের প্রায় পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখেছি। সম্পূর্ণ গ্রাস হয়েছিল, কেনিয়া, তানজানিয়া প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার দেশ-গুলোতে, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরে একটি সরলরেখা বরাবর এবং ভারতের ধারওয়ার, কোরাপুট, রায়চূড়, খাম্মাম, পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি জায়গায়।

এরপরের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়েছিল ১৯৮১-তে ৩১ জুলাই সাইবেরিয়াতে, আবার হবে ১১ জুন ১৯৮৩ ইন্দোনেশিয়ায়।

★

সূর্যের ব্যাস ৮৬৪০০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। ১৩ লক্ষ পৃথিবীর একত্র সমাবেশ ঘটলে যে জায়গা জোড়ে সূর্য তার সমানায়তন। কিন্তু পৃথিবীর দেহের গড় ঘনত্ব ৫·৫ আর সূর্যদেহের গড়-ঘনত্ব ১·৪। অর্থাৎ সূর্যদেহের গড়-ঘনত্ব পৃথিবীর গড়-ঘনত্বের চার-ভাগের এক ভাগ। এজন্য আয়তনে তের লক্ষ গুণ হলেও সূর্য ওজনে পৃথিবীর তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার (৩,৩০,০০০) গুণ মাত্র।

★

সূর্যের গায়ে এক ধরনের কাল কাল দাগ দেখা যায়। এগুলোর নাম সৌরকলঙ্ক বা Sun spots। এরা সব ছোট বড় নানা আকারের গহ্বর। এই গহ্বরের কতগুলো মাত্র কয়েক শত বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে। কিন্তু কতকগুলো এত বড়, যে তার মধ্যে গুটি কয়েক পৃথিবী তলিয়ে যেতে পারে। সূর্যের মধ্যে যে সব সময় গ্যাসীয় ঝঞ্ঝা চলছে তারই ফলে এই সব সৌরকলঙ্কের জন্ম। সৌরকলঙ্কের মধ্যে তাপমাত্রা কিছু কম, প্রায় ৪৭৫০°C। কোন কোন সৌরকলঙ্ক তিন-চার দিন দেখা যায়। কোন কোনটা মাস-খানেক আবার কোনটা তিন-চার মাস। সূর্যকলঙ্কগুলো এক জায়গায় স্থির না থেকে, সরে সরে যায়। এর কারণ সূর্যের অক্ষীয় আবর্তন। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার, সূর্যপৃষ্ঠে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সব সময় এক থাকে না। এগার বছর অন্তর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির পর পাঁচ-ছয় বছর যাবৎ সংখ্যাটি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে, পরের পাঁচ-ছয় বছর আবার বাড়তে থাকে। বৃদ্ধির সময় সৌরশিখার হ্রাসবৃদ্ধি পৃথিবীর আবহাওয়াকে ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

জীবন-বিজ্ঞান

Revision আপাতত শেষ। আবার নতুন পড়া শুরু করি। 'সংবহন ও রক্ত' সম্পর্কে আলোচনা কিছুটা এগিয়ে মাঝপথে থেমে ছিল। এবার বাকিটা নিয়ে এগোন যাক। আগে থেকেই বলে রাখতে পারি, আজকের পড়াটা যেমন সহজ, তেমনি মজার। প্রথমে পড়ব রক্তের শ্রেণীবিভাগ, তারপর রক্তসংবহনতন্ত্র সম্পর্কে দরকারি কিছু কথা।

পড়া শুরুর আগে একটু মনে করিয়ে দিই, এই অধ্যায়ে 'উদ্ভিদদেহের সংবহন পদ্ধতি' শেষ করে আমরা এখন পড়ছি **'প্রাণীদেহের সংবহনতন্ত্র'**। এটাকে আমরা তিনভাগে ভেঙে নিয়েছিলাম—

ক. সংবহনের মাধ্যম—রক্ত ও লসিকা।

খ. বিভিন্ন প্রাণীদেহে সংবহনের বৈচিত্র্য।

গ. একটি আদর্শ সংবহনতন্ত্রের (মানুষের) বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ।

তারপর **'রক্ত ও লসিকা'**-কে ছ'টা পয়েন্টে ভাগ করেছিলাম—

১. রক্ত একটি তরল যোগ কলা।
২. রক্তের উপাদানসমূহ।
৩. রক্তের মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন শ্বাসকণা।
৪. রক্তের বিভিন্ন কাজ।
৫. রক্তের শ্রেণীবিভাগ।
৬. লসিকা ও তার গুরুত্ব।

'রক্তের বিভিন্ন কাজ' পর্যন্ত আমাদের পড়া হয়েছে। আজ **'রক্তের শ্রেণী-বিভাগ'** দিয়ে পড়া শুরু করব।

৫. রক্তের শ্রেণীবিভাগ

প্রথমে একটু গল্প ঃ রক্তের উপাদান-সমূহ সম্বন্ধে আমরা যেটুকু পড়েছি, তা থেকে ত দেখাই গেল যে সব মানুষের রক্তই প্লাজমা আর বিভিন্ন রকম রক্তকণিকা দিয়ে তৈরি। তাহলে আবার রক্তের শ্রেণী-বিভাগের প্রশ্ন উঠছে কেন? এর কারণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একথা নিশ্চয়ই জান যে কয়েকটি গুরুতর অসুখের ক্ষেত্রে (যেমন, লিউকিমিয়াতে) বা কোনও কারণে দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হলে (যেমন, কোনও দুর্ঘটনার ফলে) রোগীকে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, দেখা যায়, একজন রোগী যেকোন মানুষের রক্ত গ্রহণ করতে পারে না। হয়ত দেখা গেল যে তার কাকীমার রক্ত সে গ্রহণ করতে পারছে, কিন্তু নিজের ভাইয়ের রক্ত তার শরীরে প্রবেশ করাতে শুরু করা মাত্রই সে প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে শুরু করছে, তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, অবশেষে তার অবস্থা হচ্ছে প্রায় মরমর। আর কিছুটা ঐ রক্ত দিলে সে বেঘোরে প্রাণটিই হারাত। বুঝতেই পারছ, বৈজ্ঞানিকেরা এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দেন। অবশেষে লাণ্ডস্টাইনার (Landsteiner) নামে একজন বৈজ্ঞানিক এর কারণটি খুঁজে বার করতে সক্ষম হন।

তিনিই প্রমাণ করেন যে অন্য সবদিক থেকে একরকম হলেও, মানুষের রক্তকে চারটে শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; আর, এই শ্রেণীগুলোর যেকোন একটির সঙ্গে যেকোন অপরটির সবসময় বনিবনা হয় না। এতবড় একটি আবিষ্কারের জন্য লাণ্ড-স্টাইনার যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, সে ত বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা এখন

বুঝতে চেষ্টা করি, 'বনিবনা হয় না' কথাটার মানে কী। নিচের ছবিটা দেখ।

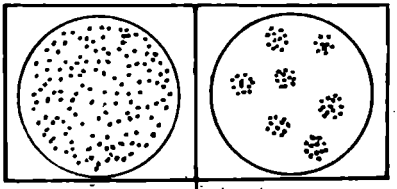

রামবাবুর রক্ত ('A' শ্রেণী) + শ্যামবাবুর রক্ত ('A' শ্রেণী) = জমাট বাঁধেনি	রামবাবুর রক্ত ('A' শ্রেণী) + যদুবাবুর রক্ত ('B' শ্রেণী) = জমাট বেঁধে গেছে

রামবাবু আর শ্যামবাবুর বহুদিন মুখ দেখাদেখি বন্ধ। যদুবাবুর সঙ্গে কিন্তু রামবাবুর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। এবার তিনজনেরই শরীর থেকে আমরা একটু করে রক্ত নিয়ে তিনটে টেস্টটিউবে রাখলাম। প্রত্যেকটি টিউবেই একটি তরল পদার্থ দেওয়া ছিল, যার ফলে রক্ত নিজে নিজে তঞ্চিত হয়ে যাবে না। (খেয়াল আছে ত, দেহ থেকে বার করে এমনি কোথাও রেখে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই রক্ত জমাট বেঁধে যায়!) এবার একটা কাঁচের স্লাইডে দুপাশে রামবাবু দু ফোঁটা রক্ত রাখা হল। এবার বাঁ-পাশের ফোঁটাতে শ্যামবাবুর আর ডানপাশের ফোঁটাতে যদুবাবুর একফোঁটা করে রক্ত মেশান হল। কিছুক্ষণ পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ফেলে দেখা গেল, বাঁপাশের মিশ্রণটিতে রক্তকণিকাগুলো নিজেরা যে যেমন ভাবে থাকার, তেমনই রয়েছে; কিন্তু ডানদিকের মিশ্রণে সব রক্তকণিকাগুলো একসঙ্গে দলা পাকিয়ে এখানে ওখানে পড়ে আছে। (অনেকটা ছানা কেটে যাওয়ার মত।) অর্থাৎ, যদুবাবুর সঙ্গে রামবাবুর যতই বন্ধুত্ব থাক, তাদের একজনের রক্ত অন্যের রক্তের সংস্পর্শে এলে দলা পাকিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু শ্যামবাবুর সঙ্গে যতই ঝগড়াঝাঁটি থাকুক, একান্ত বিপদে পড়ে রক্তের দরকার হলে রামবাবুকে রক্তদান করে বাঁচাতে পারেন শ্যামবাবুই, যদুবাবু নয়। (কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ; যে দুজনের রক্ত পরস্পরের সঙ্গে খাপ খায় না, তাদের একজনের রক্ত আরেকজনের দেহে যথেষ্ট পরিমাণে ঢুকিয়ে দিলে দ্বিতীয়জনের দেহের ভিতরে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে। স্লাইডের ছবিতে যেমনটা দেখলে, তেমনি। ফলে, দ্বিতীয়-জনের মৃত্যুও ঘটতে পারে।) তাহলে দেখলে ত, রক্তের শ্রেণীবিভাগ কিন্তু মানুষের শ্রেণীবিভাগের ধার ধারে না!

এবার মন দিয়ে পড়ঃ এখন আমরা দেখব, রক্তের ব্যবহারের এই-রকম ফের কেন ঘটে। মানুষের রক্তে বিশেষ দু ধরনের প্রোটিনজাতীয় পদার্থ দেখা যেতে পারে। এদের একসঙ্গে বলে অ্যাগ্লুটিনোজেন (Agglutinogen)। এই দুই ধরনের অ্যাগ্লুটিনোজেনের নাম অ্যাগ্লুটিনোজেন 'A' এবং অ্যাগ্লুটিনোজেন 'B'। এইটুকু জেনে রাখ, এই অ্যাগ্লু-টিনোজেনগুলো এক ধরনের অ্যান্টিজেন (Antigen)। অ্যান্টিজেন সম্বন্ধে তোমরা আরেকটু বড় হয়ে পড়বে। অ্যাগ্লুটিনোজেনগুলোকে সংক্ষেপে অ্যান্টি-জেন 'A' এবং অ্যান্টিজেন 'B'ও বলা হয়। একটু আগে বলেছি, এই দু ধরনের প্রোটিন জাতীয় পদার্থ (অ্যান্টিজেন 'A' ও 'B') মানুষের রক্তে 'দেখা যেতে পারে', এই কথাটির অর্থ হল, এক শ্রেণীর রক্তে অ্যান্টিজেন 'A', আরেক শ্রেণীর রক্তে অ্যান্টিজেন 'B', এবং অপর এক শ্রেণীর রক্তে অ্যান্টিজেন 'A' ও 'B' উভয়েই থাকে। চতুর্থ একটি শ্রেণী আছে, যাদের মধ্যে অ্যান্টিজেন 'A' অথবা 'B' কোন-টিই থাকে না। এবার প্রথম শ্রেণীর রক্তটিকে বলা হয় 'A' শ্রেণী (Group 'A') কারণ এটিতে অ্যান্টিজেন 'A'

আছে। তেমনই একইভাবে অপর তিনটি শ্রেণীকে বলে যথাক্রমে 'B' শ্রেণী, 'AB' শ্রেণী এবং 'O' শ্রেণী। 'O' শ্রেণীতে 'O' বলতে বোঝায় শূন্য বা Zero ; কারণ এর মধ্যে 'A' বা 'B' কোনও অ্যান্টিজেনই নেই। কিন্তু উচ্চারণ করা হয় 'ও' শ্রেণী বা 'গ্রুপ-ও' বলে।

তাহলে আমরা পেলাম চারটি শ্রেণীর রক্ত 'A' শ্রেণী, 'B' শ্রেণী, 'AB' শ্রেণী এবং 'O' শ্রেণী। এই শ্রেণীবিভাগকে সঙ্গত কারণেই 'ABO' শ্রেণীবিভাগ বলে।

এবার একটু শক্ত দুয়েকটা কথা। একটু মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা কর। রক্তে 'A' এবং 'B' এই যে দু ধরনের অ্যান্টিজেন দেখলে এছাড়া আরও দু ধরনের প্রোটিন রক্তে থাকতে পারে। তাদের বলে অ্যাগ্লুটিনিন (Agglutinin)। এই অ্যাগ্লুটিনিন এক ধরনের অ্যান্টিবডি (Antibody)। অ্যান্টিজেনের মত অ্যান্টিবডি সম্বন্ধেও তুমি পরে জানতে পারবে। এই অ্যাগ্লুটিনিন দুটির নাম অ্যাগ্লুটিনিন 'a' এবং অ্যাগ্লুটিনিন 'b'। (নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ 'এ' এবং 'বি' অ্যাগ্লুটিনোজেনের ক্ষেত্রে বড় হাতের অক্ষরে, আর অ্যাগ্লুটিনিনের বেলায় ছোট হাতের অক্ষরে লেখা হয়।)

এবার জানতে হবে, কোন অ্যাগ্লুটিনিন কোন শ্রেণীর রক্তে থাকতে পারে। এর একটা সহজ ফর্মুলা আছে। প্রথমেই বলে নিই, কোনও অ্যাগ্লুটিনিন বা অ্যান্টিবডি হল সেই নামের অ্যাগ্লুটিনোজেন বা অ্যান্টিজেনের শত্রু। অর্থাৎ অ্যান্টিজেন 'A' আর অ্যান্টিবডি 'a' কখনও একসঙ্গে থাকতে পারে না ; থাকলেই রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এবার মনে রাখবে, দু-রকম অ্যান্টিবডিরই যেন ইচ্ছে যে তারা সব শ্রেণীর রক্তেই থাকুক। কিন্তু তা ত সম্ভব নয়। কারণ 'A' শ্রেণীর রক্তে ত 'a' অ্যান্টিবডি থাকতে পারে না। তাই সেখানে থাকে শুধু অ্যান্টিবডি 'b'। তেমনি 'B' শ্রেণীর রক্তে শুধু অ্যান্টিবডি 'a' থাকে। 'AB' শ্রেণীতে দু-রকম অ্যান্টিজেনই আছে ; তাই দু-রকম অ্যান্টিবডির থাকার পথই বন্ধ। অতএব এদের কেউই থাকে না। আর এর উল্টোটা হয় 'O' শ্রেণীর রক্তের ক্ষেত্রে। সেখানে দু-রকম অ্যান্টিবডির কারোরই থাকার বাধা নেই। 'a' এবং 'b' দু-রকম অ্যান্টিবডিই থাকে। সেই সঙ্গে খেয়াল রেখ, এই অ্যাগ্লুটিনোজেন বা অ্যান্টিজেনগুলো থাকে লোহিত রক্তকণিকার গায়ে, আর অ্যাগ্লুটিনিন বা অ্যান্টিবডিগুলো থাকে রক্তরসে। এবার,

রক্তের শ্রেণীর নাম	লোহিত রক্তকণিকার গায়ে অবস্থিত অ্যান্টিজেন	রক্তরসের মধ্যে অবস্থিত অ্যান্টিবডি	মোটামুটি শতকরা কত ব্যক্তির থাকে
শ্রেণী, 'A'	অ্যাগ্লুটিনোজেন 'A'	অ্যাগ্লুটিনিন 'b'	45
শ্রেণী 'B'	অ্যাগ্লুটিনোজেন 'B'	অ্যাগ্লুটিনিন 'a'	41
শ্রেণী 'AB'	অ্যাগ্লুটিনোজেন 'A' এবং 'B'	×	10
শ্রেণী 'O'	×	অ্যাগ্লুটিনিন 'a' এবং 'b'	4

বিভিন্ন শ্রেণীর রক্তে কোন কোন অ্যাগ্লুটিনোজেন বা অ্যাগ্লুটিনিন থাকে, তা নিচের টেবিল দেখে মিলিয়ে নাও :

কোন শ্রেণীর রক্ত শতকরা কতজন লোকের মধ্যে পাওয়া যায়, এটা বলে দিলাম, যাতে তোমার এ ব্যাপারে একটা ধারণা হয়। এটা পরীক্ষায় আসবে না। কিন্তু ঐটুকু বাদ দিয়ে টেবিলের বাকি অংশটুকু পরীক্ষায় যে কোন সময়েই প্রয়োজন হতে পারে।

রক্তের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আমাদের জানার যেটুকু বাকি আছে, তা হল, কোন শ্রেণীর রক্ত কোন শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষতিকর বিক্রিয়া (দলা পাকিয়ে যাওয়া) ছাড়াই মিশ্রিত হতে পারে। তুমি নিজেই একটু ভেবে এটা বার করতে পার। প্রথমে ধরা যাক 'A' শ্রেণীর রক্তের কথা। ওপরের টেবিলে দেখ 'a' অ্যান্টিবডি আছে 'B' এবং 'O' শ্রেণীর রক্তে। সুতরাং 'A' শ্রেণীর রক্ত, 'B' বা 'O' শ্রেণীর রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হলে জমাট বেঁধে যাবে। সুতরাং 'A' শ্রেণীর রক্ত দেওয়া যাবে শুধু 'AB' শ্রেণী এবং 'A' শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট রুগীকেই। এখানে বলে রাখি, যার দেহ থেকে রক্ত দেওয়া হয়, তাকে বলে **দাতা** আর যার দেহে সেই রক্ত প্রবিষ্ট করান হয়, তাকে বলে **গ্রহীতা**। এবার হিসেব করলে দেখতে পাবে, 'O' শ্রেণীর দাতার রক্ত দেওয়া যাবে সকল শ্রেণীর গ্রহীতাকেই, কারণ, গণ্ডগোল ঘটানর মত কোনও অ্যান্টিজেনই ('A' অথবা 'B') 'O' শ্রেণীতে নেই। এই জন্য 'O' শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট মানুষকে বলে 'সার্বিক দাতা' বা 'সার্বজনীন দাতা' বা 'জাগতিক দাতা'। ইংরাজীতে 'universal donor'। তেমনই, 'AB' শ্রেণীর গ্রহীতা সব শ্রেণীর দাতার রক্তই গ্রহণ করতে পারে ; কারণ, দাতার রক্তে যে অ্যান্টিজেনই থাকুক না কেন, সেই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটানর মত কোনও অ্যান্টিবডি ('a' অথবা 'b') সেই গ্রহীতার রক্তে নেই। তাই, 'AB' শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট মানুষকে বলে 'সার্বিক গ্রহীতা' বা 'সার্বজনীন গ্রহীতা' বা 'জাগতিক গ্রহীতা' (universal recipient)। তুমি পরীক্ষাতে অবশ্য এতগুলো পরিভাষা লিখবে না। প্রশ্ন দেখে বুঝতে যাতে অসুবিধা না হয়, তাই একবার বলে দিলাম। পরীক্ষাতে 'সার্বিক রক্তদাতা' (universal blood donor) এবং 'সার্বিক রক্তগ্রহীতা' (universal blood recipient) এই দুটো পরিভাষা লিখবে।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখ, কার্যক্ষেত্রে রক্তের এই শ্রেণীবিভাগকে কিভাবে কাজে লাগান হয়ে থাকে। কোনও রুগীর হঠাৎ রক্তের প্রয়োজন হয়ে পড়লে তার প্রয়োজনীয় শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট দাতা তক্ষুনি পাওয়া মুস্কিল। তাই বিভিন্ন দাতার থেকে রক্ত গ্রহণ করে তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ত ব্যাঙ্কে (Blood bank) সঞ্চিত করে রাখা হয়। এই সঙ্গে কোনটি কোন শ্রেণীর রক্ত, তাও নির্ণয় করে লিখে রাখা থাকে। এবার রোগীর রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করে উপযুক্ত শ্রেণীর রক্ত রোগীর জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বুঝতেই পারছ, বর্তমান যুগের চিকিৎসা পদ্ধতিতে রক্তের শ্রেণীবিভাগ এবং রক্ত ব্যাঙ্কের গুরুত্ব কী অপরিসীম।

বিভিন্ন শ্রেণীর রক্তের দাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যে কী সম্পর্ক, এবং ক্ষতিকর বিক্রিয়া না ঘটিয়ে কোথায় কোথায় রক্তের আদানপ্রদান সম্ভব, তা পরের টেবিলটা থেকে বুঝতে পারবে। একটু ধৈর্য ধরে মিলিয়ে দেখে নাও। দেখবে, 'রক্তের শ্রেণীবিভাগ' থেকে তোমাকে আর কেউ ঠকাতে পারবে না। পরীক্ষার ব্যাপারে

সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়গুলোর একটা হল এই 'Blood group'। তাই এটা বোঝার মধ্যে যেন কোনও ফাঁক না থাকে।

← গ্রহীতা →			দাতা ↕ রক্তের শ্রেণী →	O	A	B	AB
			রক্তরসে অ্যান্টিজেন →	নেই	A	B	AB
রক্তের শ্রেণী	O	রক্তরসে অ্যান্টিবডি	a,b	−	+	+	+
রক্তের শ্রেণী	A	রক্তরসে অ্যান্টিবডি	b	−	−	+	+
রক্তের শ্রেণী	B	রক্তরসে অ্যান্টিবডি	a	−	+	−	+
রক্তের শ্রেণী	AB	রক্তরসে অ্যান্টিবডি	নেই	−	−	−	−

+ = ক্ষতিকর বিক্রিয়া হয়ে রক্ত দলা পাকিয়ে যাবে। − = ক্ষতিকর বিক্রিয়া হবে না।

এই টেবিলটা ভালভাবে দেখে নিলেই রক্তের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দরকারি সব কথা তোমার জানা হয়ে যাবে।

আর কয়েকটা কথা বলেই রক্তের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করব। আজকের পড়ার মধ্যে 'অ্যান্টিজেন' আর 'অ্যান্টিবডি' কথা দুটো ব্যবহার করেছি। মনে রাখবে, দেহে আরও বেশ কিছু অ্যান্টিজেন এবং অসংখ্য রকমের অ্যান্টিবডি আছে। কিন্তু রক্তের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত অ্যান্টিজেনগুলোকেই বলা হয় অ্যাগ্লুটিনোজেন এবং এই সম্পর্কিত অ্যান্টিবডিগুলোকে বলে অ্যাগ্লুটিনিন। 'Agglutinogen' শব্দটাকে ভাঙলেই এর অর্থ পেয়ে যাবে। 'Agglutination related Antigen', অর্থাৎ 'রক্তের জমাট বাঁধা সম্পর্কিত অ্যান্টিজেন'। সেই সঙ্গে খেয়াল রেখ, অ্যাগ্লুটিনিন 'a' এবং 'b'-কে যথাক্রমে অ্যাগ্লুটিনিন 'আলফা' এবং 'বিটা'ও বলে।

আরেকটা কথা অনেকবার উল্লেখ করেছি; তা হল, 'জমাট বাঁধা'। রক্তের তঞ্চনের সময় রক্ত জমাট বাঁধে; কিন্তু এই জমাট বাঁধা 'Agglutination'-এর থেকে আলাদা। Agglutination-এ ফাইব্রিনোজেন বা শ্বেতকণিকা বা অণুচক্রিকা অংশগ্রহণ করে না। শুধু লোহিতকণিকাগুলো পরস্পরের গায়ে আটকে দলা পাকিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই 'জমাট বাঁধা'র সঙ্গে 'দলা পাকান' ভাষাটা ব্যবহার করা ভাল। না হলে, তঞ্চনের সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে। সব শেষে একটা ছোট্ট ছবি দিয়ে দিই, যেটা মনে রাখলে মৌখিক পরীক্ষাতে এক মুহূর্তেই বলতে পারবে, কোন দাতার রক্ত কোন গ্রহীতাকে দেওয়া যেতে পারে।

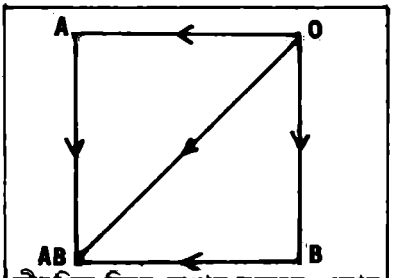

তীরচিহ্ন দিয়ে দেখান হয়েছে, কোন শ্রেণীর দাতা কোন শ্রেণীর গ্রহীতাকে রক্ত দিতে পারে।

এতক্ষণ রক্তের 'ABO' শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পড়লে। রক্তে কিন্তু 'A' এবং 'B' অ্যাগ্লুটিনোজেনের মত আরও বেশ কিছু পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে সেইগুলো অনুযায়ী রক্তের আরও নানারকম শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। সেগুলোর মধ্যে 'Rh' এবং 'MNS' শ্রেণীবিভাগ প্রধান। তবে কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে, এই শ্রেণীবিভাগগুলো 'ABO' শ্রেণীবিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

থাকলেই চলবে। তোমাদের অনেক পাঠ্য বইয়েই এ ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে লেখা আছে। আমরা কিন্তু পাঠ্যক্রমে ঠিক যতটুকু আছে, ততটুকুই ভালভাবে পড়ব।

এই পড়াটুকুকে আমরা ভেঙে নেব তিন ভাগে—

১. বিভিন্ন প্রাণীদেহে সংবহনের বিভিন্ন ব্যবস্থা।
২ বদ্ধ ও মুক্ত সংবহনতন্ত্র।
৩. কয়েকটি বিশেষ প্রাণীর দেহে সংবহন।

প্রশ্ন

১. রক্তের শ্রেণীবিভাগ বলতে কী বোঝায়?
২. কিসের উপর ভিত্তি করে রক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়?
৩ রক্তের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা কী?
৪. রক্তের শ্রেণীবিভাগের কোন ব্যবস্থাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
৫. 'ABO' শ্রেণীবিভাগে চারটি শ্রেণী আছে। তাদের নাম এবং প্রত্যেকটির মধ্যে যে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি আছে, তাদের নাম বল।
৬. দেহে অসংখ্য অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি আছে। কিন্তু রক্তের শ্রেণীবিভাগের কাজে লাগে এদের মাত্র কয়েকটি। তাদের কী বলে?
৭. অ্যাগ্লুটিনোজেন এবং অ্যাগ্লুটিনিন রক্তে কোথায় থাকে?
৮. 'O' শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট মানুষকে 'সার্বিক রক্তদাতা' বলে। কেন?
৯. 'সার্বিক রক্তগ্রহীতা' কাকে বলে? কেন?
১০. রক্ত ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা কী?
১১. 'B' শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট মানুষ কোন কোন গ্রহীতাকে রক্ত দিতে পারে এবং কোন কোন দাতার রক্তগ্রহণ করতে পারে?
১২. 'ABO' ব্যতীত অপর দুটি শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থার নাম বল।

৬. লসিকা ও তার গুরুত্ব

মানুষের রক্তসংবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একট ধারণা না থাকলে 'লসিকা' সম্পর্কিত আলোচনা বুঝতে অসুবিধে হবে। তাই আমরা এটা পড়ব 'মানুষের রক্তসংবহনতন্ত্র' পড়ার পর।

বিভিন্ন প্রাণীদেহে সংবহনের বৈচিত্র্য

বিভিন্ন প্রাণীর দেহে সংবহনের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার সামান্য ধারণা

১. বিভিন্ন প্রাণীদেহে সংবহনের বিভিন্ন ব্যবস্থা

এককোষী অ্যামিবা থেকে বহুকোষী মানুষ, সকল প্রাণীরই জীবন-প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে দেহে একটি সংবহন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সংবহন ব্যবস্থার কাজ কী? শ্বসনে প্রয়োজনীয় গ্যাস, নানা রকম খাদ্য, দেহের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং বিপাকের ফলে উৎপন্ন কিছু বর্জ্য পদার্থের সংবহন।

অর্থাৎ, সংবহন ব্যবস্থা দেহের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোকে উপযুক্ত স্থানে যেমন পৌঁছে দেয়, তেমনই, ক্ষতিকর বস্তুগুলোকে সরিয়ে নিয়ে এসে দেহ থেকে বার করে দিতে সাহায্য করে। 'সংবহন ও রক্ত' পড়তে শুরু করার দিন একেবারে প্রথমে এ সম্বন্ধে তোমাদের বলেছিলাম। এবার তাহলে আমরা দেখে নিই, প্রাণীদেহে সংবহনের বিভিন্ন ব্যবস্থা কী কী।

ক. এককোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সংবহন খুব বড় সমস্যা নয়। কারণটা বুঝতে পারছ। এদের দেহে একটাই মাত্র কোষ, তার মধ্যেই সব কাজকর্ম চলছে। এখানে বিভিন্ন পদার্থ কোষের একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছাতে পারলেই যথেষ্ট। এটা ঘটে সাইটোপ্লাজমের চলনের মাধ্যম। অর্থাৎ, সাইটোপ্লাজমের কিছুটা অংশ কোষের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে; ফলে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যায়।

খ. বহুকোষী প্রাণীদের দেহ আকারেও বড়, আবার গঠনেও জটিল। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সরল (কম জটিল) গঠন যে বহুকোষী প্রাণীদের, তারাও সংবহনতন্ত্র ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিতে পারে। এদের মধ্যে আছে ছিদ্রাল, একনালীদেহী আর চ্যাপ্টাকৃমি পর্বের প্রাণীরা। এরা ব্যাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোকে এককোষ থেকে অন্যকোষে দেওয়া নেওয়া করে।

গ. কিন্তু জটিল গঠন বিশিষ্ট বহুকোষী প্রাণীদের দেহে একটি সংবহনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ১ মে-র সংখ্যাতে তোমাদের বলেছি, এই সংবহনের মাধ্যম হিসেবে সব সময়েই বেছে নেওয়া হয় একটি তরল পদার্থকে। এই তরল পদার্থের গঠন বিভিন্ন প্রাণীর দেহে বিভিন্ন হলেও কাজের দিক থেকে মোটামুটি একইরকম। এই তরল পদার্থকেই বলে রক্ত। দেহের মধ্যে রক্ত কয়েকটি নালীর মধ্য দিয়ে চলাচল করে। এই নালীদের বলে **রক্তবাহ**। আর, এই চলাচলের পথেই দেহের একস্থান থেকে অন্যস্থানে রক্ত পৌঁছে দেয় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোকে। (ক) আর (খ)-তে যে প্রাণীদের নাম বলেছি, তাদের বাদ দিলে, প্রাণীজগতের বাকি প্রায় সব প্রাণীর দেহেই এই রক্তসংবহনের কোন না কোনও রকম ব্যবস্থা আছে। রক্ত ও রক্তবাহের মাধ্যমে যে সংবহন ব্যবস্থা, তা হতে পারে দুরকমের—বদ্ধ-সংবহনতন্ত্র ও মুক্ত-সংবহনতন্ত্র। আমরা এবার এদের সম্পর্ক পড়ব।

২. বদ্ধ ও মুক্ত সংবহনতন্ত্র

রক্ত আর রক্তবাহ—এই দুটো বস্তু দিয়ে যে সংবহনতন্ত্র গড়ে ওঠে, তার মোটামুটি একটা বিশেষ ধাঁচ থাকে। সেটা কী দেখ। রক্ত চলাচল করে রক্তবাহের মধ্য দিয়ে। কিন্তু রক্ত আদৌ চলাচল করবে কেন? একে চালাতে নিশ্চয়ই একটা পাম্প বা ঐ ধরনের কিছু থাকা দরকার। এই পাম্পের কাজটাই করে হৃৎপিণ্ড। রক্তবাহের একটি অংশ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে পরিণত হয়। এই হৃৎপিণ্ড কিছুক্ষণ পর পর সঙ্কুচিত হয়ে রক্তকে রক্তবাহের মধ্যে ঠেলে দেয়। সেই রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার হৃৎপিণ্ডেই ফিরে আসে। আবার হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ফলে রক্ত রক্তবাহের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়। এইভাবে রক্তের চলাচল ঘটতে থাকে।

এক্ষুণি যে কথাগুলো বললাম, এর মধ্যে একটা জায়গায় একটু ফাঁক আছে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনে রক্ত রক্তবাহের মধ্যে যে ছড়িয়ে পড়ে—সেরকমটা ঘটে সব প্রাণীর দেহেই (যাদের রক্তসংবহনতন্ত্র আছে)। কিন্তু রক্তের হৃৎপিণ্ডে ফিরে

আসার পদ্ধতি সকলের ক্ষেত্রে এক নয়। এই ফিরে আসাটা ঘটতে পারে দু-ভাবে। সেই দুটো পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই সংবহনতন্ত্রকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—

ক. বদ্ধ সংবহনতন্ত্র

খ. মুক্ত সংবহনতন্ত্র

ক. বদ্ধ সংবহনতন্ত্র ঃ এই পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত রক্ত প্রথমে এক ধরনের রক্তবাহের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এবার সেই রক্তবাহেরই প্রান্ত থেকে শুরু হওয়া অপর এক ধরনের রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। ফলে, রক্ত সর্বদাই রক্তবাহ এবং হৃৎপিণ্ডের গহ্বরের মধ্যে থেকে যায়। এই 'পাম্প' এবং 'পাইপের' বাইরে কখনও আসে না। নিচের ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে। এবার

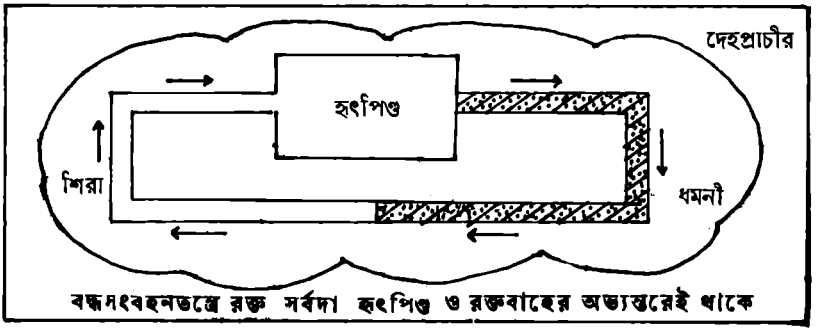

বদ্ধসংবহনতন্ত্রে রক্ত সর্বদা হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহের অভ্যন্তরেই থাকে

নিশ্চয়ই তুমি জিজ্ঞাসা করবে, রক্ত যদি রক্তবাহের মধ্যেই থেকে যায়, তাহলে রক্তের দ্বারা বাহিত বস্তুগুলো (গ্যাস, খাদ্য ইত্যাদি) কোষে পৌঁছাবে কী করে? উত্তরটা কঠিন নয়। পরের দিন আমরা জালক সম্বন্ধে পড়ার সময় এ নিয়ে বিস্তৃত-ভাবে বলব। এখন এটুকু জেনে রাখ যে কোষ আর রক্তের মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তুর আদানপ্রদান ঘটে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রক্তবাহের গায়ে অসংখ্য আণুবীক্ষণিক (মানে, শুধু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়, এমন) ছিদ্র থাকে। তার মধ্য দিয়ে এই ব্যাপন ঘটে। বদ্ধ সংবহনতন্ত্র দেখা যায় সব মেরুদণ্ডী এবং অঙ্গুরীমাল ও অন্যান্য কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে।

মুক্ত সংবহনতন্ত্র ঃ প্রথমেই ছবিটা দেখ। এখানে হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন রক্ত প্রথমে রক্তবাহের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু সেই রক্তবাহের অন্যদিকের মুখটা থাকে খোলা। ফলে রক্তবাহ থেকে ঐ রক্ত দেহগহ্বরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

(দেহপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে পৌষ্টিক নালী, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ কিছুটা স্থান জুড়ে থাকে। বাকি ফাঁকা জায়গাটুকুকে বলে দেহগহ্বর।)

এখন, এই দেহগহ্বরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো কোষের মাঝে মাঝে কয়েকটি পকেটের মত ফাঁকা জায়গা থাকে। তাদের বলে ল্যাকিউনা (Lacuna ; বহুবচন—Lacunae)। রক্তবাহ থেকে রক্ত প্রথমে এই ল্যাকিউনাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে রক্ত আসে সাইনাস (Sinus) বলে একটি স্থানে। সাইনাসকে একটা বড় আকারের ল্যাকিউনা বলে ভাবতে পার, যা হৃৎপিণ্ডের খুব কাছে অবস্থিত। মুক্ত সংবহনতন্ত্রের

ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের গায়ে কয়েকটি ছোট ছোট অস্টিয়াম বা ছিদ্র থাকে। (Ostium ; বহুবচন—Ostia)। এবার সাইনাস থেকে রক্ত অস্টিয়ার মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডে ঢুকে পড়ে। এইভাবে রক্তপ্রবাহ চলতে থাকে। অর্থাৎ, মুক্ত সংবহনতন্ত্রের বেলায়, রক্ত কোনও রক্তবাহের মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডে ফেরে না। এতক্ষণে বুঝলে ত এর নাম 'মুক্ত সংবহনতন্ত্র' কেন? উত্তরটা খুবই সোজা। এই ধরনের সংবহন ব্যবস্থায় রক্ত রক্তবাহের বাইরে দেহগহ্বরের মধ্যে মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বলে এর এই নামকরণ।

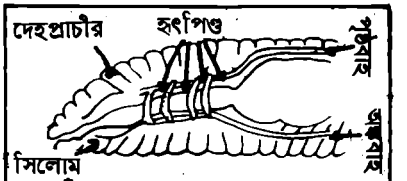

কেঁচোর বদ্ধরক্তসংবহনতন্ত্রের সম্মুখাংশ

লম্বাটে অঙ্গ দেখা যায়, যারা পৃষ্ঠবাহ এবং অঙ্কবাহকে যোগ করে রাখে। পৃষ্ঠবাহ আর অঙ্কবাহ মানে কেঁচোর পৌষ্টিক নালীর যথাক্রমে পিঠের ও কোলের দিকে

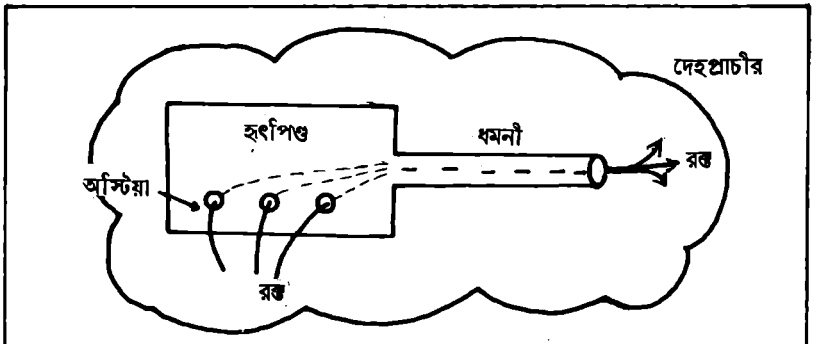

মুক্তসংবহনতন্ত্রে রক্ত ধমনী থেকে দেহগহ্বরে উৎক্ষিপ্ত হয়

আদ্যপ্রাণী, ছিদ্রাল, একনালীদেহী ও অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণীদের বাদ দিলে বাকি বেশির ভাগ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহেই মুক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়।

৩. কয়েকটি বিশেষ প্রাণীর দেহে সংবহন

এটা আলাদাভাবে তোমাদের জানার বিশেষ প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনেক সময় এ থেকে দুয়েকটা ছোটখাটো প্রশ্ন আসে। তাই অল্পকথায় বলে দিচ্ছি।

ক. **কেঁচো ঃ** অঙ্গুরীমাল প্রাণী। এর দেহে বদ্ধসংবহনতন্ত্র দেখা যায়। এদের বদ্ধ সংবহনতন্ত্রের মধ্যে চারজোড়া লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত দুটি রক্তবাহ। এই চারজোড়া অঙ্গ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে কেঁচোর হৃৎপিণ্ডের কাজ চালায়, তবে কোন মতে। ছবি দেখে মিলিয়ে নাও।

খ. **আরশোলা এবং চিংড়ি ঃ** এদের ব্যাপারে বলার নতুন কিছু নেই। মুক্তসংবহনতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে বিবরণটুকু দিয়েছি, ঠিক সেটাই আরশোলা বা চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শুধু খেয়াল রেখ, এদের হৃৎপিণ্ড থেকে যে রক্তবাহটি বার হয়, তাকে বলে মহাধমনী বা অ্যাওর্টা (Aorta), আর এদের দেহগহ্বরে রক্ত মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে বলে সেটির নাম

হিমোসিল (**Haemocoel**)। **Haemocoel**-এর অর্থ, যে দেহগহ্বরে রক্ত থাকে।

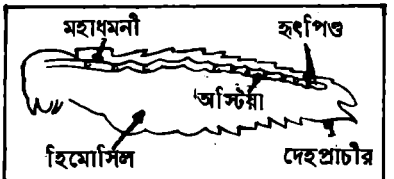

আরশোলার মুক্তসংবহনতন্ত্র

গ. **বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী ঃ** মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সকলের ক্ষেত্রেই বদ্ধ-সংবহনতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। এদের হৃৎপিণ্ডের কয়েকটি ভাগ থাকে। হৃৎপিণ্ডের নিলয় থেকে রক্ত ধমনীতে প্রবেশ করে, এবং শিরাপথে আবার হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে ফিরে আসে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন-তন্ত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এদের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবহনতন্ত্রেরও উন্নতি ঘটেছে। আমরা এ সম্বন্ধে পড়ব দশম শ্রেণীর 'বিবর্তন' (Evolution) অধ্যায়ে। এখন এটুকু জেনে রাখতে পার যে, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মৎস্যশ্রেণীর প্রাণীদের সংবহনতন্ত্র সবচেয়ে অনুন্নত এবং স্তন্যপায়ী শ্রেণীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত। আর একটা কথা, বদ্ধসংবহনতন্ত্র, মুক্তসংবহনতন্ত্রের চেয়ে উন্নত ব্যবস্থা। এর কারণগুলো পরে জানতে পারবে।

আজকের পড়া এই পর্যন্ত। এর পরদিন 'সংবহন ও রক্ত' পড়ে আমরা শুরু করব নতুন অধ্যায় 'চলন ও গমন'। তার আগে যেটুকু পড়া হল, সেটা তৈরি করে রেখ কিন্তু।

প্রশ্ন

১. প্রাণীদেহে সংবহনের জন্য মোটামুটি তিন রকমের ব্যবস্থা দেখা যায়। সেগুলো কী কী ?

২. এককোষী প্রাণীদের দেহে সংবহন কিভাবে ঘটে ?

৩. এমন তিনটি প্রাণীর নাম বল যাদের দেহে ব্যাপনের মাধ্যমে সংবহন ঘটে।

৪. বদ্ধসংবহনতন্ত্র বলতে কী বোঝ ?

৫. মুক্তসংবহনতন্ত্রে রক্তবাহ থেকে রক্ত কিভাবে হৃৎপিণ্ডে ফেরে ?

৬. বদ্ধ ও মুক্তসংবহনতন্ত্রের মধ্যে তফাৎ মাত্র একটি। সেটি কী ?

৭. তিনটি প্রাণীর নাম বল, যাদের দেহে বদ্ধসংবহনতন্ত্র দেখা যায়।

৮. মুক্তসংবহনতন্ত্রে রক্ত সরাসরি কোষের সংস্পর্শে আসে ; কিন্তু বদ্ধসংবহনতন্ত্রে তা আসে না। তা সত্ত্বেও বদ্ধসংবহনতন্ত্রে কিভাবে বিভিন্ন বস্তুর আদানপ্রদান ঘটে ?

৯. অস্টিয়াম, ল্যাকিউনা ও সাইনাস কাকে বলে ?

১০. আরশোলা ও চিংড়ির দেহে সংবহন কিভাবে ঘটে ?

১১. হিমোসিল কী ? 'কেঁচোর দেহ-গহ্বরকে সিলোম (coelome) বলে'—কিন্তু চিংড়ির দেহগহ্বরকে হিমোসিল বলে কেন ?

১২. 'মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে মুক্ত-সংবহনতন্ত্র দেখা যায় না'—কাদের দেহে দেখা যায় ?

দেবাশিস বিশ্বাস

কর্মশিক্ষা

গত সংখ্যায় 'উদ্যানরচনা' প্রকল্প শুরু করেছি আমরা। আলোচনা করেছি বাগান তৈরির নকশা, জমি তৈরি, চারা বসান, আর্দ্রতা সংরক্ষণ, ডাল ছাঁটা। সেই সঙ্গে কলম তৈরি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। শাখা কলম, দাবা কলম আর গুটি কলম কিভাবে করতে হয় জেনে নিয়ে তোমরা স্কুলের মাঠে কাজ শুরু করে দিয়েছ হয়ত। আরও দু-এক রকমের কলম আছে। আজ সে কথায় আসা যাক।

উদ্যান রচনার আরও কথা

তিন রকমের কলম তৈরির কৌশল তোমরা জেনেছ। এবার আরও দুটি পদ্ধতি শিখে নাও।

৪. **চোখ কলম :** নির্বাচিত গাছের চোখ অন্য একটি গাছের কাণ্ডের মধ্যে বসিয়ে নতুন চারা করা হলে তাকে চোখ কলম বা Budding বলে। এ জন্যে দুটি গাছের প্রয়োজন। একটি মূলসহ গাছ বা 'এলা গাছ'—এক বা দুই বছর বয়সের একটা শক্ত চারাগাছ হলেই ভাল ; এর ছালের মধ্যে চোখ বসান হয়। অন্য গাছটি উন্নত জাতের গাছ বা 'মাতৃগাছ'—এর থেকেই কাঙ্ক্ষিক মুকুল বা চোখ সংগ্রহ করা হয়। মাতৃগাছ থেকে একটি পুষ্ট চোখ ছুরি দিয়ে কেটে তুলে নিয়ে এলাগাছের ডালের বাকলে ইংরাজী 'T' অক্ষরের মত দাগ দিয়ে কিছুটা ফাঁক করে নিতে হয়। তারপর চোখটি ওর মধ্যে বসিয়ে পাট দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। দু কান চোখ থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন চারা বার হবে। চোখ কলম বাঁধার উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল।

৫. **জোড় কলম :** একটি সমূল চারাগাছ বা এলাগাছের শরীরে অন্য একটি উন্নত জাতের মাতৃগাছের অংশ যুক্ত করে উন্নত ধরনের ফুল ও ফলের চারা উৎপন্ন করা যায়। দুটি গাছকে জোড়া লাগিয়ে নতুন চারা উৎপাদনের পদ্ধতিকে জোড় কলম বা Grafting বলে। একটি সমূল চারাকে দু এক বছর টবে রেখে একটি উন্নত জাতের শাখার সঙ্গে ঐ চারার জোড় করা হয়। চারা এবং ডাল যেখানে জোড় লাগান হবে সেই জায়গা দুটিতে ছুরি দিয়ে খানিকটা ছাল তুলে দেওয়ার পর ওই দুটি একত্র করে পাট বা নারকেল-ছোবড়ার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিতে হয়। এক থেকে তিন মাস সময় লাগবে জোড়া হতে ; জুড়ে

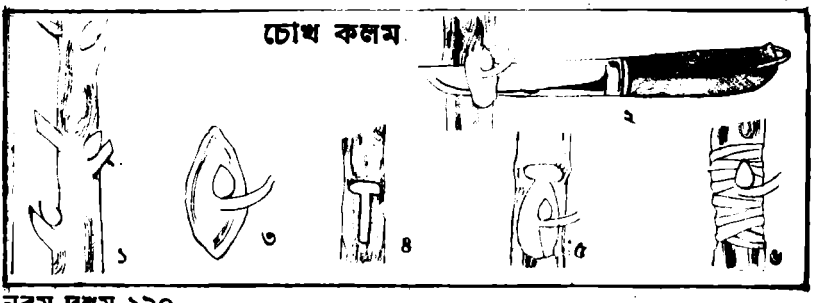

জোড় কলম

যাবার পর ডালটি কেটে দিতে হয়। চারা-গাছটির মাথাও ছেঁটে দিতে হবে। এক বছরের মধ্যেই জোড় কলম বাগানের নির্দিষ্ট স্থানে রোপণের উপযোগী হবে। জোড় কলমের সবচেয়ে ভাল পদ্ধতির নাম **'ইনারচিং'**। আম, পেয়ারা, লিচু, কমলালেবু ইত্যাদি ফলের গাছে এবং গোলাপ, চাঁপা, টগর, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের গাছে এই জোড় কলম প্রস্তুত করা হয়।

কোন মাসের জন্য কী ফুল

জুলাই ঃ ক্যানা-র গেঁড় বর্ষার মাসে বসাতে হয়।

অগস্ট ঃ চন্দ্রমল্লিকার চারা টবে বা বাগানে এই সময় বসাতে হয়।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ঃ অ্যাস্টার, কর্ণফ্লাওয়ার, কার্নেশন, ডায়ানথাস, ক্যালেন-ডুলা, প্যানসি, হোলিহক, কৃষ্ণকলি, গাঁদা। এ সময় পুরোন গোলাপ গাছ ছাঁটাই করতে হবে।

নভেম্বর ঃ বাগানে গাছের পরিচর্যা।

ডিসেম্বর-জানুয়ারি ঃ গোলাপের কলম করা যেতে পারে। মরসুমী গাছেও ফুল ফুটেছে।

ফেব্রুয়ারি ঃ রজনীগন্ধা, কসমস ও গিলার্ডিয়ার বীজ বোনা যায়। অর্কিডের গেঁড় পোঁতা যায়। চন্দ্রমল্লিকার গাছে ফুল ফোটা শেষ—এইবার গোড়া থেকে গাছের মাথা কেটে দিলে নতুন গেঁড় জন্মাবে।

মার্চ-এপ্রিল ঃ বেল, চাঁপা ইত্যাদি গ্রীষ্মের মরসুমী ফুল বোনার সময়।

মে-জুন ঃ দোপাটি, যুঁই, জিনিয়া, সূর্যমুখী, পিটুনিয়া প্রভৃতি বর্ষাতি ফুল বোনার সময়। ডালিয়ার গেঁড় টবে বসাতে হবে।

লতানে ফুলের গাছ

বাগানের সৌন্দর্য বাড়াতে লতানে ফুলের গাছের অবদান কম নয়। নীল, সাদা, বেগুনি নানা রঙের **অপরাজিতা** ফুল ত বার মাসই ফোটে। বর্ষাকালে এর বীজ থেকে চারা তৈরি করতে হয়। **যুঁই** বা **জ্যাসমিনাম** নিশ্চয়ই দেখেছ, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সাদা ফুলে বাগান ভরে যায়। বেশ গন্ধ। বর্ষাকালে ডাল-কলমে চারা হয়। **অ্যালমাণ্ডা** ফুলও গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের ফুল। রঙ হলদে ও গোলাপী দু রকমেরই আছে। ডাল-কলম ও দাবা-কলমে এর চারা তৈরি হয়। বর্ষাকালে ডাল-কলম ও দাবা-কলমে আর এক ধরনের লতানে ফুলের চারাও জন্মান হয়। তার নাম **ক্লোরো-ডেনড্রন**—থোকা থোকা লাল ফুলের বাহার, মিষ্টি গন্ধ। এর ফুল ফোটে শীতকালে। বাড়ির ছাদে টবেও পোঁতা যায়। মানুষের সবচেয়ে প্রিয় লতানে ফুল বোধহয় **বোগেনভিলিয়া**। পাতলা কাগজের মত রঙিন ফুল—অজস্র ফুলে গাছ ভরে গিয়ে

অপূর্ব শোভা হয়। নানা রঙের পোশাক পরে বোগেনভিলিয়া দেখা দেয় আমাদের বাগানে—উজ্জ্বল লাল, কালচে লাল, বেগুনি, গোলাপী, হলদে, সাদা, আবার একই গাছে গোলাপী ও সাদার মিশ্রণে মেরী পামার। বোগেনভিলিয়া বছরে দু'বার ফুল দেয়—একবার গরমে, আর একবার শীতে। সাধারণত ডাল কেটেই কলম করা হয়; এই গাছের কাটা ডাল জলভর্তি বোতলে রেখে দিলেও শিকড় বের হয়। বোগেনভিলিয়া হচ্ছে লতানে ফুলের রাণী, খুব শৌখিন—প্রচুর রোদ চাই তার। **মাধবীলতা** বসন্ত কালের ফুল। মাধবী ফুল অমর হয়ে আছে রবি ঠাকুরের গানে ঃ

'মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।'

এই ফুল সাদা ও ফিকে হলদে রঙের হয়; বীজ থেকে বা দাবা-কলমে চারা তৈরি করতে হয়। সব শেষে বলি **মালতীলতার** কথা ঃ

'ওই মালতীলতা দোলে
পিয়ালতরুর কোলে পুব হাওয়াতে।'

সাদা রঙের প্রচুর সুগন্ধি মালতীফুলে বর্ষার বাগান ছেয়ে থাকে।

বাগান সাজাবার গাছ

কেবল যে ফুলওয়ালা গাছ দিয়ে বাগান সাজান যায় তা ত নয়। নানা রকম বাহারী পাতার গাছ আছে যা বাগানের শোভা বাড়ায় কিংবা টবে বড় হয়ে স্কুলবারান্দাকে সুশোভিত করে। এগুলোতে মূলের কাটিং থেকেই চারা তৈরি হয়।

স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতি বরণের জন্য তোড়া বা 'বোকে' তৈরি করতে যে বাহারী পাতা তোমরা ব্যবহার কর তার নাম **অ্যাসপিডিয়ট্রা**। **অ্যালোকেসিয়া** পাতার রঙ সবুজ, সাদা শিরাযুক্ত। **ক্যালোডিয়াম** তোমরা বহু জায়গায় দেখেছ—তীরের ফলার মত, চওড়া বাহারী কচুর পাতা ধরনের। **ক্রোটন** গাছের পাতা নানা আকৃতির, নানা বর্ণের। **ড্রেসিনা** পাতা লম্বা, ছুঁচাল, লাল রঙের। **পাম** হচ্ছে তাল-জাতীয় গাছ। আর যে পাতাবাহারে হলদে রঙের ডোরা ডোরা দাগ ও লাল রঙের ছিট দেখেছ তার নাম **স্যানচেনিয়া**।

এইসব পাতাবাহারী গাছ ছাড়াও বাগান সাজাবার কাজে লাগে নানান গন্ধ

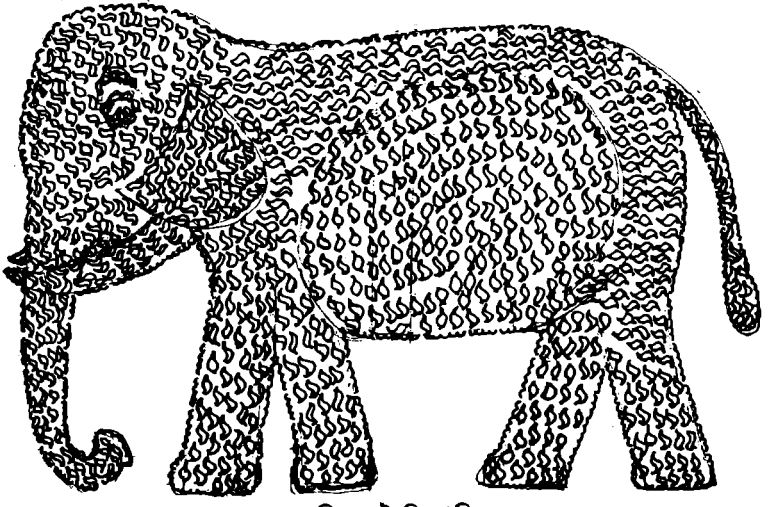

হাতির টোপিয়ারি

পাতার গাছ, ঝাউগাছ, ফার্নগাছ এবং ক্যাকটাস জাতীয় গাছ।বাগানের অলংকার হিসেবে আর একটি ইন্টারেস্টিং গাছের কথা তোমাদের বলতে পারি। এর নাম Topiary—যার বাঙলা পরিভাষা হচ্ছে 'অলংকৃত বাগান'। পাতবাহার গাছ বা ছোট ঝোপগাছকে কেটে-ছেঁটে হাতি, জিরাফ, হরিণ, ময়ূর, পিরামিড, পাহাড় ইত্যাদি নানা আকার দেওয়াকে বলে **টোপিয়ারি**'। টোপিয়ারি করতে হলে গাছ বেছে নিয়ে তাকে হাতি, হরিণ বা পিরামিড যে আকার দেওয়া হবে তার ফ্রেম তৈরি করে ঝোপগাছের মধ্যে বসিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে। কিছুকাল পরে দেখা যাবে ঐ ফ্রেমের চাপে গাছের কচি ডাল-পাতা ফ্রেমের আকারে বড় হয়ে উঠেছে। ফ্রেম থেকে এদিক ওদিকে যে সব ডালপাতা বেরিয়ে এসেছে সেগুলো ছেঁটে দিতে হবে। ডাল যেই শক্ত হয়ে উঠবে তখনই ফ্রেমের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। তখন যেমনটি চাইছি ঠিক তেমনি আকারে টোপিয়ারি বেড়ে উঠবে।

লন বা ঘাসজমি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ

তোমাদের স্কুলবাড়ির সামনেটায় ফাঁকা জমিতে নরম ও সবুজ কার্পেটের মত একটা লন (lawn) যদি থাকত, কী সুন্দর দেখাত বল ত! জমি এমনিতে পড়ে থাকলে সেখানে উলুঘাস ছেয়ে যাবে, বাড়ির সৌন্দর্যও নষ্ট। কবির ভাষায় সেই যে—'ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছা / মালীর যত্ন নেই।' লন বা ঘাসজমির মাঝে মাঝে হরেক রকম মরসুমী, বাহারী বা লতানে ফুলগাছের সাজান জমিকে জ্যামিতিক আকারে নানা ডিজাইন দেওয়া যায়। একে বলা হয় **মালঞ্চ** বা **কেয়ারি**। স্কুলের বা নিজের বাড়ির ফুলবাগানে এরকম কেয়ারি করতে পারলে রুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় দিতে পারবে।

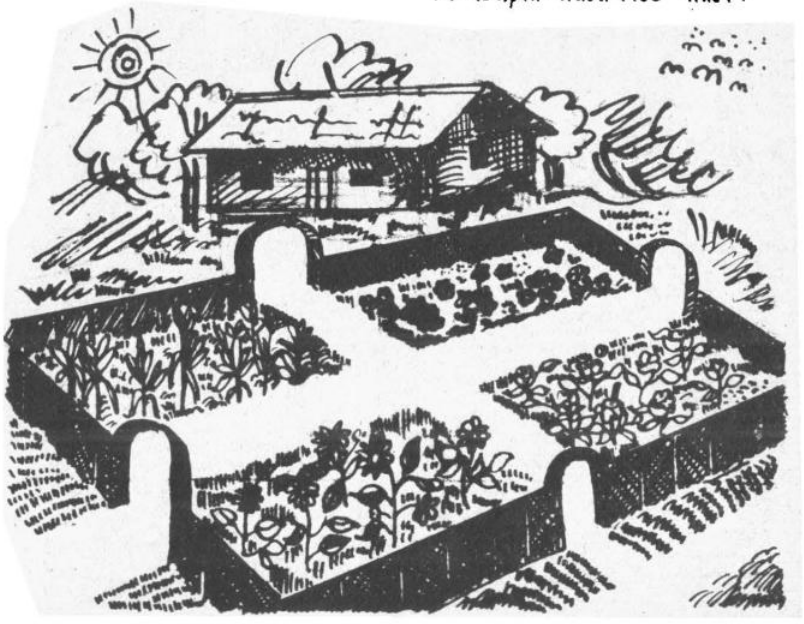

বাগান কেয়ারির ডিজাইন

লন তৈরির জন্য দুর্বাঘাসই সবচেয়ে ভাল। গরম পড়বার আগে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মাটি ভালভাবে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে (দেড় থেকে দু ফুট গভীর যেন হয়) ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। মাটিতে ইটের টুকরো, আগাছার শিকড় ইত্যাদি সযত্নে বেছে নিতে হয়। মাটি খুবই এঁটেল হলে মাটির সঙ্গে পরিমাণমত কিছু বালি মেশাতে হয়। মাটি কোপান শেষ হলে জমিতে কয়েকদিন রোদ লাগুক। তারপর ভাল করে সমতল করে নিতে হবে। বর্ষাকালে দুর্বাঘাসের বীজ বা শিকড় বপন বা রোপণ করে লন তৈরি করতে হয়। একর প্রতি ৭ কে জি. বীজ ছড়াতে হবে। এবার সূক্ষ্ম ঝাঁঝরিযুক্ত ঝারি দিয়ে হালকাভাবে জলসেচন করতে হবে। দেড় মাসের মধ্যে সবুজ ঘাসে লন ছেয়ে যাবে।

আর একটি পদ্ধতি দুর্বাঘাসের শিকড় পুঁতে লন তৈরি করা। বর্ষার আগে জমিটা ভাল করে তৈরি করে নাও। অল্প বৃষ্টি-পাতের পর দুর্বাঘাসের শিকড় ৪ ইঞ্চি দূরে দূরে পুঁতে দাও। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে ঘাস বেরিয়ে পড়বে।

লন **রক্ষণাবেক্ষণের** জন্য মাঝে মাঝে ঘাস ছাঁটাই করা দরকার—'লন মোয়ার' যন্ত্রের সাহায্যে। লনের ঘাস সবুজ রাখতে হলে ৫ লিটার জলে ১৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট মিশিয়ে তরল সার প্রস্তুত করে ঘাসজমিতে প্রয়োগ করতে হবে। দরদ ও ভালবাসা দিয়ে বাগান রক্ষা করতে না পারলে গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের মত তোমাদেরও একদিন আক্ষেপ করে বলতে হবে: 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!'

উদ্যান রচনার কথা শেষ হল। এবার **প্রশ্নোত্তরের পালা**।

● ফল গাছের জন্য কিভাবে জমি তৈরি করবে?

—কম দূরত্বে লাগান গাছের জন্য দেড় হাত চওড়া ঝুড়ির মত গর্ত খুঁড়তে হয়। ছোট ধরনের গর্তে ১০ কেজি হারে গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্ত ভরে দিতে হবে, জল দিতে হবে। দিন পনের পর এই গর্ত চারা লাগানর উপযোগী হয়ে যাবে। চারা লাগানর তিন দিন আগে প্রতি গর্তে ৫০ গ্রাম করে ইউরিয়া এবং সুপারফসফেট মিশিয়ে দিতে হবে।

●চারা কেমন করে লাগাতে হয়?

—কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গর্তের মাটি ভালভাবে বসে গেলে চারা লাগাতে হয়। উইয়ের উপদ্রব এড়াতে দু চামচ গ্যামাকসিন প্রতি গর্তে মেশাতে হবে। বাজার থেকে কেনা চারার গোড়ার মাটিতে দেখেছ শুকনো খড়পাতা দিয়ে জড়ান; চারা লাগানর সময় ওগুলো ফেলে দিতে হবে। খাড়াভাবে গর্তের ঠিক মাঝখানে চারাটা বসিয়ে চারপাশের মাটি শক্ত করে চেপে তারপর জল দিতে হয়। বাতাসে হেলে না যায় সেজন্য খুঁটি পুঁতে চারাটিকে তার সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়।

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

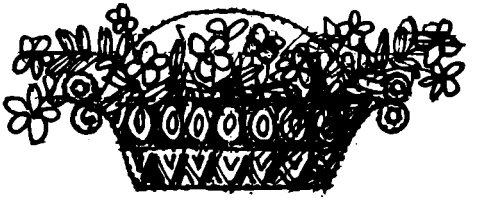

শারীর শিক্ষা

এ বছর থেকে শারীর শিক্ষার সিলেবাসে দৈনিক বিদ্যালয় সমাবেশ [Daily Assembly] বাধ্যতামূলকভাবে তোমাদের জন্য রাখা হয়েছে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শুরু হওয়ার আগে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে এই সমাবেশ হবে। উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, একতাবোধ, কর্তব্যপরায়নতা, বৃন্দগান ও তৎপরতাবোধ গড়ে তোলা। এই অভ্যাস বিদ্যালয়ের সাধারণ উৎসবগুলোকে সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে ও সেইসঙ্গে বিদ্যালয়ে পড়াশুনোর এক মনোরম পরিবেশ গড়ে উঠবে।

বিদ্যালয় আরম্ভের আগে দৈনিক সমাবেশের কর্মসূচী থাকবে ঃ

ক. বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা দাঁড়াবেন। ছাত্রছাত্রীরা হাউস সিস্টেমে (দলগতভাবে) দাঁড়াবে। এর জন্য বরাদ্দ সময় হল দেড় মিনিট। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাই তোমাদের হাউস সিস্টেমে (দলে) ভাগ করে দেবেন। এই হাউস সিস্টেমের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের নিজের হাতে কার্য পরিচালনা ও সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া। এর মধ্যে দিয়েই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ফুটে ওঠে।

প্রতিটি হাউসে বা দলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে থেকে একজন দল পরিচালক (হাউস মাস্টার), একজন সহকারী দল পরিচালক (সহকারী হাউস মাস্টার) দলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন দল নায়ক (হাউস ক্যাপ্টেন), একজন সহকারী দল নায়ক (সহকারী হাউস ক্যাপ্টেন) ও সব কটি হাউস বা দলের উপর থাকবে ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন বিদ্যালয় নায়ক (স্কুল ক্যাপ্টেন)। প্রত্যেক দলের পরিচালকরা দলনায়কদের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে দেবেন। হাউস সিস্টেমে বা দলে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে

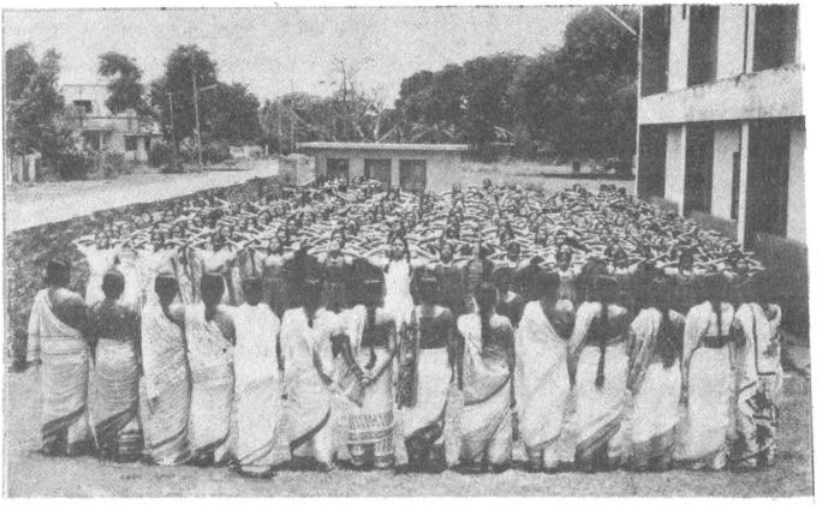

নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

১. প্রথমে প্রত্যেক শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে চার, পাঁচ বা ছয়টি (এই সংখ্যা নির্ভর করবে কটা হাউস হবে তার ওপর) সমান ভাগ করে নিতে হবে। এই ভাগ,শ্রেণীর ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে হতে পারে, যে রকম—

হাউস	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
শ্রেণীর ক্রমিক সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫
	৬	৭	৮	৯	১০

২. এবার প্রতি শ্রেণীর 'ক' দের নিয়ে একটি হাউস বা দল, 'খ' দের নিয়ে আর একটি দল হবে। হাউস বা দলের নামকরণ দলের সভ্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করবে, যেমন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, গান্ধী, নজরুল ইত্যাদি।

দৈনিক সমাবেশে যখন দাঁড়াবে তখন মনে রাখবে নিজ নিজ দল বা হাউসে একে অপরের পিছনে দাঁড়াবে। দাঁড়াবার সময় অবশ্যই মনে রাখবে—উচ্চতা অনুসারে ছোটরা সামনে ও বড়রা পিছনে থাকবে। দলের প্রথমে যারা থাকবে তারা দু হাত বা এক হাত তুলে বা কোমরে দু হাত রেখে একে অপরের থেকে দূরে জায়গা নিয়ে দাঁড়াবে। প্রথম জনকে দেখে দলের অন্যান্যরা তার পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক দলের দলনায়ক ও সহকারী দলনায়ক নিজ নিজ দলের ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়াতে সাহায্য করবে ও প্রত্যেক দলের সামনে প্রথমে দলনায়ক ও তার পিছনে সহকারী দলনায়ক দাঁড়াবে। দলনায়কদের সামনে মাঝামাঝি জায়গায় বিদ্যালয় নায়ক দাঁড়াবে। বিদ্যালয় নায়কের দিকে মুখ করে দশ গজ দূরে ঠিক সামনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা দাঁড়াবেন। তাঁর পিছনে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা এক লাইনে দাঁড়াবেন।

খ. এরপর তিরিশ সেকেণ্ডের জন্য নীরবতা অবলম্বন। নীরবতা পালনের সময় সবাই 'সাবধান' অবস্থায় সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াবে। মনে রাখতে হবে এর মধ্যে দিয়েই মনের সংযম আনতে হবে। **এই সময় কখনই অন্য কারুর দিকে তাকাবে না।**

গ. এরপর প্রার্থনা সঙ্গীত করতে হবে ও এর জন্য সময় বরাদ্দ করা হয়েছে এক মিনিট।

তোমাদের জন্য লেখার শেষে একটি প্রার্থনা সঙ্গীত স্বরলিপি সহ দেওয়া হল। এই গানটি প্রার্থনা করতে পার বা বিদ্যালয়ে যদি অন্য কোন প্রার্থনা সঙ্গীত করান হয় সেগুলো করলেও ভুল হবে না।

ঘ. এরপর তিনটে বা চারটে খালি-হাতের ব্যায়াম করতে হবে। সময় বরাদ্দ মোট তিন মিনিট।

এই অল্প কয়েক মিনিটের ব্যায়ামের উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের মন সারা দিনের জন্য সতেজ, প্রফুল্ল ও তৎপর রাখা ও সেই-সঙ্গে শারীর শিক্ষার প্রতি মানসিকতা ও অভ্যাস গঠন করা।

খালি হাতের অনেকগুলো ব্যায়াম নবম দশমের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায় দেওয়া আছে। ওইগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে তোমরা ব্যায়াম করতে পার।

ঙ. এরপর ছাত্রছাত্রী কর্তৃক দৈনিক সংবাদ পরিবেশন করা। এর জন্য বরাদ্দ মোট দেড় মিনিট সময়।

প্রতিদিন এক এক হাউস থেকে এক এক জন সংবাদ পরিবেশন করবে। মনে রাখবে, দিনের বিশেষ বিশেষ খবরগুলোই উল্লেখ করবে। এর জন্য অবশ্যই প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলো দেখে রাখবে। এর উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ান।

চ. সংবাদ পরিবেশনের পর বিদ্যা-

লয়ের প্রধান বা সহকারী প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা দিনের কোন বিশেষ ঘোষণা বা নির্দেশ থাকলে করবেন। এর জন্য বরাদ্দ এক মিনিট সময়।

ছ. সবার শেষে ছাত্রছাত্রীরা শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে লাইন করে নিজ নিজ শ্রেণীতে চলে যাবে। তার জন্য সময় বরাদ্দ দেড় মিনিট। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলে ঠিক সেইভাবেই দলনায়ককে সামনে রেখে তার পিছনে পিছনে নিজ নিজ শ্রেণীর দিকে এগিয়ে যাবে।

ছবি ঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়

প্রার্থনা সঙ্গীত

তাল-দাদরা

ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা
হৃদয়ে মাগিয়া লব
জগতের কাজে জগতের মাঝে
আপনা ভুলিয়া রব।
ছোট তারা হাসে আকাশের গায়
ছোট ফুল ফোটে গাছে
ছোট বটে তবু তোমার জগতে
আমাদেরও কাজ আছে

দাও তবে প্রভু হেন শুভ মতি
প্রাণে দাও নব আশা
জগত মাঝারে যেন সবাকারে
দিতে পারি ভালোবাসা
সুখে দুখে শোকে অপরের লাগি
যেন এ জীবন ধরি
অশ্রু মোছায়ে বেদনা ঘুচায়ে
জীবন সফল করি।

স্বরলিপি

কথা ঃ যোগাদ্রনাথ সরকার — সুর ঃ ভবানী চট্টোপাধ্যায়

র্সা	র্সা	র্সা	নি	র্সা	র্সা	নি	ধা	ধা	পা	মা	পা
ছো	০	ট	শি	০	শু	মো	রা	০	তো	মা	র
মা	গা	গা	গা	গা	গা	সা	রে	গা	সা	রে	গা
ক	রু	ণা	০	০	০	হৃ	দ	য়ে	মা	গি	য়া
পা	মা	মা	মা	মা	মা	সা	রে	গা	মা	পা	পা
ল	ব	০	০	০	০	জ	গ	তে	র	কা	জে
রে	গা	মা	পা	ধা	ধা	গা	মা	পা	ধা	নি	নি
জ	গ	তে	র	মা	ঝে	আ	প	না	ভু	লি	য়া
র্সা	নি	নি	নি	নি	নি	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা
র	ব	০	০	০	০	ছো	ট	তা	রা	হা	সে
ধা	ধা	পা	ধা	নি	নি	নি	নি	নি	নি	ধা	নি
আ	কা	শে	র	গা	য়	ছো	ট	ফু	ল	ফো	টে
র্সা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	নি	র্সা
গা	ছে	০	০	০	০	ছো	ট	ব	টে	ত	বু
র্রে	র্রে	র্রে	র্রে	র্রে	র্রে	গা	গা	মা	পা	পা	র্সা
তো	মা	র	জ	গ	তে	আ	মা	দে	র	কা	জ

নি	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	র্সা	র্সা	নি	ধা	পা	ধা
আ	ছে	০	০	০	০	দা	ও	ত	বে	প্র	ভু
নি	নি	ধা	পা	মা	পা	ধা	ধা	পা	মা	গা	মা
হে	ন	শু	ভ	ম	তি	প্রা	ণে	দা	ও	ন	ব
পা	গা	গা	গা	গা	গা	সা	রে	গা	সা	রে	গা
আ	শা	০	০	০	০	জ	গ	ত	মা	ঝা	রে
সা	রে	গা	মা	পা	পা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
যে	ন	স	বা	কা	রে	দি	তে	পা	রি	ভা	ল
র্সা	নি	নি	নি	নি	নি	র্রে	র্রে	র্রে	র্রে	র্রে	র্রে
বা	সা	০	০	০	০	সু	খে	দু	খে	শো	কে
র্রে	র্মা	র্রে	র্সা	র্সা	র্সা	র্রে	র্সা	নি	ধা	পা	র্সা
অ	প	রে	র	লা	গি	যে	ন	এ	জী	ব	ন
র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	নি	ধা	পা	ধা
ধ	রি	০	০	০	০	অ	০	শু	মো	ছা	য়ে
নি	নি	ধা	পা	মা	পা	ধা	ধা	পা	মা	গা	মা
বে	দ	না	ঘু	চা	য়ে	জী	ব	ন	স	ফ	ল
পা	মা	০	মা	মা	মা						
ক	রি	০	০	০	০						

অমিয় সাহা

সৌরকথা

বানার্ড এম ওলিভার নামে এক মার্কিন বিজ্ঞানী মার্কিন সরকারকে 'প্রোজেক্ট সাইক্রুপস' নামে এক পরিকল্পনা দেন। প্রকল্পের নির্ধারিত খরচ ১৯৭১ সালের হিসাবে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা। প্রস্তাবটিতে এর রূপায়ণের সম্ভাব্যতা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে এবং খরচ মার্কিন সেনেটে অনুমোদিত হয়নি।

প্রকল্পে প্রস্তাব ছিল, একশ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট বেতার দূরবীক্ষণের (**Radio Telescope**) অসংখ্য অ্যানটেনা বৃত্তাকারে বসান হবে প্রায় ৫ কি. মি. ব্যাসের একটা বিরাট এলাকা জুড়ে। যদি এই প্রকল্প কোনদিন রূপায়িত হয় তাহলে ৩০ বছরের ব্যবধানে এক হাজার আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত প্রতিটি সূর্য-জাতীয় জ্যোতিষ্কের দুনিয়ার নাড়িনক্ষত্র জানা যাবে। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে সূর্যজাতীয় নক্ষত্রের সংখ্যা ১৩৪০০ কোটি। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী তার মধ্যে প্রাণচঞ্চল। গ্রহের সংখ্যা কম করেও ৬৪ কোটি। আর পৃথিবী থেকে ২০ আলোকবর্ষ দূরত্ব থেকেই তারা রয়েছে। ২২ আলোকবর্ষের মধ্যে তাদের খুঁজে পাবার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগ। যদি প্রাণচঞ্চল গ্রহ মহাকাশে জেগে থাকে তাহলে মানুষের চেয়ে বা তারই মত বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই থাকা সম্ভব। আর এই সব প্রাণীদের প্রেরিত বেতার তরঙ্গের সংকেত 'প্রজেক্ট সাইক্রুপস'-এর বেতার দূরবীণে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

গ্রহণের সূর্য

ডঃ অলোক সেন

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সভ্যতা প্রকৃতি-নির্ভর। প্রকৃতির অকৃপণ দানে যেমন তারা উৎসাহিত হত, তেমনি আবার ভয় পেত তার রুদ্ররূপকে। আর অন্তরের এই ভয় থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে বা বিপদমুক্তির আশায় প্রার্থনা জানিয়েছে ঈশ্বরের কাছে। মানুষের অপরাধের ফলেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে—এরকম ধারণাও বদ্ধমূল ছিল তাদের মনে। তাই দোষমুক্ত হওয়ার জন্য আয়োজন করেছে পুজো-পার্বণ, যাগযজ্ঞ বা পশুবলির। তাদের ধারণা ছিল, এ ভাবেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ সম্ভব—প্রাকৃতিক দুর্যোগে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ কারণেই অফুরন্ত শক্তি ও উজ্জ্বল আলোকের উৎস সূর্যও পুজো পেয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

মানুষের জীবনে সূর্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অপরিসীম। সূর্যগ্রহণ তার কাছে তাই আতঙ্ক নিয়ে আসে। মঙ্গলদায়ী সূর্যকে অন্ধকার হয়ে যেতে দেখে অনাগত বিপদের আশঙ্কায় শিউরে উঠেছে তারা। আবার তাকে কলঙ্কমুক্ত, উজ্জ্বল দেখে স্বস্তিবোধ করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানীরা বারে বারে বোঝাতে চেয়েছেন এটা মানুষের কুসংস্কারমাত্র—বিজ্ঞানের সত্য নয়। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষের দুর্বলতা ও ভয় পুরোপুরি কাটেনি। সূর্যগ্রহণ আজও তাই নানা ভয়-ভাবনার কারণ হয়ে ফিরে ফিরে আসে। মাত্র দু বছর আগেই ১৯৮০-র ১৬ ফেব্রুয়ারি যে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল সে সময়েও মানুষ আতঙ্কিত হয়েছিল ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। কলকাতা শহরের মানুষও সেদিন ঘরের মাঝে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল। পথঘাট ছিল জনহীন। এমনকি এই কুসংস্কার বা অহেতুক ভীতির ফলস্বরূপ সরকারি অফিস আদালতেও সেদিন ছুটি ঘোষণা করা হয়। আধুনিক সভ্য মানুষের কাছে এটা সত্যিই লজ্জার!

তাহলে সূর্যগ্রহণ ব্যাপারটা কি একটু খতিয়ে দেখা যাক। সৌরমণ্ডলের প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে চলে নিজ নিজ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে। সূর্যের চারদিকে এক একবার প্রদক্ষিণ শেষ হলে গ্রহগুলোর এক একটি বছর পূর্ণ হয়। এছাড়া আপন অক্ষের উপর দাঁড়িয়ে গ্রহগুলো পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হয়। আপন অক্ষে এক একবার আবর্তন করলে গ্রহগুলোর এক একটি দিন পূর্ণ হয়।

সৌরমণ্ডলের সদস্য গ্রহগুলোর আবর্তন ও পরিক্রমণের সময়গুলো, তাদের আবর্তন-বেগ, পরিক্রমণ পথের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি কারণে নানারকম হয়ে থাকে। যেমন, পৃথিবীর একটি বছর হয় আমাদের হিসাবে (প্রায়) ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায়। কিন্তু বুধ বা শুক্র গ্রহে

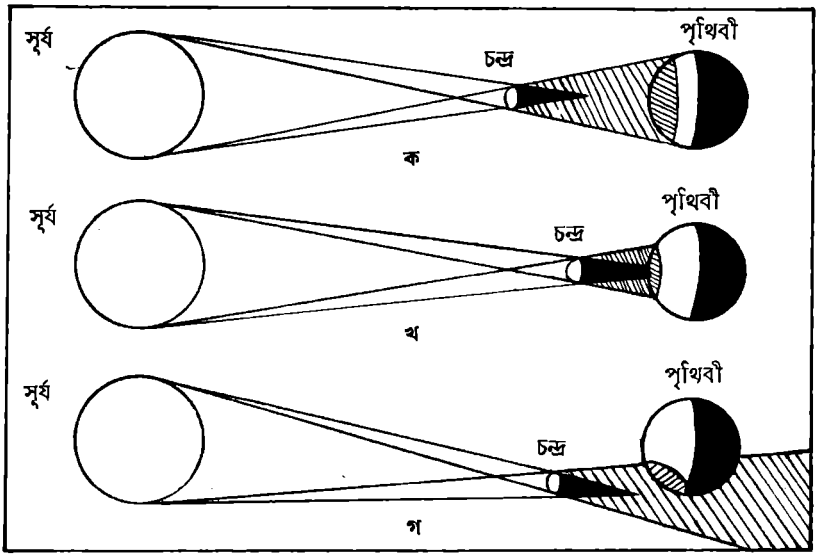

তার চেয়ে অনেক কম সময়েই বছর ফুরিয়ে যায়। আবার প্লুটোর একটি বছর হতে যে সময় লাগে পৃথিবীর হিসাবে তা প্রায় চারশ বছরের সমান।

এই আবর্তনের ফলে দিনের পর রাত আসে, রাতের পর দিন ; আর পরিক্রমণের ফলে হয় ঋতু পরিবর্তন।

প্রতিটি গ্রহের এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। এইসব উপগ্রহ বা উপগ্রহগুলো তাদের নিজ নিজ গ্রহগুলোর চারদিকে পরিক্রমণ করে চলে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করে আসে। এর ফলে উপগ্রহগুলোতেও পূর্ণিমা বা অমাবস্যা দেখা যায়। আবর্তন ও পরিক্রমণের সময় সূর্যের আলো উপগ্রহগুলোর ওপর প্রতিফলিত হয় এবং তাদের অবস্থান অনুসারে সেই আলো কখনও মূল গ্রহটির দিকে ফিরে আসে, কখনও বা তা চলে যায় বিপরীতে। প্রথম ক্ষেত্রে উপগ্রহটিতে হয় পূর্ণিমা আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হয় অমাবস্যা।

দিনের পর দিন চাঁদ ও পৃথিবীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। পারস্পরিক এ সরণের ফলে চাঁদ ও সূর্য ধীরে ধীরে পৃথিবীর একইদিকে এসে যায়। চাঁদ এসে পড়ে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে। তখন সূর্যের আলো চাঁদের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় সূর্যেরই দিকে। চাঁদের যে দিকটি পৃথিবীর দিকে ফেরান থাকে সেদিকটিতে কোন আলো না থাকায় চাঁদকে আমরা একেবারেই দেখতে পাই না। তখন আমাদের পৃথিবীতে অমাবস্যা দেখা দেয়। অমাবস্যার পর আবার চাঁদ একটু একটু করে সরে যায় কৌণিক উপবৃত্তাকার পথে, সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরে আসে পৃথিবীর বুকে। তখন চাঁদের শুক্লপক্ষ, দিনে দিনে চাঁদের দেহটি একটু একটু করে বড় হতে থাকে—পূর্ণতা দেখা দেয় পূর্ণিমার রাতে।

পরিক্রমণ পথে চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্য একই সরল রেখায় উপস্থিত হলেই সূর্যের আলোর প্রবাহে বাধা পড়ে। তখনই দেখা দেয় গ্রহণ।

পৃথিবী যদি সূর্য ও চাঁদের মাঝে পড়ে তাহলে সূর্যের আলোয় বাধা পড়ে

মিশরের সম্রাট ফারাও এবং রাণী নেফারতিতির সূর্যপূজা। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনহাজার বছর আগের প্রস্তরলিপি

পৃথিবীর পিছনে দীর্ঘ ছায়ার শঙ্কু তৈরি হয়—এ অন্ধকার শঙ্কুর মাঝে চাঁদ কখনও আংশিক কখনও বা সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। একেই বলে চন্দ্রগ্রহণ। সম্পূর্ণ অন্ধকারের আড়ালে ঢাকা পড়লে হয় পূর্ণগ্রাস, আংশিক ভাবে ঢাকা পড়লে হয় খণ্ডগ্রাস। চন্দ্রগ্রহণ হয় পূর্ণিমার রাতে।

বিপরীতভাবে যদি পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে একই রেখায় চাঁদ এসে পড়ে তাহলে চাঁদের গায়ে সূর্যের আলো বাধা পায় এবং চাঁদের পিছনে অন্ধকারের শঙ্কু বা ছায়ার সৃষ্টি হয়। এই শঙ্কু পৃথিবীর যে অঞ্চলটিতে এসে পড়ে সে অঞ্চলের মানুষ সূর্যকে একেবারেই দেখতে পায় না। পৃথিবীর সে অঞ্চলটিতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়। কিন্তু আকারে সূর্য অনেক বড় চাঁদ অনেক ছোট এবং পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল। ফলে, পৃথিবীর অল্প অংশই এই ছায়াবৃত শঙ্কুর মধ্যে পড়ে। ফলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হলেও তা দেখা দেয় মাত্র খুব ছোট্ট একটি অঞ্চল জুড়ে। পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সংখ্যাও খুব কম। ভারতে পরবর্তী যে পূর্ণগ্রাসটি দেখা দেবে তা দেখা যাবে ২১৬৮ সালের ৫ জুলাই তারিখে প্রায় ৮৬ বছর পরে।

তুলনায় পৃথিবীতে বিস্তৃত একটি অঞ্চলে চাঁদের উপচ্ছায়া এসে পড়ে। সেখান থেকে সূর্যদেহের এক একটি খণ্ডিত অংশ মাত্র আমাদের চোখের আড়ালে পড়ে সূর্যের বাকি খণ্ডিত অংশটুকুই তখন দেখা যায়। পৃথিবীর সেই সব অঞ্চলে হয় খণ্ডগ্রাস। ১৯৮০-র ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষের একটি বিস্তৃত অঞ্চলে পূর্ণগ্রাস দেখা গেলেও অধিকাংশ অঞ্চলেই খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল (মানচিত্র দেখলে

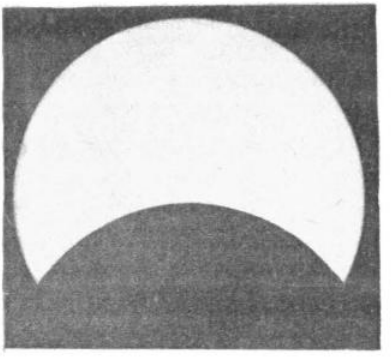

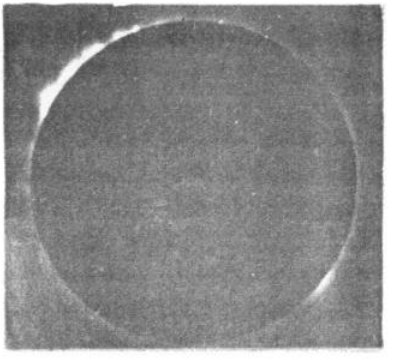

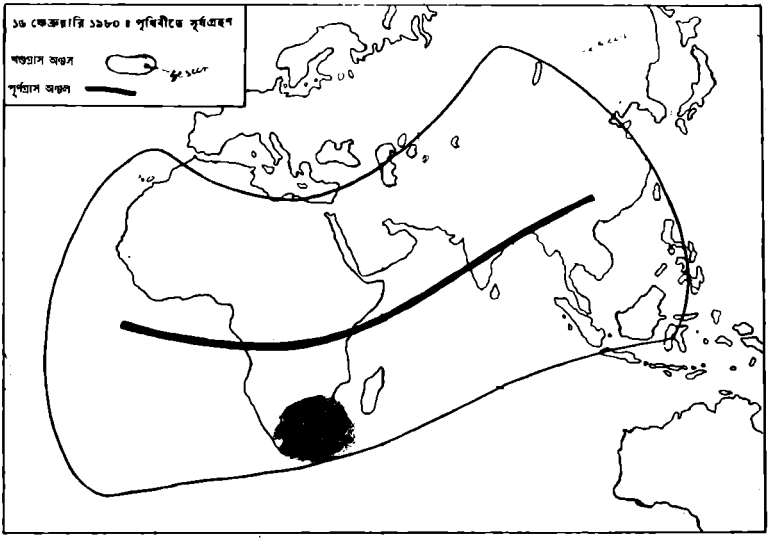

বোঝা যাবে)।

একই রেখায় এবং সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থেকেও চাঁদ যখন তার দীর্ঘতম দূরত্বে থাকে তখন চাঁদের পিছনের অন্ধকার ছায়াবৃত শঙ্কু পৃথিবীতে পৌঁছানর আগেই শেষ হয়ে যায়, পৃথিবীর কোন একটি ছোট্ট অঞ্চলে এসে পড়ে বিপরীত এক শঙ্কু। ফলে সেখানকার মানুষ সূর্যের গোল থালার মত দৃশ্যমান দেহের মাঝে একটি গোলাকৃতি অন্ধকার দেখতে দেয়! চোখে পড়ে ঐ অন্ধকারে চারপাশে থালার মত উজ্জ্বল সৌরদেহ। একে বলে বলয়-গ্রাস। পূর্ণগ্রাস ও বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ খুব কমই দেখা যায়। খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণই আমাদের বেশি পরিচিত।

প্রতিবছর আমাদের এ পৃথিবীতে অধিকপক্ষে চারটি সূর্যগ্রহণ এবং তিনটি চন্দ্রগ্রহণ অর্থাৎ মোট সাতটি গ্রহণ দেখা যেতে পারে—ন্যূনপক্ষে এ সংখ্যা একটি একটি—মোট দুটি গ্রহণ। তবে কখনও বা একই বছরে পাঁচটি সৌর এবং মাত্র দুটি চন্দ্রগ্রহণও দেখা যেতে পারে।

সূর্যগ্রহণ হয় অমাবস্যার দিনে। কিন্তু প্রতি অমাবস্যায় বা প্রতি পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না। এর কারণ পৃথিবী ও চাঁদের অবস্থানের তারতম্য এবং আপন কক্ষে চাঁদের প্রায় পাঁচ ডিগ্রির কৌণিক বক্রতা।

সূর্য বা চাঁদের গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী হয় না—চাঁদ বা পৃথিবীর ছায়া নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে সরে যায় ফলে গ্রহণের অবসানও হয় অল্প সময়ের ব্যবধানে। গ্রহণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হয় তাই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। পৃথিবীতে একজন পর্যবেক্ষকের কাছে ছায়ার সরণ বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৬৭০ কিলোমিটার। এই সরণের মূল কারণ পৃথিবী ও চাঁদের চলমানতা। সূর্যগ্রহণ তাই এক অঞ্চল থেকে একটি বক্ররেখায় এগিয়ে চলে অন্য অঞ্চলের দিকে।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের এক ঐতিহাসিক এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায় খৃস্টপূর্ব চারশো অব্দে চ্যালডিয়ান সারোস নামে পরিচিত এক সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ণ

সূর্যগ্রহণ দেখা দেয় প্রায় আঠার বছরের ব্যবধানে। প্রকৃত হিসাবে যা ২২৩ চান্দ্র-মাস বা ৬৫৮৫ দিন ৭ ঘণ্টা ১২ মিনিট।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ শুধু সাধারণ মানুষের কাছেই নয় বিজ্ঞানীদের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রখর উজ্জলতার জন্য সূর্যকে নিয়ে পরীক্ষা খুব সহজ নয়। পূর্ণ-গ্রাসে সূর্যের উজ্জলতা সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গেলে, দেখা দেয় সৌরকিরীট বা করোণা। করোণার উৎক্ষিপ্ত আলো পরীক্ষা করে জানা যায় অজানা রহস্য সমাধানের নানা সূত্র। **সূর্যদেহের গঠন, খনিজ সম্পদ,** চৌম্বকত্বের কারণ সৌরদেহে রাসায়নিক পরিবর্তন, তাপ-বিকিরণ ও অন্যান্য মহা-জাগতিক বিকিরণের নানান কারণ ও ফলাফল এবং জীবজগতে তার প্রভাব এইসব পরীক্ষা অনেক সহজ হয়।

পূর্ণ সূর্যগ্রাসে তাই হাজার হাজার বিজ্ঞানী তাঁদের শত সহস্র যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা চালান। সূর্যকে যত জানা যাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি, তাপ ও শক্তির উৎপাদন বিকিরণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। পৃথিবীতে এখন শক্তির চাহিদা যত উপাদনের হার তার

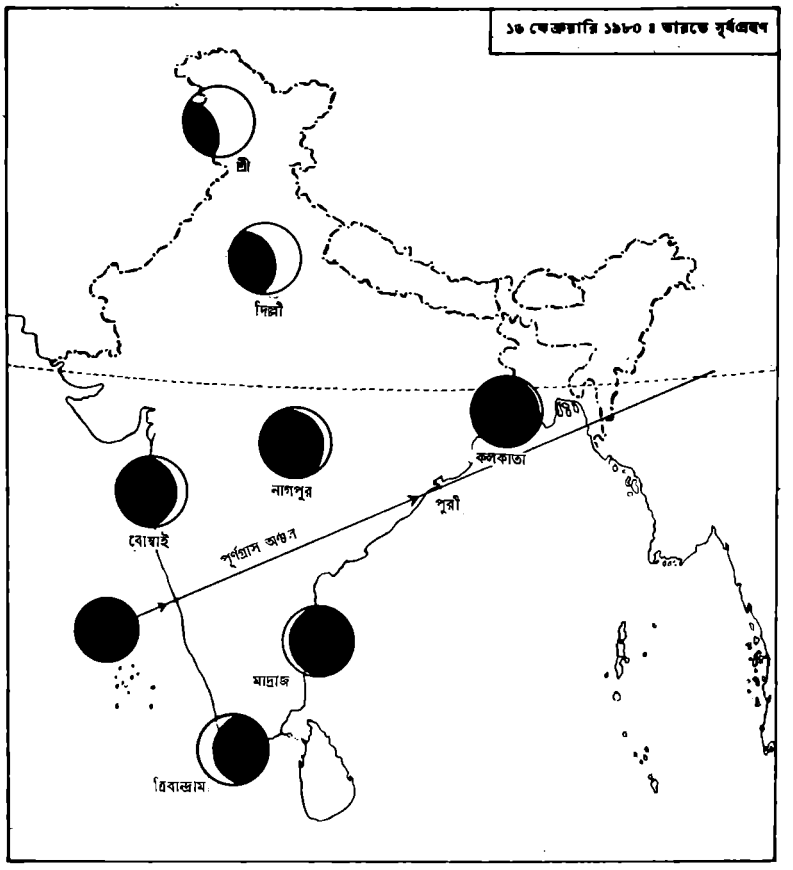

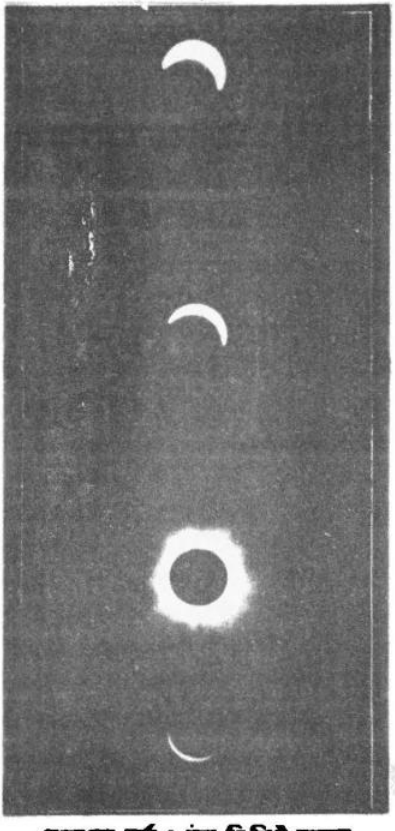

গ্রহণের সূর্য ঃ দশ মিনিট অন্তর তোলা চারটি অবস্থা

তুলনায় অনেক কম। সৌর রহস্যের সমাধান হয়ত মানুষকে একদিন সন্ধান দেবে শক্তি উৎপাদনের নানা কৃত্রিম কলা-কৌশলের। মানুষ তাই বৈজ্ঞানিক অভিযান চালাতে শুরু করে ১৮৫১-র ২৮ জুলাই থেকে, যখন যেখানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা দিয়েছে তখনই।

সৌর অভিযানে নেমেছেন শত শত বিজ্ঞানী। এ শতকের এরকমই একটি বিখ্যাত। অভিযান চালান হয়েছিল ১৯১৯-এর ২৯ মে। সে দিনের পরীক্ষায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রমাণ পেয়ে মানুষের আস্থা বেড়ে গিয়েছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার সূক্ষ্মতা ও সত্যতায়।

১৯৮২-র ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিভিন্ন সৌর অভিযান কেন্দ্রে, পুরী কোনার্ক পালেম এবং হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত ওসমানিয়া অবজারভেটরিতে এসেছিলেন প্রায় দশ হাজার বিজ্ঞানী যাঁদের এক বৃহৎ অংশ ছিলেন বিদেশী। তবে গৌরবের কথা সমগ্র সৌর অভিযান প্রকল্পে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাঙ্গালোর সৌর পদার্থ বিজ্ঞান কেন্দ্রের দুই বিজ্ঞানী ভাইনু বাপ্পু ও জগদীশ ভট্টাচার্য এবং ওসমানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান শাখার প্রধান জাপাল রঙ্গাপুর মানমন্দিরের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কে. ডি. অভ্যঙ্কর।

সূর্য আমাদের পরম আত্মীয়। তাই যখনই এর গায়ে লাগছে কোন ছায়া, বিজ্ঞানীরা দল বেঁধে লেগে পড়ছেন তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে।

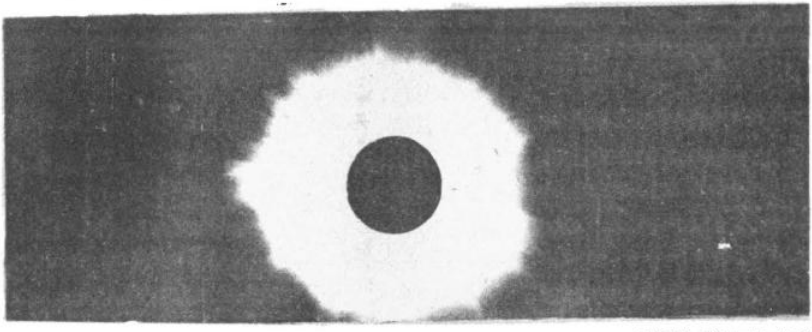

ডিমের খোলায় সূর্যগ্রহণ

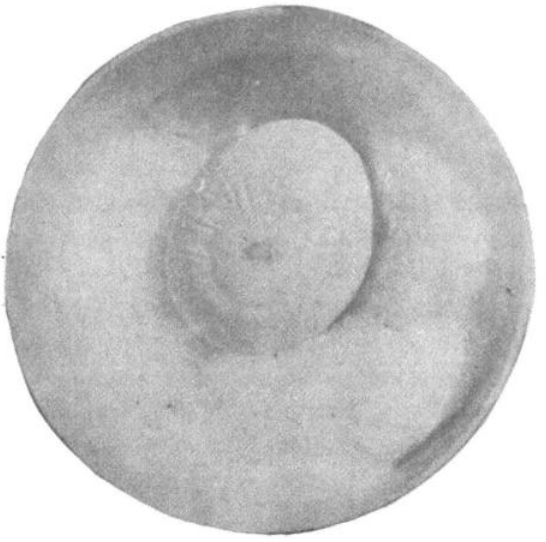

১৯৮২-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি রীতে এক হোটেল মালিকের পোষা এক মুরগী তার জীবনের প্রথম ডিমটি পাড়ে সূর্যগ্রহণ শেষ হওয়ার কিছু পরে। আশ্চর্যজনকভাবে ডিমের খোলায় সূর্যগ্রহণের মত ছাপ দেখা যায়—যেন কোন শিল্পী নিখুঁতভাবে ডিমের খোলের ওপরে খোদাই করে দিয়েছেন গ্রহণ লাগা সূর্যের ছবি।

ডিমটি আমার কাছে আসে এক সপ্তাহ বাদে। নানান কুসংস্কার তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শিলং শহর থেকেও এক মহিলা ডাক্তার আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতেও নাকি একটি মুরগী এরকমই একটি ডিম পেড়েছে যার খোলার ওপরে আছে খণ্ডগ্রাস সূর্যের ছবি।

আমার কাছে যে ডিমটি এসেছিল তার আকার খুবই ছোট, ওজন প্রায় তিরিশ গ্রাম এবং দৈর্ঘ্য মাত্র তিন সেণ্টিমিটার। খোলাটি পাতলা। নাড়াচাড়ায় খানিকটা অংশ উঠে গেছে।

আমি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখেছিলাম—ডিমটিতে কোনও রকম কারচুপি নেই এবং বাইরে থেকে খোদাই করাও হয়নি। আসলে জীবনের প্রথম ডিমটি দেওয়ার সময় মুরগীটির জননদ্বারটিতে অতিরিক্ত সঙ্কোচন হয়েছিল এবং প্রসব মুহূর্তে ডিমের নরম খোলের ওপরে সঙ্কুচিত জননদ্বারের চাপে ঐ ধরনের একটি ছাপ পড়েছিল।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় বহু মুরগী পালন কেন্দ্রে এ জাতীয় অদ্ভুত ছাপওয়ালা ডিম পাওয়া যায়। সূর্যগ্রহণের সঙ্গে এ ধরনের বিস্ময়কর ছাপপড়া নিতান্তই কাকতালীয়।

আজও সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি

মিহির মজুমদার

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সুমেরীয় মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সমসাময়িক সিন্ধু সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল, বৈদিক সভ্যতাই ভারতের সবচেয়ে পুরোন। কিন্তু বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ সালে সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদাড়োতে মাটির নিচে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় একটি অতি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ প্রায় একই সময়ে আবিষ্কৃত হয়। এই দুই লুপ্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবার ফলে ঐতিহাসিকরা নিশ্চিত হন, বৈদিক সভ্যতার অনেক আগে ভারতবর্ষে এক উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল।

ধ্বংসস্তূপ থেকে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য জানা গেছে। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কারণ সিন্ধু অঞ্চলে প্রাপ্ত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হয়নি আজও। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সিন্ধু উপত্যকার মাটি খুঁড়ে দু হাজারের কিছু বেশি সীলমোহর-এর সন্ধান পেয়েছেন। সীলমোহরগুলি সম্ভবত ব্যবসার প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হত। নানা জীবজন্তুর মূর্তি শোভিত ছোট সীলমোহরগুলি এক রকমের শক্ত মাটি দিয়ে তৈরি হত।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা অঞ্চলের অধিবাসীগণ যে কেবলমাত্র এক উন্নত নাগরিক সভ্যতার ধারক ছিলেন তা নয়। তাঁদের মধ্যে শিক্ষারও প্রচলন ছিল। সীলমোহরগুলির উপর উৎকীর্ণ লিপিমালা থেকেই এ কথার প্রমাণ মেলে।

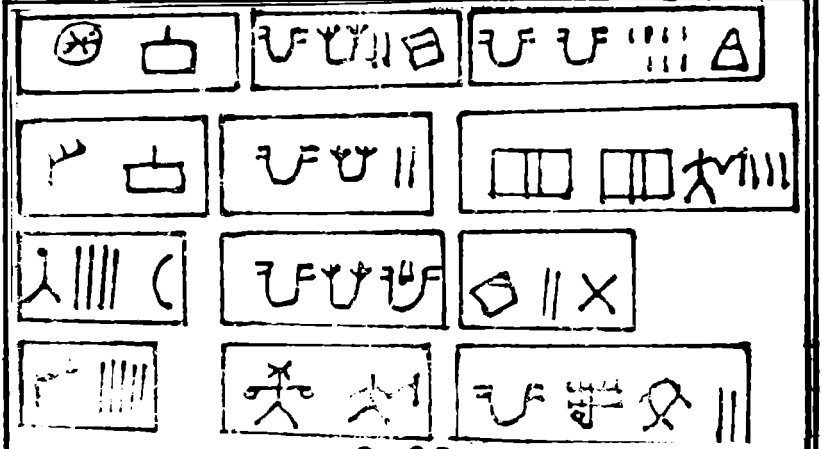

সিন্ধু লিপি

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার পরেই প্রত্নতাত্ত্বিকরা সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন। ১৯২৩ সালে স্বরূপবিষ্ণু প্রথম সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারে ব্রতী হন। এর কিছুদিন পরে ওয়াডেল নামে একজন বিদেশী পণ্ডিত হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহরগুলির লিখন রীতির সঙ্গে সুমেরীয় লিখন রীতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। সি জে গাড নামে একজন পণ্ডিতের মতে—বর্তমানে অধিকাংশ বর্ণমালা যেমন বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পড়ার রীতি—সিন্ধু লিপিগুলি কিন্তু পড়তে হবে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। গাড আরও বলেছেন, লিপিগুলি নামবাচক ও প্রাচীন ইন্দো-এরিয়ান ভাষায় লেখা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও লিপি বিশারদ হাণ্টার সাহেব অভিমত দিয়েছেন, সিন্ধু লিপি থেকেই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছিল। হাণ্টার সাহেবও বলেছেন সিন্ধু লিপিগুলি ডান দিক থেকে ক্রমান্বয়ে বাঁ দিকে লেখা হত। হাণ্টার সাহেব মনে করেন সিন্ধু লিপিগুলি যীশুখ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে লেখা হয়েছিল। আরও যেসব পণ্ডিত সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিলিমরিয়া, এস সি রস, এস কে রাও ও ফাদার হেরাস-এর নাম উল্লেখ্য।

অধ্যাপক বঙ্কবিহারী চক্রবর্তী দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর প্রায় পাঁচশটি সীলমোহরের পাঠোদ্ধার করেছেন। বঙ্কবিহারী চক্রবর্তীর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা হল—সিন্ধু লিপিগুলি আসলে বৈদিক আর্যদের লিপি। লিপিগুলি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে পড়তে হবে। সিন্ধু লিপি থেকেই পরবর্তী কালে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছিল। বঙ্কবিহারী চক্রবর্তী লিপিগুলির অর্থ উদ্ধার করে কিছু কিছু শব্দের হদিশ পেয়েছেন—সুকুমার, শশক, সিন্ধক, পদ্ম, সত্যনাগ,

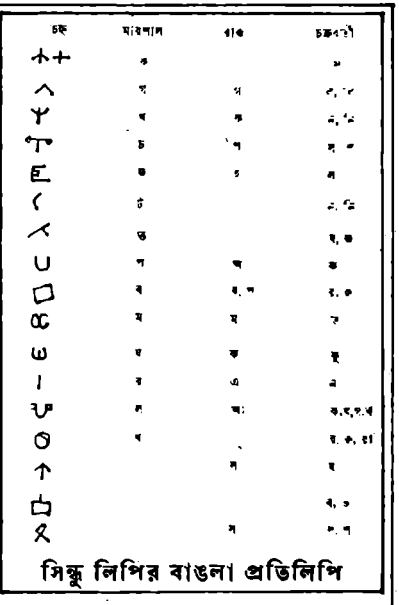

সিন্ধু লিপির বাঙলা প্রতিলিপি

শিশুপাল, সত্যক, কোশল ইত্যাদি। বেদে এবং মহাভারতে অবশ্য পূর্বোক্ত ব্যক্তিবাচক শব্দগুলির বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। সিন্ধু লিপি থেকেই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছিল। সম্রাট অশোকের 'অনুশাসন'গুলি ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা হয়েছিল।

আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন, সিন্ধু অঞ্চলে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলির উপর খোদিত লিপি আসলে দ্রাবিড় লিপি।

সিন্ধু লিপিগুলি কোন ভাষায় রচিত তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বলছেন, লিপিগুলি আর্যলিপি। অন্য দলের অভিমত লিপিগুলি আসলে দ্রাবিড়। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯২২ সালে। ষাট বছর অতিবাহিত হল—এখনও পর্যন্ত সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

প্রাচীন মিশরেও এক ধরনের লিপি

প্রচলিত ছিল। সেগুলি চিত্রলিপি। চিত্রলিপিগুলিকে বলা হত 'হায়ারো-গ্লিফিক্স'। নেপোলিয়নের সৈন্য দল যখন মিশর অভিযান করে—তখন মাটির তলায় তারা একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে পায়। পাথরটিতে হিজিবিজি কি সব লেখা ছিল। সেই পাথরের টুকরোটি ফ্রান্সে নিয়ে গেলে পাথরটি সম্পর্কে পণ্ডিতদের কৌতূহল জাগে। স্যাঁপোলিয়ঁ নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত দীর্ঘ কুড়ি বছর চেষ্টার পর সেই পাথরের উপর খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার করেন। ফলে মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে।

ব্রাহ্মী লিপি, খরোষ্ঠী লিপি ও আরও অজস্র শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেছেন পণ্ডিতরা। কেবল সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি এখনও। বঙ্কবিহারী চক্রবর্তী পাঁচশটি সীলমোহরের পাঠোদ্ধার করলেও তাঁর সিদ্ধান্ত ও অনুমান যে যথাযথ ও নির্ভুল—পণ্ডিতরা সে কথাও বলেননি।

যে দিন সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হবে—সেদিন ভারতের এই প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আরও অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে।

সৌর পরিবারের রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যসংখ্যা সূর্যকে ছাড়া দশ। দশম গ্রহ প্ল্যানেট × নিয়ে অনেক অঙ্ক, তর্কবিতর্ক, জল্পনা চলছে, তাই সে কথায় বেশি না যাওয়াই ভাল।

পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সেটাকে যদি ১ ধরা যায় সেই হিসেবে অন্যান্য গ্রহের দূরত্ব দাঁড়ায় এই রকম: বুধ-০.৩৯; শুক্র-০.৭২; মঙ্গল-১.৬; গ্রহানুপুঞ্জ-২.৮; বৃহস্পতি-৫.২; শনি-৯.৫৪; ইউরেনাস-১৯.২; নেপচুন-৩০.০; প্লুটো-৩৯.০; প্ল্যানেট × ৬৫.৫ এবার সবার পরিচয় সারণীর আকারে দেওয়া যাক:—

গ্রহ	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (মাইল)	গড় ঘনত্ব (গ্রাম/সি. সি)	ব্যাস (মাইল)	সূর্যকে আবর্তনের সময়
বুধ	৩.৫৫ কোটি	৬.১	২৯০০	৮৮ পার্থিব দিন
শুক্র	৬.৭০ ,,	৫.০৬	৭৬০০	২২৪ ,, ,,
মঙ্গল	১৪.১৫ ,,	৪.১২	৪২০০	৬৮৭ ,, ,,
বৃহস্পতি	৪৮.৩০ ,,	১.৩৪	৮৬০০০	১১ পার্থিব বছর ৯ পার্থিব মাস
শনি	৮৮.৬০ ,,	০.৭	৭১০০০	২৯ ,, ,, ৬ ,, ,,
ইউরোনার্স	১৮০.০০ ,,	১.৩৬	৩১০০০	৮৪ ,, ,,
নেপচুন	২৭৯.৩০ ,,	১.৩২	৩৩০০০	১৬৫ ,, ,,
প্লুটো	৩৬৬.৮৫ ,,	জানা যায়নি	৪২০০ (প্রায়)	২৪৮ ,, ,,
×	৬০৯.৩০ ,,	জানা যায়নি	২১৩০০০	৬০০ ,, ,,

বিদ্যালয় পরিচিতি

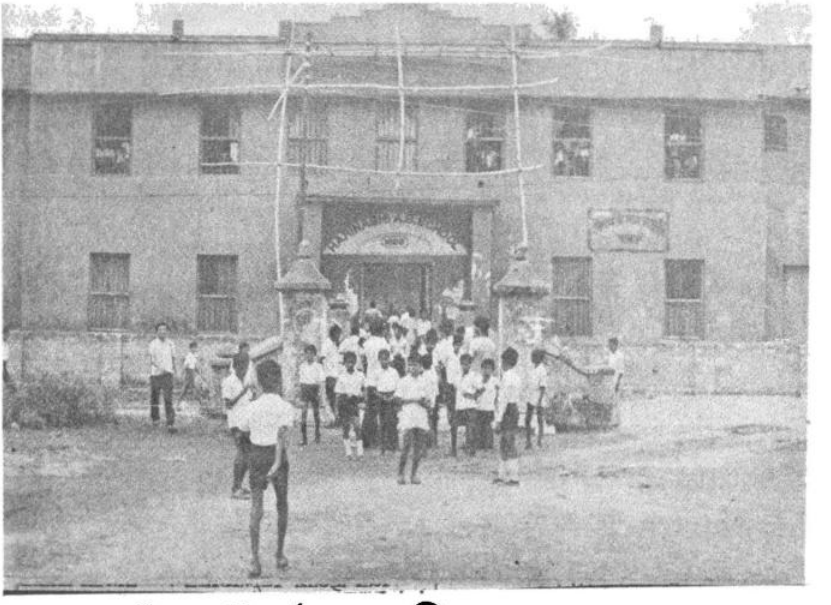

হরিনাভি ইংরাজী-সংস্কৃত স্কুল

সুহাস মজুমদার

গ্রীষ্মের দুপুর। বাস থেকে নামতেই নাকে এল তেতে ওঠা মাটির তামাটে গন্ধ। সদর রাস্তা ধরে এগোতে গিয়ে মনে পড়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগণার আলিপুর মহকুমার এই হরিনাভি গ্রাম দিয়ে কয়েকশ বছর আগে বয়ে যেত আদি গঙ্গার দুর্বার ধারা, যার তীরে একদিন গড়ে উঠেছিল দক্ষিণবঙ্গের কর্মচঞ্চল বন্দর ছত্রভোগ। শ্রীচৈতন্যদেব এই আদিগঙ্গার কোল ঘেঁষে হাঁটা পথে ছত্রভোগ বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফাল্গুন।

পরবর্তীকালে মজে যাওয়া আদিগঙ্গার উপরেই গড়ে ওঠে জনাকীর্ণ হরিনাভি গ্রাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলটি নতুনভাবে জেগে ওঠে। এখান থেকে বাঙলা ভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' লিখে নাটুকে রামনারায়ণ বিখ্যাত হন (১৮৫৪)। এর চার বছর বাদে (১৮৫৮) 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'সোমপ্রকাশ'-এর আবির্ভাবের আট বছর বাদে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় ও আদর্শে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন হরিনাভি ইংরাজী-সংস্কৃত স্কুল যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্টি করেছিল এক অনন্য ইতিহাস।

প্রধান শিক্ষক শ্রীআনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়

সেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী মেটে লাল রঙের স্কুলটিতে ঢুকতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম বর্তমান প্রধান শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র আনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের। উনি ১৯৫৪ সাল থেকে হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। ১৯৭৭ সাল থেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন।

আগে এই স্কুলটির নাম ছিল রাজপুর অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল। ১৮৬২ সালে রাইচরণ ঘোষ নামে এক ছাত্র এখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন এর সচিব ছিলেন জমিদার গোলক ঘোষ। স্কুলটি কিছুদিন চলার পর পরিচালকদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় গোলোক নাথ ১৮৬৫ সালে স্কুলটি নিজের বাড়িতে স্থানান্তরিত করেন।

পরে ১৮৬৬ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর চাংড়ীপোতার বাংলা বিদ্যালয়টি তুলে নিয়ে আসেন হরিনাভি গ্রামে। বর্তমান বাড়িটি পঞ্চানন ঘোষের কাছ থেকে ১৭ টাকায় ভাড়া নিয়ে নতুন স্কুলের নামকরণ করেন 'হরিনাভি ইংরাজী-সংস্কৃত স্কুল'। সেদিনের ছোট্ট বাড়িটি ঘিরেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল মনীষী ও মনীষার যুক্তবেনী।

১৮৬৬ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মাত্র ১৭ জন ছাত্র নিয়ে স্কুলটির সূচনা করেন। আজকে যেখানে বিশাল ত্রিতল বাড়ি, সেখানে তখন খানকয়েক অপরিসর ঘর। ক্লাস চলত মাদুর পেতে। শিক্ষকরা বিনা বেতনে ছাত্র পড়াতেন।

এখন প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক মিলিয়ে মোট

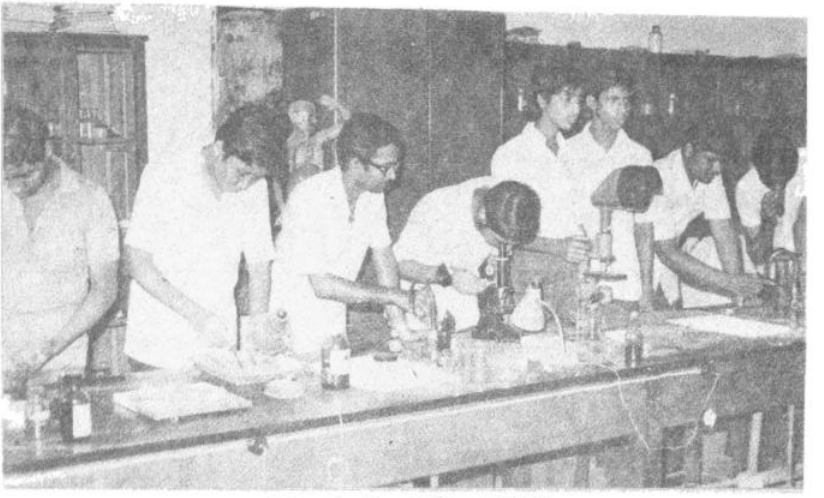

গবেষণাগারে কর্মরত ছাত্ররা

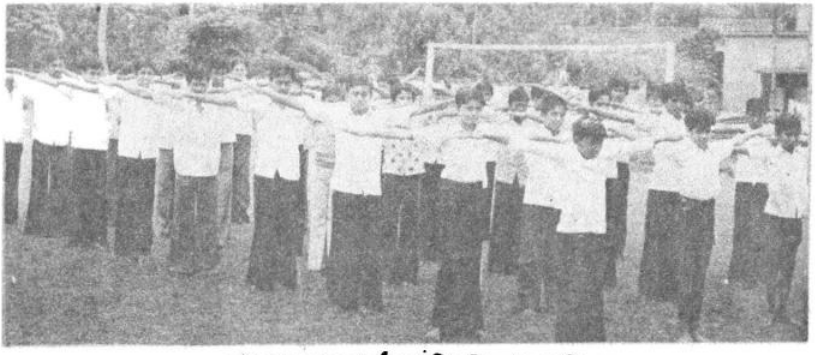

স্কুল সংলগ্ন মাঠে শারীরশিক্ষার প্রশিক্ষণ

ছাত্র-ছাত্রী ১৪০০। একেকটি সেকশানে গড়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশজন ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলিয়ে মোট ৩৯ জন।

প্রধান শিক্ষক আনন্দবাবুকে প্রশ্ন করলাম, এত ছাত্র অথচ শিক্ষক কম, ফলে ছাত্ররা কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না?

উত্তর ঃ না, তা হচ্ছে না। তার প্রমাণ এই স্কুল থেকে বহু ছাত্র একাধিকবার স্ট্যাণ্ড করেছে। পেয়েছে বহুবার জাতীয় মেধা বৃত্তি। পাশের হার বরাবরই ভাল। গত বছরও ৯০ পার্সেণ্ট ছেলে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে। এবারের (১৯৮২) মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৮ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তার মধ্যে ১২ জন প্রথম বিভাগে, ৪২ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২৩ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে। ১ জন পেয়েছে কম্পার্টমেণ্টাল। ১৯৭৯ সালে আমাদের স্কুলের ছাত্র নভোদীপ্ত শীল উপাধ্যায় ৮৮২ পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল।

প্রশ্ন ঃ ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আপনারা কিভাবে যত্ন নেন?

উত্তর ঃ আমরা প্রত্যেক ছাত্রকে ভাল-ভাবে টেক্সট্‌টা পড়তে বলি। টেক্সট বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তৈরি করে দিই কিছু কিছু প্রশ্নের ভাল উত্তর। পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে আমরা নির্দেশ দিই রেফারেন্স বই ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা পড়ার। আর এই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার নিয়মিত অভ্যাসও গড়ে তোলা হয়। এছাড়া আমরা প্রত্যেক অভিভাবকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা যে সব বিষয়ে দুর্বল, স্কুল ছুটির পর, বিশেষত স্কুল ও বোর্ডের পরীক্ষার আগে, সেই সেই বিষয়ে স্পেশাল কোচিং ক্লাস নেওয়া হয়।

জীবনের চরমোচ্ছ্বাস মানসিক শক্তিতে; ইহারই বলে এই পুণ্যদেশ সঞ্জীবিত রহিয়াছে; হরিনাভি ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থানীয় যুবকবৃন্দকে এই শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া জগতের অগ্রিময় কর্মশালে নিক্ষেপ করুক।

—জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞানের বিষয়গুলো প্রসঙ্গে প্রায় একই কথা জানালেন আনন্দবাবু, একটা বই ভালভাবে না পড়ে পাঁচটা বই পড়ে কোন লাভ হয় না। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে লেখাতেও। লেখার পর মাস্টার মশাইরা যে ভুলগুলো শুধরে দেন তা মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কটা এমন

সহজ করে নিতে হবে, যাতে ছাত্র তার ভুলটা শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিতে ভয় না পায়।

ছাত্রদের কথা মনে রেখে নানান ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আট-দশ হাজার বই নিয়ে গড়ে উঠেছে এ স্কুলের চারুচন্দ্র পাঠাগার। ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান আর রসায়ন বিজ্ঞান সমেত তিন তিনটি বিশাল ল্যাব-রেটারি, যেখানে রয়েছে ব্যবহারপযোগী সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি। এ সব এসেছে স্কুলের নিজস্ব টাকা আর স্থানীয় বিদ্বজ্জনের সানুগ্রহ অনুদানে।

নতুন সিলেবাস অনুযায়ী কর্মশিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা। স্কুল সংলগ্ন মাঠে ছাত্ররা নিয়মিত খেলাধূলা ও শারীরশিক্ষার প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। প্রতি বছর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররাই জেলা স্পোর্টস-এ যোগদান করে অনায়াসে অধিকার করে নেয় কোন না কোন স্থান। আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপেও এখানকার বহু ছাত্র যোগ দিয়ে বরাবর ভাল ফল করে আসছে।

হরিনাভি স্কুলের আরেকটি অসাধারণ ব্যাপার হল বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিতর্ক, আবৃত্তি, গান, নাটক, আলোচনা নিয়ে বছরের বিশেষ দিনটি মুখর হয়ে ওঠে ছাত্রদের অংশগ্রহণে। এই স্কুলের প্রাক্তন ও প্রাচীন ছাত্রদের স্মৃতিতে আজও উজ্জল হয়ে আছে তাঁদের দেখা প্রতি বছরের অনুষ্ঠানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীদের সহাস্য সাহচর্যধন্য রবীন্দ্রমঞ্চ আজও ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে তার বক্ষপট।

হরিনাভি স্কুল চিরকাল শুধুমাত্র সেরা ছাত্র তৈরি করেনি, করেছে সেরা মানুষও। ১৯০৭ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য রাজপুর বাজারে আসেন, তখন এই হরিনাভি স্কুলের ছাত্র পরবর্তীকালের বিশ্ব-বিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ও হরিকুমার চক্রবর্তী তাঁর ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া খুলে গাড়ি নিজেরাই টেনে আনেন হরিনাভিতে। এখানে পড়ার সময় সুরকার সলিল চৌধুরী যোগ দেন গণনাট্য সংঘে।

একদিন এই স্কুলেই শিক্ষকতা করে গেছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাবা প্রকাশ-চন্দ্র রায়। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় হরিনাভির পাশের গ্রাম নিশ্চিন্দা-পুরকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' ও রাজপুরের ভাঙা নাটমঞ্চে বসে 'কেদার রাজা' লেখেন।

স্কুলে ঢোকার সময় দেখেছিলাম কয়েকটি নতুন ঘরের কাজ চলতে। সেকথা জানাতে আনন্দবাবু বললেন, ছাত্রদের বসবার সমস্যার জন্য নতুনভাবে কয়েকটি ঘর তুলতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও ঘরের প্রয়োজন হবে। ছাত্র ভর্তির সমস্যা মেটাতে এখন আমাদের অনেক কিছুই ভাবতে হচ্ছে।

একশ বছর আগে যে বীজ দ্বারকানাথ রোপণ করেছিলেন একশ বছর পেরিয়ে এসে আজ তা মহীরুহ। যার ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছে অসংখ্য কৃতি ছাত্র-ছাত্রী।

ছবি ঃ অচিন্ত্য রায়

বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র খাদ্য

সমীরণ মুখোপাধ্যায়

কথায় আছে 'পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়'। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে এ কথাটির আংশিক সত্যি হলেও সব-ক্ষেত্রে নয়।

ডাল, ভাত, তরকারি, মাছ খেতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু যদি শোনা যায় যে সমস্ত বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ আমরা দেখলেই ভয়ে শিউরে উঠি সেগুলিকেই এক শ্রেণীর মানুষ পরম আনন্দে ভক্ষণ করছে, তবে? নিশ্চয়ই অবাক হবার মত কথা। কিন্তু ঘটনা সত্যি। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের গভীর অরণ্যে এক শ্রেণীর মানুষ বাস করে। যাদের নাম দেওয়া হয়েছে বুশম্যান। এরা নিশ্চিন্ত মনে জঙ্গলের বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ খেয়ে হজম করছে। এ খাওয়া কেন? আসলে যে জায়গায় এরা বাস করে সেখানে ডাল, ভাত, তরকারি কিংবা উপাদেয় খাদ্যের কথা ভাবাই যায় না। তাই বাধ্য হয়ে উদরপূর্তির জন্য ওদের কীট-পতঙ্গ চিবিয়ে কিংবা সিদ্ধ করে খেতে হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি প্রদেশের কথাই ধরা যাক। আমাদের কাছে বেড়ালের কতরকম আদুরে নাম ডাক আছে। কেউ বলে মিনি, কেউ বলে পুষি। কেউ আবার আদর করে ডাক পাড়ে সোহাগী বলে। বেড়ালকে আদর করে বিছানায় নিয়ে বসা কিংবা দুধ খাওয়ান অনেক পরিবারের বড়সড় শখ। অথচ দেখ এই বেড়ালকেই কেটে কুটে কাবাব বানিয়ে খাচ্ছে চিলি প্রদেশের কিছু উপজাতি।

শুধুই কি বেড়াল? চিলির উপজাতি মানুষজন বেড়ালের পাশাপাশি ঘরে পুষে রাখে ভেড়া ও গরু। উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে মুখ পাল্টানো।

ইন্দোচীনের মানুষের খাওয়ার তালিকা আরো বিচিত্র। সেখানে এক শ্রেণীর মানুষ সকাল থেকে রাত্রি ঝোপে-ঝাড়ে ছোট বড় কৌটো হাতে ঘোরে। সতর্ক চোখ থাকে গাছের ডালপালা কিংবা জলের দিকে। সবুজ রঙের ফড়িং একবার নাগালের মধ্যে এলে আর রক্ষে নেই। খপ করে ধরে পুরে ফেলে কৌটোর মধ্যে। তার-পর ঘরে ফিরে জড় করা ফড়িং

দিয়ে রাঁধা হয় রোস্ট। ওদেশের লোকেরা ফড়িং-এর রোস্টকে যথেষ্ট কদর দেয়। নামী-দামী কোন অতিথি এলে সবুজ চায়ের সঙ্গে এক রেকাব ভর্তি ফড়িং রোস্ট মুখরোচক খাদ্য। ইন্দোচীনে দেখা গেছে এই সবুজ ফড়িং ধরা যেন একটা উৎসব। ছুটি পেলেই ছেলে-বুড়ো সব দল বেধে বেরিয়ে পড়ে ফড়িং-এর খোঁজে।

ইন্দোচীনের লোকেরা ফড়িং-এর পাশাপাশি আরেকটি প্রাণীকে খুব ইজ্জৎ দেয়। সেটি ব্যাঙ। আমাদের দেশে ভরন্ত বরষায় যাদের সর্বত্র অবাধ গতিবিধি। সেই ধেড়ে ব্যাঙ ইন্দোচীনের লোকেরা খুব তারিয়ে তারিয়ে খায়।

শুধু ইন্দোচীনে কেন, ফ্রান্সের কিছু কিছু অঞ্চলেও ব্যাঙের ঝোল এবং কাবাবের খুব কদর। ব্যাঙের শুটকি বিক্রি করে গরীব মানুষ সংসার চালায়। চীনের পাহাড়ী উপত্যকায় মানুষজন এক ধরনের পাখির বাসা ভেঙে খায় তাদের নৈশ আহারে।

পঙ্গপালের নাম অনেকের জানা, এই হিংস্র জীবটির কথা বেশি মনে থাকে গ্রাম-গঞ্জের কৃষকের। ফসল ভরা খেতে পঙ্গপাল ধেয়ে এলেই মাথায় বাজ পড়ে তার। অথচ এই পঙ্গপাল আফ্রিকার আদিম বাসিন্দাদের কাছে সাক্ষাত ভগবান। কেন জান? পঙ্গপাল দলের উড়ে আসার মুহূর্তকে ওরা বুঝতে পারে। তখনই প্রস্তুতি নেয় বাঁশের খাঁচা বসানর। ঝাঁক ঝাঁক পঙ্গপাল সেই খাঁচায় আটকে পড়ে। আনন্দে নেচে ওঠে মন। কেননা খাঁচায় আটক পঙ্গপাল আগুনে ঝলসিয়ে খাওয়ার যে আনন্দ সে আনন্দ ওদের আর কে দেবে?

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের গভীর অরণ্যের মাঝে বাস করে এক শ্রেণীর আদিম উপজাতি। জঙ্গলের পশু শিকারই এদের বাঁচার পথ। পশু পাওয়া না গেলে উপায়? আছে বৈকি। বিষাক্ত গিরগিটি, বড় শুঁয়োপোকা কিংবা লম্বা কেঁচো সেদ্ধ করে এরা বুনো লতাপাতা দিয়ে খায়।

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে এক শ্রেণীর আদিম মানুষ আজও মানুষ শিকার করে। মাংস খাবার আশায়। বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মানুষকে শেষ করে

এরা মৃতদেহ আগুনে ঝলসে নেয়। তারপর চলে ভোজন উৎসব। যদিও মানুষখেকোর দল আজ ক্রমশ লুপ্ত হচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এক শ্রেণীর বাসিন্দারা উইপোকা খেতে খুবই পটু। ঘরের কাছে উইপোকার বাসা দেখলে আর রক্ষা নেই। এক নিমেষে বাসা ভেঙে ওরা মুঠো মুঠো উইপোকা সাবাড় করে দেয়। কেউ কেউ আবার আগুনে ঝলসে নিয়েও খায়।

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা আমরা ভূগোলেই পড়েছি। ওরা এক ধরনের হলুদ পিঁপড়ে রান্না করে খায়। এইসব পিঁপড়ের পেটে এক রকম অম্ল থেকে মিষ্টি রস থাকে। যেগুলি রান্না হলে স্বাদই পাল্টে যায়। রেড ইণ্ডিয়ানরা এই পিঁপড়ের নাম দিয়েছেন 'হ্যাপি অ্যাণ্ট'। আমরা যেমন আলু-ভাতে, ডালভাতে চটকে খাই এরাও এইসব মিষ্টি পিঁপড়ে খাবারের সঙ্গে চটকে খেয়ে থাকে। তাতে নাকি খাবার সুস্বাদু হয়।

গ্রীণল্যাণ্ডের এস্কিমোদের কথা অনেকেই জানে। বরফে ঢাকা এই মহাদেশের মানুষের খাবার কি জান? সীল মাছ, ভালুক কিংবা বলগা হরিণের মাংস। এছাড়া উপায়ই বা কি। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষ তার খাবার বেছেই চলেছে।

ছবি এঁকেছেন
জি সান্তা

সৌরকথা

সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সূর্যও তাল মিলিয়ে ঘুরছে। আর সৌর জগতের কাছে সূর্য যতই মহিমময় হক না কেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে সূর্য অতি সাধারণ একটি নক্ষত্র। তাই সূর্যকে তার সমগ্র সৌরজগতসহ ছায়াপথ কেন্দ্রের চতুর্দিকে একটি বৃত্তাকার পথে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। পৃথিবী তার অক্ষের চারিদিকে আবর্তনে প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল বেগে ২৪ ঘণ্টায় একবার সম্পূর্ণ আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সূর্যের সেকেণ্ডে ১৫০ বেগেও একবার ঘুরতে সময় লাগে ২৬ দিন। সূর্যকে কেন্দ্র করে একপাক ঘুরে আসতে লাগে ৩৬৫ দিন বা ১ বছর; কিন্তু সূর্যের ছায়াপথকে কেন্দ্র করে এক পাক ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় ২০ কোটি বছর। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, পৃথিবীর ২৬ দিনে সূর্যের ১ দিন আর পৃথিবীর কুড়ি কোটি বছরে সূর্যের এক বছর।

বুদ্ধির খেলা

নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন সমস্যার জট খোলার মজা আলাদা। 'বুদ্ধির খেলা' বিভাগের অবতারণা এইজন্যই। সময় প্রতি প্রশ্নের জন্য ২ মিনিট। না পারলে, আরও তিন মিনিট। পারলে আমাদের জানাও। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও উত্তর প্রকাশ করা হবে আগামী দ্বিতীয় সংখ্যায়।

১। লুপ্ত সংখ্যাটি বসাও।

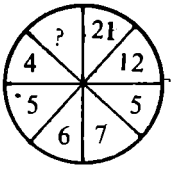

২। ...চিহ্নিত জায়গায় এমন একটি বর্ণ বসাও যাতে পাঁচটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।

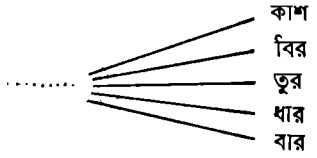

৩। দলছুটটিকে বার কর :

বল কেন দলছুট ?

রথ	মোটর	বাস	ট্রেন	স্লেজ

৪। ...জায়গায় দুটি মাত্র বর্ণ বসিয়ে পাঁচটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি কর।

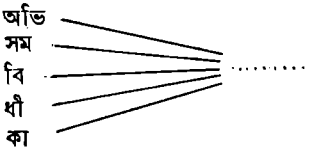

৫। যে কোন তিনটি কাঠি সরিয়ে দ্বিতীয় ছবিটি তৈরি কর (এঁকে দেখাও)

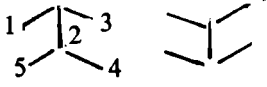

১৬ জুন ৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধির খেলার উত্তর

১. যাত্রী পায়রা—এরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

২. অস্ট্রিচ।

৩. শকুন—বাকিরা উড়তে পারে না। শকুন পারে।

৪. জলহস্তী—বাকিরা মাংসাশী।

৫. সূর্যমুখী—এর বীজ থেকে তেল সংগৃহীত হয় যা আমাদের ব্যবহারে লাগছে।

৬. ওরাংওটান—বাকিরা সবাই কাল্পনিক জীব।

৭. শুঁয়াপোকা—বাকিরা সকলেই টিকটিকি শ্রেণীর জীব।

৮. অস্ট্রেলিয়া—ক্যাঙ্গারু, কাকাতুয়া।
আফ্রিকা—ওকাপি, গরিলা।
আমেরিকা(দক্ষিণ)—লামা আলপাকা।

সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

প্রথম উত্তরদাতা : চঞ্চলকুমার ঘোষ। নৈহাটী। নূপুর কর, ঝাড়বনী। দীপশংকর ও রূপশংকর ভট্টাচার্য, ফতেসিংপুর। মৃত্যুঞ্জয় মর্দন্য, পুরুলিয়া। পার্থসারথি দাস, বাঁকুড়া। গৌতম দত্ত, জলপাইগুড়ি। প্রমুখ ভট্টাচার্য, নববারাকপুর। মোম ও গৌতম সরকার, বিরামপুর। চন্দন রায়, হরাদিত্য। পিকু পাল, মুথাডাঙ্গা। অনিন্দিতা সিংহ, তমলুক।

(৭)

যতদিন না যোগ্যজনের ওপর এই ভার ন্যস্ত হচ্ছে ততদিন ব্যয় প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশান্বিত হওয়ার নয়। যোগ্য-জন বলতে আমি বনবিভাগের কর্মচারীদের কথা বলছি না। বলছি ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের কোন কোন হর্তাকর্তাদের কথা।

বন সংরক্ষণ ও চোরা-শিকার সম্পূর্ণ রোধ করা শুধুমাত্র আর্ম-চেয়ার কনসার্ভেশন এক্সপার্টদের দ্বারা বোধ হয় সম্ভব হবে না।

আবার হাজারীবাগের কথাতেই ফিরে আসা যাক। গভীর জঙ্গল বলতে যা বোঝায়, তা হাজারীবাগে নেই বললেই চলে। কিন্তু সাঁওতাল পরগণার এই জেলার মত স্বাস্থ্যকর খুব কম জেলাই আছে। আমি যতদিন থেকে দেখছি তাতে হাজারীবাগ জেলায় হাতি, বাইসন ও বড় বাঘ অন্যান্য জায়গা থেকে অপেক্ষাকৃত কম আছে বলেই মনে হয়েছে। অবশ্য তার কারণ হাতি বাইসনের যোগ্য জঙ্গলও এ জেলাতে কম। তবে পাখি, বিশেষ করে ময়ূর, বন-মুরগী, তিতির, আসকল, বটের, এবং কালো-তিতির হাজারীবাগ শহরের আশেপাশের জঙ্গলেই যা দেখেছি, তা খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়।

গোপাল ছিল কালি-তিতিরের যম। কান-খাড়া করলেই ও কালি-তিতিরের ডাক শুনতে পেত। এবং শোনামাত্রই তখনকার সবেধন নীলমণি তার আটাশ ইঞ্চি ব্যারেলের দোনলা ম্যাণ্টন বন্দুকটি হাতে করে শালের চারা এবং অন্যান্য ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেত। খালি হাতে ফিরে আসার পাত্র ও ছিল না। ফ্লাইং শট-এর হাতও ছিল খুবই ভাল গোপালের।

তবে ফ্লাইং-শট অনেককেই নিতে দেখেছি। গোপালের বিশেষ বন্ধু এবং আমাদের বন্ধু ছিল হাওড়ার দাশনগরের আলামোহন দাশের মেজছেলে প্রভাত দাশ। রবি ও চাঁদু, প্রভাতের দুই ছোট ভাইও ছিল প্রভাতের শিকারের সাগরেদ। প্রভাতের একটাই দোষ শিকার দেখলে সামলাতে পারত না। রীতিমত হত্যা-লীলা করে ফেলত মাঝে মাঝে। এই কারণে গোপালের সঙ্গে অনেক সময়ই প্রভাতের মনোমালিন্যও ঘটত। তবে বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি কখনও।

প্রভাত, অতি অল্প বয়সে তিন-চার দিনের জ্বরে হঠাৎ মারা যায়। ওর মৃত্যু যে কত লোকের বুকে বেজেছিল তা বলার নয়। পাঁচ মিনিটের জন্যেও যার সঙ্গে ওর পরিচয় ঘটেছিল সেও ওর জন্যে

চোখের জল না ফেলে পারেন।

প্রভাতদেরও একটি সুন্দর বাড়ি আছে হাজারীবাগের ক্যানহারী হিল রোডে সুব্রতদের বাড়ি ছাড়িয়ে। নাকটা-হাঁস মেরে যখন ও দড়িতে লাইন দিয়ে ঝুলিয়ে আমাদের ডেকে পাঠাত দেখাবার জন্যে, গোপাল চটে যেত এত পাখি মারার জন্যে। বীটিং-শিকারে গিয়েও তিতির আর বন-মোরগ মেরে ছয়লাপ করে দিত প্রভাতেরা তিন ভাই। পাখি যদি ফ্লাইড হয়ে বেরত এবং উড়ত একবার তবে সে পাখির প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

ওদের তিন ভাইয়েরই হাত এত ভাল হওয়ার নেপথ্যে ওদের অধ্যবসায় ছাড়াও সুযোগ সুবিধারও অভাব ছিল না। দাশনগরে একটি গান-ক্লাব করেছিল ওরা। তাতে স্কীট-এবং ট্র্যাপ শুটিং-এর বন্দোবস্ত ছিল। গোপালের সঙ্গে একদিন সেই ক্লাবে ওদের ট্র্যাপ, ও স্কীট শুটিং প্র্যাকটিস দেখতেও গেছিলাম। স্কীট ও ট্র্যাপ শুটিং রাজা-রাজড়া ছাড়া সাধারণের পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব। সে কারণে, ভারতের নানা রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে মেলামেশাও ছিল ওদের। এবং রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে মেলামেশা থাকার কারণেই হয়ত শিকার করা পাখি বা পশুর সংখ্যার পরিমিতি জ্ঞান তাঁদেরই মত হয়ে গেছিল প্রভাতের। শিকার যখন দেশে পর্যাপ্ত ছিল, তখন অপর্যাপ্ত শিকার দোষের ছিল না হয়ত। কিন্তু আজকে নিয়ম-ভাঙা শিকারের আর কোন অবকাশই নেই কারও পক্ষেই। তা তিনি রাজা বা প্রজা যিনিই হন।

প্রভাতের কথাতে প্রণবের কথাও মনে পড়ে। প্রণব রায়। আসানসোলের নর্থব্রুক কলিয়ারির। প্রণবের হাতও ভাল ছিল স্কীট ও শুটিং-এ। প্রণব নাম করা বিগ-গেম শিকারিও ছিল। মধ্যপ্রদেশের পান্নার কুখ্যাত ম্যান-ইটিং লেপার্ড মারতে গেছিল ও। যদিও ওর হাতে মারা পড়েনি সে বাঘ—তবে সেই বাঘের খাল খরিয়াত ও হরকৎ-এর খবর প্রণবের কাছেই পুরোপুরি পেয়েছিলাম।

আমি তখন অফিসের কাজে দিল্লীতে ছিলাম। প্রভাত, প্রণব ওরা সকলে দিল্লীতে গেছিল অলিম্পিকের স্কীট ট্র্যাপের ট্রায়ালের জন্যে। প্রায়ই প্রভাত এসে হাজির হত আমাদের হোটেলে। তিন-চারদিন আমরা ওদের ট্রায়াল দেখতেও গেছিলাম। ওখানে প্রভাত আর প্রণবই বিকানীরের মহারাজা কোটার মহারাজা, যোধপুরের কুমারসাহেব, বিকানীরের রাজ-কুমারী (যিনি এখন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন) সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আমাদের। রেঞ্জ ছিল জনপদ থেকে বহু দূরে। অনেক টাকা ট্যাক্সি ভাড়া লাগত আমাদের। ফেরার সময় প্রভাত আর প্রণবের সঙ্গে প্রত্যেকদিন কোটার মহা-রাজার মস্ত এয়ারকণ্ডিশানড গাড়িতে ফিরে আসতাম। চমৎকার বিনয়ী মানুষ। কিছুদিন আগে মারা গেছেন। প্রভাতের কথা মনে পড়তেই এত কথা ভীড় করে এল। কিছু কিছু মানুষ থাকে সংসারে, যারা চলে গিয়েও প্রচণ্ড জীবন্তভাবে বেঁচে থাকে। প্রভাত দাশ সেই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে একজন।

হাজারীবাগের কাছেই, সীমারীয়ার রাস্তায় বনাদাগ বলে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা কাঁচা লাল মাটির খোয়াইয়ের মত পথ, ঝাঁটি-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে বোকারো নদী পেরিয়ে কোসমা বলে একটি গ্রামে। এই কোসমা গ্রামে বন্দুক হাতে ছেলেমানুষ-আমাদের কত স্মৃতি যে জড়িয়ে আছে তা বলার নয়।

হাজারীবাগ শহরের বাজারের মধ্যে

একটি মসজিদ আছে। তার সামনে দিয়ে চলে গেছে ধূলিধূসরিত কাঁচা রাস্তা। রোটি-কাবাবের দোকান এবং অন্য দোকান। সেই পথে একটি ছোট দোকান ছিল জুতো-কাম বন্দুকের। দোকানের নাম ছিল

'বেঙ্গল ফ্যান্সী স্টোর'। মালিক, মহম্মদ নাজিম। মহম্মদ নাজিমের শিকারের খুব শখ ছিল এবং বিবির প্রচণ্ড আপত্তি ছিল সেই শখে। বিবিকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে তিনি কোসমাতে কিছু ক্ষেতি-জমিন নিয়ে সেখানে 'মহৎ' চাষ-বাস করতেন। প্রতি শনিবার বিকেলে হাজারীবাগ থেকে কোসমা গিয়ে সোমবার সকালে আবার হাজারীবাগে ফিরতেন। বনাদাগ অবধি সাইকেল-রিক্সা করে গিয়ে, সেখান থেকে মাইল আড়াই হন্টন মারতে হত বন্দুক এবং মালপত্র কাঁধে করে। বিবি জানতেন স্বামী চাষ-বাসে লিপ্ত আছেন। চাষ-বাস হত ঠিকই, কিন্তু সেই চাষের ফসল ঘরে আসত না। মটর সিম্মি লাগান হত খরগোশের জন্যে। কুলথী আর অড়হড় বোনা হত সম্বরদের জন্যে। এক পাশে কচি দুর্বাঘাস লাগান হত কোটরা হরিণের জন্যে। কচু কন্দমূল ইত্যাদিও ভোগে লাগত বুনো শূয়োর আর শজারুর জন্যে। তারপর নাজিম মিঞার ক্ষেতে সেই সব জানোয়ার ফসল খেতে এলে তাদের গুলি-দেগে মেরে (পটকে দিয়ে) বাড়ি ফিরে আসতেন নাজিম সাহেব।

তাঁর বিবির শিকার অপছন্দ ছিল কিন্তু শিকারের মাংস তাঁর হাতে যেমন রান্না হত তেমনটি আর কোথাও খাইনি। আমার মাও অবশ্য চিতল হরিণ এবং সম্বর দারুণ রান্না করতেন। তোমরা অনেকেই হয়ত জান না, ডেনিসন যে শুধু স্বাদু তাই নয়, নানারকম আচারও বানান হয় তা দিয়ে। হরিণের, সম্বরের, সজারুর, কোটরার মাংসের আচার বানিয়ে বিহার ও উত্তর-প্রদেশের শিকারিরা বহুদিন রাখেন এবং রসিয়ে খান।

নাজিম মিঞার ক্ষেতে যখন ফসল ওঠার সময় হত তখন বাজার থেকে বস্তা বস্তা কুলথী, অড়হড়, বেগুন, গেঁহু ও বজরা কিনে নিয়ে গিয়ে ধপাস করে বিবির পায়ের কাছে ফেলতেন নাজিম সাহেব। বিবিও খুশি; তিনিও খুশি। এত কষ্টের এবং এত বেশি পরিমাণের নানা ফসল ও শাক-সব্জী বাঁচাবার জন্যে যে শিকার নাজিম সাহেব করতেন তাঁর দোষ অচিরেই ক্ষমা করে দিতেন তাঁর বিবি।

এই কোসমাতে নাজিম সাহেবের কয়েকজন অনুচর ছিল। তারা পরে আমাদেরও অনুচর হয়ে গেছিল এবং এখন গোপালের। গোপাল এখন কোসমার আনক্রাউণ্ড কিং। কথাটা আক্ষরিকভাবে সত্যি। বহু বছর বাদে বাদে এখন হাজারী-বাগে যাই। কিন্তু একদিনের জন্যে গেলেও কোসমা যেতেই হয় একবার। যাওয়া-আসার সময় গ্রামের সব লোক জড় হয়ে 'গোপালবাবুকা জয়' বলে ধ্বনি দেয়। গোপালও যেমন কোসমাকে ওর হৃদয়ের এবং মানিব্যাগের অনেকখানিই উজাড় করে দিয়েছে, কোসমার মানুষও দিয়েছে তাকে

তাদের সরল অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং আনুগত্য।

কুড়ি বছর আগেও কোসমার মানুষের উপর গোপালের এতই জোর ছিল যে, প্রভাত এবং তার পুরো দলবলকে গোপাল একবার ভোর পাঁচটা থেকে বেলা দশটা অবধি ঠায় বসিয়ে রেখেছিল গাছতলাতে। কোসমা গ্রামের একজন লোকও বীটিং শুরু করতে রাজি হয়নি গোপাল না যাওয়া পর্যন্ত। আর আজকে ত কথাই নেই।

কোসমা গ্রামে নাজিম সাহেবের প্রধান অনুচর ছিল 'কাড়ুয়া'। কাড়ুয়াকে নিয়ে আমি অনেক এবং অনেক জায়গায় লিখেছি। কাড়ুয়ার মত সরল, মহান, গরীব, অনুগত, কৃতজ্ঞ এবং ভাল ভারতীয় শিকারি খুবই কম দেখেছি। ওর মত ভাল ট্র্যাকারও খুব কম দেখেছি বিহারে। অবশ্য সারাণ্ডার জঙ্গলের, বড়জামদার বিখ্যাত/কুখ্যাত শিকারি বিষ্টু দত্তর ট্র্যাকার ঝাণ্ডুকাও খুব ভাল ট্র্যাকার।

কাড়ুয়ার ভাই আসোয়া। এ ছাড়া ছিল পুনোয়া, নাগেশ্বরোয়া এবং আরও অনেকে। কাড়ুয়া এখন বুড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতার কোন ঘাটতি ঘটেনি। ছ আঙুল টিকি এবং ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসিটি ঠিকই আছে। কাড়ুয়ার ছেলে রত্না তখন দু বছরের ছিল। এখন তার ছেলের বয়স পাঁচ, সুব্রত তাকে গোমীয়ার এক্সপ্লসিভ কারখানাতে ভাল চাকরি করে দিয়েছে।

এই কাড়ুয়া-আসোয়ারাই আসল ভারতবর্ষ। খাঁটি, বঞ্চিত, অবহেলিত; যুগের পর যুগ। এত বছর দেশ স্বাধীন হল, এদের বিশেষ কিছু উন্নতি হল না। একজন গোপাল সেন বা লক্ষ গোপাল সেনের পক্ষে কতটুকু করা সম্ভব। যতটুকু পেরেছে, তা ও করেছে। কোসমা ছাড়া গোপালের জীবনে আর কোন বিলাসিতা ও শখ নেই। হাজারীবাগ ছাড়া অন্য কোন ভালবাসা নেই। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গত পঁচিশ বছরে ও একা কিংবা সপরিবারে কোন ভাল জায়গাতেই বেড়াতে যায়নি এক হাজারীবাগ-কোসমা ছাড়া। আশা করব, হাজারীবাগ ও কোসমার মানুষ গোপালের এই ভালবাসার স্বীকৃতি দেবে। এও একরকমের দেশ-প্রেম। এবং আমার ব্যক্তিগত মতে খুবই উঁচু ধরনের প্রেম।

হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্ক, বলতে গেলে, আমাদের চোখের সামনেই হল। রাজডেরোয়া। ঐ পার্কের সঙ্গে এবং ওখানের বিভিন্ন টাওয়ারের সঙ্গেও আমাদের কম স্মৃতি জড়িত নেই। কত বন্ধুবান্ধব, ছাত্রাবস্থার কত নির্ভাবনার মজা, আনন্দ, হাসি। সেইসব বন্ধুদের সঙ্গে আজকে আর দেখাও হয় না। কেউ কেউ ভারতবর্ষে নেই। কেউ হঠাৎ চলে গেছে সুখের শিকার-ভূমিতে, নোটিশ না দিয়ে; প্রভাতেরই মত। তবু পেছন ফিরে চাইলে হাজারীবাগের প্রতি যে এক গভীর মমতা ও ভালবাসা বোধ করি, তা খুব কম জায়গার জন্যেই করি। নাজিমসাহেব সবসময় বলতেন 'ওয়ার্লডকা সব্‌সে বেহেতরীন জাগা'। যদিও নাজিমসাহেবের ওয়ার্লড ছিল হাজারীবাগ-রাঁচী-বোকারো-গোমীয়া-পাটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুইটজারল্যাণ্ডে বসে তাই নাজিমসাহেবকে এক চিঠি লিখেছিলাম। তাতে লিখেছিলাম যে, 'পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দর জায়গায় বসে আপনাকে শুধু এ কথা জানাবার জন্যেই লিখছি যে, সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়েও হাজারীবাগ অনেক বেশি সুন্দর জায়গা।' সেই চিঠি পেয়ে বুড়োর কি খুশি। কত লোককে যে সে চিঠি দেখিয়েছেন নাজিম সাহেব!

(চলবে)

সন্ধানী প্রতিযোগিতা

এই সংখ্যার শব্দ-সন্ধানের সমস্ত উত্তরই ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের ভেতর। অতএব শব্দছক পূরণ করার আগে হাতের কাছে ভৌতবিজ্ঞান বইটা নিয়ে নাও। তবে চেষ্টা রেখ বই না খুলেই উত্তরগুলো মেলাবার। এই শব্দ-সন্ধান তৈরি করেছেন জগদীশ চৌধুরী।

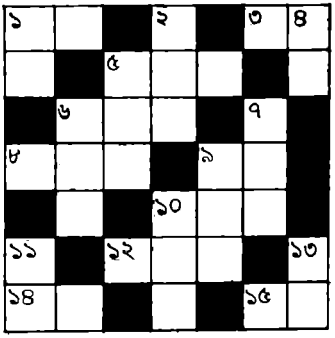

সূত্র ঃ পাশাপাশি

১. রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য অথবা উত্তাপের জন্য যেখানে আগুন জ্বালান হয়।

৩. সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর সরণের পরিবর্তনের হার।

৫. উল্টো করে পড়, পাবে—গাঢ়তা, গুরুত্ববোধক প্রচলিত বাঙলা শব্দ।

৬. যে পদার্থ অন্যকে জারিত করে।

৮. এক নির্দিষ্ট দিকে বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করে।

৯. সময়ের সঙ্গে বস্তুর পথদৈর্ঘ্য পরিবর্তনের হার।

১০. যা বস্তুকে আমাদের চোখে দৃশ্যমান করে।

১২. তড়িৎ আধানযুক্ত পরমাণু বা মূলক।

১৪. প্রবহমান আলোকধারার একটিকে বলে।

১৫. পদার্থের মধ্যকার অণুগুলোয় গতিশক্তির ওপর নির্ভরশীল শক্তির এক রূপ।

সূত্র ঃ ওপর-নিচ

১. একটি ক্ষারক (basic oxide)

২. যে বস্তু শব্দ উৎপাদন করে।

৪. একটি বুলেট যখন উৎক্ষিপ্ত হয়, তখন তার মধ্যে শক্তি হিসাবে যা প্রকাশিত হয়।

৫. ক্রমবর্ধমান বেগের পরিবর্তনের হার।

৬. কোন যৌগে বা মৌলে অক্সিজেন যুক্ত করা।

৭ বস্তুর অস্বাভাবিক অবস্থান হেতু তার কার্য করার সামর্থ্য নির্দেশক শক্তি।

১০. আলোর উৎকৃষ্ট প্রতিফলক।

১১. পদার্থের পরিমাণ বোধক, বস্তুপুঞ্জ নির্দেশক শব্দ।

১৩. যার প্রভাবে তরলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে।

গত ১৬ জুন সংখ্যায় শব্দ ছকটি অসম্পূর্ণ থাকার ফলে এ সংখ্যায় কোন উত্তর বা উত্তরদাতার নাম প্রকাশ করা গেল না।

এবারে বিশ্ব কাপ ফুটবলে

বার্সেলোনা থেকে অতুল মুখার্জি

বিশ্বে খেলাধূলার অন্ত নেই। কত রকমের বিচিত্র সব খেলা। কিন্তু সে সব খেলাই বিশ্বের সর্বত্র সমান জনপ্রিয়, তা নয়। কোন খেলা পৃথিবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ? এমন একটা প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বোধহয় বলবে : ফুটবল। যদিও পরিসংখ্যান বলে সবচেয়ে বেশী লোক যে খেলাটি খেলে তা হল ভলিবল। তবুও এ কথা ত মানতেই হবে—ভলিবলের জনপ্রিয়তা ফুটবলকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এই জনপ্রিয়তম ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর বিশ্ব কাপ ফুটবল। প্রতি চার বছর অন্তর এই ফুটবলের মহাযজ্ঞ।

এ বছর, অর্থাৎ ১৯৮২-র বিশ্ব কাপ ফুটবলের আয়োজনকারী দেশ ছিল স্পেন। এ কথা কারও অজানা নয়। এবারের বিশ্ব কাপ জয়ী দেশের নামও এতদিনে সকলের জানা হয়ে গেছে। ২৪টি দেশ এবারের বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনাল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এই ২৪টি দেশকে ৬টি গ্রুপে ভাগ করে প্রথম পর্যায়ে খেলান হয় লিগ প্রথায়। প্রতি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সকে নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা বা কোয়ার্টার ফাইনাল লিগ। সেখানে চারটি গ্রুপ। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল সেমিফাইনালে খেলেছে। স্বভাবতই সেমিফাইনালের বিজয়ী দুটি দলই খেলেছে ফাইনালে। যেমন খেলল ইতালি

বিশ্ব কাপ জয়ী ইতালি

ও পশ্চিম জার্মানি। এই ফাইনাল খেলাটির আগে পর্যন্ত ম্যাচ হয়েছে ৫০টি, (তৃতীয়-চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের ম্যাচটি ছাড়া)। স্বভাবতই এতগুলি ম্যাচ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। কেবল আলোচনা করা যেতে পারে '৮২-র বিশ্ব কাপের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রথমেই মনে আসে ব্রাজিলের কথা। কেবল আমাদের কাছে নয়, সম্ভবত সারা বিশ্বের ফুটবল প্রেমীদের কাছে এবারের 'ফেবারিট' দল ছিল ব্রাজিল। এমন কি তার প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিও ব্রাজিলের সাফল্য নিয়ে নেতিবাচক কিছু ভাবতে পারেনি। বিশ্বকাপে ব্রাজিলের রয়েছে নানা রেকর্ড। যার অন্যতম সেই ১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্ব কাপ থেকে ১৯৮২ সালের দ্বাদশ বিশ্ব কাপের সব কটি প্রতিযোগিতার মূল পর্যায়ে ব্রাজিল খেলেছে। এবং যার মধ্যে তিনবার সরাসরি যোগ্যতা নির্ণায়ক কোন ম্যাচ না খেলেই, কারণ বিশ্ব কাপের নিয়মানুযায়ী যে দল চ্যাম্পিয়ন হয়, তারা পরবর্তী প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্যায়ে সরাসরি খেলতে পারে। ব্রাজিলই একমাত্র দল যারা তিনবার বিশ্ব কাপ জয় করেছে এবং সেই সুবাদে বিশ্ব কাপ ফুটবলের পুরস্কার সোনার জুলে রিমে কাপটি চিরদিনের জন্য নিজেদের করে পেয়েছে। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ব্রাজিলই ছিল একমাত্র দেশ যারা তিনবার এই সম্মান পেয়েছে। তবে ব্রাজিল জুলে রিমে নিজের করে যে নজির সৃষ্টি করেছে তা আর কেউ কোনদিন করতে পারবে না কারণ চিরতরে পাবার নিয়মটি বর্তমানের পুরস্কার ফিফা বিশ্ব কাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ইতালির পাওলো রসি

এবার ব্রাজিল তাদের প্রথম ম্যাচে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ২-১, দ্বিতীয় খেলায় স্কটল্যাণ্ডকে ৪-১ এবং তৃতীয় খেলায় নিউ জিল্যাণ্ডকে ৪-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে যায়। ব্রাজিলের গ্রুপে ছিল গতবারের বিশ্ব কাপ জয়ী আর্জেন্টিনা এবং ইতালি। আর্জেন্টিনাকে ব্রাজিল ৩-১ গোলে হারালেও, ২-৩ গোলে হেরে গেল ইতালির কাছে এই হারকে বলা হয়েছে এবারের বিশ্ব কাপে সবচেয়ে অভাবনীয় ঘটনা। ব্রাজিল প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলার পেলে

বলেছেন 'এটা সত্যি ! বিশ্বাস করতে মন চায় না'। বস্তুতপক্ষে এবারের বিশ্ব কাপে ব্রাজিল দলকে বলা হয়েছে সব থেকে সেরা দল।

অঘটন ঘটেছে আরও কিছু। উদ্বোধনী ম্যাচেই গতবারের বিজয়ী আর্জেন্টিনা হেরে যায় বেলজিয়ামের কাছে। এই সূত্রে তাদের ভ্যান ডেন বার্গ প্রথম খেলোয়াড় যিনি দ্বাদশ বিশ্বকাপের প্রথম গোলটি করেন। ১৯৭৮-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার দ্বিতীয়-হার কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালির কাছে ১-২ গোলে, তৃতীয় হার ওই পর্যায়েই ব্রাজিলের কাছে (১-৩)। অগত্যা ব্রাজিলের মত আর্জেন্টিনাকেও বিদায় নিতে হয়। সেমিফাইনালে যায়—দুই জায়ান্ট কিলার ইতালি। ইতালি প্রাথমিক লিগ পর্যায়ে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলা ড্র (০-০), পেরুর সঙ্গে 'ড্র' (১-১) এবং ক্যামেরুনের সঙ্গেও ড্র (১-১) করে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনালে তারা হারায় পোল্যাণ্ডকে ২-০ গোলে।

অন্য ফাইনালিস্ট পশ্চিম জার্মানি ও তাদের প্রথম ম্যাচে হেরে যায় আলজেরিয়ার কাছে ২-১, দ্বিতীয় খেলায় চিলিকে হারায় ৪-১ এবং তৃতীয় খেলা অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছয়। কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় তারা ইংল্যাণ্ডকে (০-০) হারাতে পারেনি। কিন্তু পরের খেলায় স্পেনকে (২-১) হারিয়ে সেমিফাইনালে যায়। সেমিফাইনালের খেলায় পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের খেলা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্সের খেলা প্রথম ৯০ মিনিট রইল অমীমাংসিত। অগত্যা আরও ৩০ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলা। ফ্রান্স দুটি গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। পশ্চিম জার্মানির যখন নিশ্চিন্ত হার তখন তারা মাঠে নামাল তাদের আহত অধিনায়ক রুমেনিগাকে। সমস্ত খেলার গতি বদলে দিয়ে তিনি নিজে একটি গোল করলেন, আরও একটি গোল করালেন অর্থাৎ ৩-৩। এই অবস্থায় খেলা শেষ। অতএব টাই-ব্রেকার। দু'দলই পাঁচটি সুযোগের মধ্যে চারটি কাজে লাগাল। অর্থাৎ ৭-৭। তারপর সাডেন ডেথ। যে দল আগে পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারবে সেই-ই জয়ী। ফ্রান্স টসে জেতার জন্য প্রথমে শট নেবার যোগ্যতা পেল কিন্তু পশ্চিম জার্মানির গোলকিপার তা আটকে দিলেন, সুতরাং সুযোগ পেল পশ্চিম জার্মানি এবং গোল অর্থাৎ ফ্রান্সকে হারাল পশ্চিম জার্মানি ৮-৭ গোলে।

★

এই প্রথম বিশ্বকাপের ইতিহাসে ২৪টি দল চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেল। দেশগুলি—ইতালি, পেরু, পোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুন (১ নম্বর গ্রুপ)। আলজেরিয়া, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও চিলি (২ নম্বর গ্রুপ)। বেলজিয়াম, আর্জেন্টিনা, হাঙ্গেরি ও এল সালভাদর, (৩ নম্বর গ্রুপ) ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, কুয়েত ও চেকোশ্লোভাকিয়া (৪ নম্বর গ্রুপ) স্পেন, হণ্ডুরাস, যুগোশ্লাভিয়া ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড (৫ নম্বর গ্রুপ) এবং ব্রাজিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন, স্কটল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ড।

সাম্প্রতিক সংবাদ

মাধ্যমিকের প্রথম একুশ

মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে কিছুদিন আগে। প্রথম একুশজনের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। এবারে তৃতীয়, সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ এবং ঊনবিংশ স্থানে নাম রয়েছে একাধিক। যার ফলে প্রথম কুড়িজনের তালিকায় শেষ অবধি দেখা গেল একুশজনের নাম। এরা সবাই নিশ্চয়ই আমাদের সকলের অভিনন্দনযোগ্য। এখানে আমরা একুশজনের নামই দিলাম।

১. মনোজকুমার পিল্লাই ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর (৭৯৮)
২. শঙ্কু মল্লিক ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া (৭৯৬)
৩. অঞ্জনা সেন ঃ শ্রীরামপুর গার্লস হাই স্কুল (৭৯৫)
রুক্মিণী মিত্র ঃ গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল (৭৯৫)
দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ঃ সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল (৭৯৫)
৬. পুষণ ভরদ্বাজ ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া (৭৯৪)
৭. অভিজিৎ নাথ ঃ 'এ' জোন বয়েজ স্কুল, দুর্গাপুর (৭৮৯)
বিমানকান্তি রায় ঃ রসুলপুর বি এম হাই স্কুল (৭৮৯)
৯. রাজর্ষি সেনগুপ্ত ঃ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল (৭৮৭)
দেবাশিস ঘোষ ঃ সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল (৭৮৭)
১১. দেবাশিস চক্রবর্তী ঃ বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল (৭৮৬)
১২. দিব্যেন্দু দে ঃ নারায়ণ দাস বাঙ্গুর মেমোরিয়াল স্কুল (৭৮৪)
১৩. নিলয় আচার্য ঃ বেলঘরিয়া হাই স্কুল (৭৮২)
দীপাঞ্জন জানা ঃ কল্যাণী ইউ ই হাই স্কুল (৭৮২)
কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর (৭৮২)
জয়দীপ চন্দ্র ঃ ঝাড়গ্রাম কুমুদকুমারী ইনসটিটিউশন (৭৮২)
১৭. অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় ঃ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল (৭৮০)
দেবাশিস সেন ঃ হেয়ার স্কুল (৭৮০)
১৯. অনুপ মুখোপাধ্যায় ঃ বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল (৭৭৮)
অনুতোষ মৈত্র ঃ নিউ আলিপুর মালটিপারপাস স্কুল (৭৭৮)
কৌশিক মল্লিক ঃ সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল (৭৭৮)

বিধানচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী

গত ১ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত হল। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শহর-গ্রামের মানুষের কাছে এই দিনটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। স্বাধীনতার পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গকে স্বনির্ভর এবং সুন্দর করে গড়ে তোলবার এক উজ্জ্বল আদর্শ বুকে নিয়ে তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি। তারপর একনাগাড়ে সাড়ে তের বছরের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গে অনেক শিল্পপত্তন করে গেছেন, তেমনি গ্রামসমাজের সাম্প্রতিক চেহারার উন্নতি করবারও তিনি চেষ্টা করেছেন। তাই আজকের পশ্চিমবঙ্গের শহর-গ্রাম যে দিকেই তাকাই না কেন, সর্বক্ষেত্রেই তাঁর কল্যাণ-হস্তের কোন না কোন স্পর্শ আমরা পাই।

আজকের দুর্গাপুরের যে ঝকঝকে চেহারা আমরা দেখছি, আগের দুর্গাপুরের সঙ্গে তার আকাশপাতাল তফাৎ। সেখানে তখন ছিল গভীর বন, ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়েদের উৎপাত। বিধানচন্দ্রের পরিকল্পনা এবং উদ্যোগেই বন কেটে বসত হল ; গড়ে উঠল এই বিশাল শিল্পনগরী —রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তর শিল্পাঞ্চল।

বিধান শিশু উদ্যান ঃ পুরস্কারবিতরণী

গত ১ জুলাই নগরীর মধ্যের বিশাল প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করার মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হল। এমনিই নানান অনুষ্ঠান হল, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানায়, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পে। ঐদিন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যশাখার সহায়তায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির খোলা হয়েছিল। আনন্দের কথা, সেইদিন কুড়িজন স্থানীয় যুবক এই শিবিরে রক্তদান করেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিধানচন্দ্রের দরদ ছিল অপরিসীম। তা না হলে ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার যখন ডাঃ রায়কে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন, তিনি তা সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেন। নিজের চোখের রোগের চিকিৎসা করাতে বিধানচন্দ্র তখন আমেরিকায় গিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হল। তিনি সেই বছরই ফিরে এলেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি নির্বাচিত হলেন আইনসভার সদস্য এবং তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিলেন। তারপর একের পর এক প্রকল্প তিনি হাতে নিলেন এবং সেগুলোর রূপায়ণের জন্য সচেষ্ট হলেন। দূর করলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ম্যালেরিয়া। আরাপাঁচ অঞ্চল থেকে বদ্ধজল নিকাশ করে তিনি এক বিস্তীর্ণ এলাকা চাষবাসের উপযোগী করে তুললেন। খরা আর বন্যা এ রাজ্যের একটি নিয়মিত সমস্যা। কৃষিকে রক্ষা করবার জন্য এই সময়ে ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী সেচ ব্যবস্থার সূচনা হয়। আর তারই জন্য তৈরি হল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। এর সূত্র ধরে গড়ে উঠল

বিদ্যুৎ প্রকল্প। বিধানচন্দ্রের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থাপন করলেন দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল, ম্যাসাঞ্জোর, জলঢাকায় তাপ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা। শহর-তলীতে বৈদ্যুতিক রেল, রাজ্য পরিবহণ, কল্যাণী ও কলকাতার লবণ হ্রদে উপনগরী গড়ে তোলার উদ্যোগও তাঁরই।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিধানচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানেই যে সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টা তিনি করেছিলেন এবং জনসাধারণের চাহিদা ঠিক কী কী, তা তিনি ধরতে পেরেছিলেন।

তাই জন্মশতবর্ষের লগ্নে দাঁড়িয়ে তাঁর স্মরণে ডাক ও তার বিভাগ প্রকাশ করলেন

পঞ্চাশ পয়সা দামের একটি মনোরম ডাকটিকিট। বিধানচন্দ্রের জন্ম তারিখেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য অল্পদিনের মধ্যে তৈরি হয় ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি। এ'দের উদ্যোগে এই কুড়ি বছরে তৈরি হয়েছে কলকাতার নারকেলডাঙায় একটি শিশু হাসপাতাল ও লবণ হ্রদের মুখে (এখন এই অঞ্চলের নাম বিধান নগর) একটি শিশু উদ্যান। এই বিধান শিশু উদ্যান বর্তমানে কলকাতার একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ভেতরে আছে খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, মঞ্চ, সাঁতার কাটবার বিরাট পুকুর, আর দেশ-বিদেশের নানান জাতের গাছপালা। বর্তমানে এর সদস্য চার হাজারের মত। শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এরা সবাই বিপুল উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করে। ১ জুলাই সকালে এরা সবাই প্রভাতফেরিতে বেরোয়। আর বিকালে বিধান শিশু উদ্যানে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিধানচন্দ্রের জীবনী সম্বলিত একখানি পুস্তিকাও এই উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর ভেঙ্কটরমণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ রাজ্যের রাজ্যপাল ভৈরবদত্ত পাণ্ডে। এছাড়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী বরকত গণিখান চৌধুরী, রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য এই সভায় বক্তৃতা দেন। অনুষ্ঠানে কয়েকজন বাছাই করা কিশোর-কিশোরীকে বিভিন্ন বৃত্তি ও পদক দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি, শতবার্ষিকী স্মারক বৃত্তি হিসাবে বিশেষভাবে এই বছরেই দেওয়া হচ্ছে। মাসিক ৫০ টাকা করে একবছর ধরে বৃত্তি পাবে মনোজ পিল্লাই (মাধ্যমিকে প্রথম), রুক্মিনী মিত্র ও অঞ্জনা সেন (মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম)। এছাড়া প্রতিবন্ধী বৈদ্যনাথ ধর ৭৫ টাকা এবং ডাক্তারির ছাত্র মানব নন্দী ২০০ টাকার বৃত্তি লাভ করেছে। এছাড়া খেলাধূলা, যোগব্যায়াম ইত্যাদি নানান বিষয়ে মোট ২৫টি বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

বিধানচন্দ্র তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে চেয়েছিলেন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সমান সুযোগ পায়। চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের নাগরিকের মন যাতে সর্বদিক দিয়ে সুগঠিত হয়। তা না হলে এই রুগ্ন পশ্চিমবঙ্গকে কোনদিনই গড়ে তোলা যাবে না। তাই তাঁর স্মৃতিরক্ষা কমিটি শিশু ও কিশোরের স্বাস্থ্য আর মনকে সুদৃঢ় করে গড়বার জন্য এমনি নানান পরিকল্পনা নিয়েছেন।

ছবি : রাজীব বসু

এবং জবাব

ইন্দ্রাণী বিশ্বাস। বিদ্যানগর। বর্ধমান।

● তৃতীয় সংখ্যার ৮৪ পৃষ্ঠার 'শক্তির রূপান্তর' কেন বুঝলে না? ওখানে বোঝান হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা ঘটনায় আমরা কেমন কেমন শক্তির রূপান্তর দেখতে পাই। প্রথম ঘটনা হল স্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়ল। কিভাবে ঘণ্টা বাজল? যিনি বাজালেন তিনি পেশীর জোরে আঘাত করলেন। আঘাতটা ঘটল পেশী নামক যন্ত্রের শক্তির রূপান্তরে। অন্যগুলোতেও কি শক্তি কিসে রূপান্তরিত হল —তারই তালিকা।

পিনাকী ভট্টাচার্য। ইছাপুর। ২৪ পরগণা।

● ভাই পিনাকী। কার কি নির্দেশ তোমার প্রয়োজন তা আমরা জানি। সময় মত Head Examiner কেন, স্বয়ং Examination Controller-এর বক্তব্যও তোমাকে জানান হবে। কোন ব্যাপারেই আমরা পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজ করব না। বিশ্বাস কর ভাই, আমাদের এখানে শিক্ষা-গবেষক বহু অভিজ্ঞ মানুষ রয়েছেন—যারা তথাকথিত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত না থেকে সারা জীবন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁরা তিল তিল নিরীক্ষায় একটা শিক্ষণ-ধারা গড়ে তুলতে চাইছেন—যা এদেশে ছিল না। দেখা যাক না, তাঁদের চিন্তা-ভাবনা কতটা ফলপ্রসূ!

ভাস্কর সেনগুপ্ত। চিড়াগোড়া। ধানবাদ।

…আমার মতে এটি পড়াশুনা সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা।…আমি শুনেছিলাম I.C.S.C.এবং মাধ্যমিক পুরোপুরি আলাদা কিন্তু দেখছি যে বাঙলা ইংরাজী ছাড়া প্রায় সব এক। এত ভাল একটি পত্রিকার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন আপনারা জানবেন।

● তোমার আন্তরিক অভিনন্দনের জন্য তোমাকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। যা মঙ্গলজনক তাকে অভিনন্দিত করা আর যা ক্ষতিকারক তাকে ধিক্কার জানাবার শক্তি যেন চিরকাল তোমার মনকে সজীব রাখে।

চন্দন দে, কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

● নবম দশম যদি তোমাকে অনুপ্রাণিত করে সুপথে এনে থাকে, তবে আমরা কামনা করব, তোমার এ সুমতি তোমাকে অনেক বড় করুক। একদিন দেশ ও বিশ্ব ভরে উঠুক চন্দনের সৌরভে।

কাজী মহম্মদ রফিক, রায়না, বর্ধমান

● সতর্কভাবে বানান লক্ষ্য করা আর বারংবার লেখা—এই দুই পদ্ধতিতেই বানান ভুল রোধ ও ভাষা ব্যবহার শুদ্ধ হয়। যে কোন ব্যক্তির যে কোন লেখা, যা তোমার মনে নাড়া দেবে, সেই অংশই বার বার পড়ে কৌশলটা আয়ত্ত করে নেবে।

একটি একাঙ্ক লিখে যদি প্রশংসা পেয়ে থাক, তবে থামবে না। আরও লেখ। আর, যারা প্রশংসা করছেন, তার থেকে

নিন্দুকের বেশি খোঁজ কর। তাঁর নিন্দাটি কতখানি গ্রাহ্য, ওটুকু নিন্দাও রোধ করা যায় কিনা, তা ভাব। শক্তির অপচয় হতে দিও না।

ভাস্কর দেব, কালীবরণ ঘোষ দেব

● সব বিষয়েই অবজেকটিভ প্রশ্ন থাকছে।

সঙ্গীতা চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর-৫

● তুমি 'নবম দশম'-এর সাহায্যে নানা সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছ জেনে আমরা আনন্দিত হলাম। ব্যাকরণের দিক থেকে আত্মা + উৎসর্গ আর আত্ম + উৎসর্গ দু-এরই পরিণতি 'আত্মোৎসর্গ'। কিন্তু আত্মোৎসর্গ শব্দটা যখন ব্যবহার করছি, তখন মূলভাবের দিক থেকে আমরা অর্থটা বুঝে নেব।

জয়দীপ ঘোষ, পাণ্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি

● শুনেছিলাম, কোথাও কোথাও মাস্টারমশাইরা নবম দশমের বিরোধিতা করছেন। তোমার পত্র পেয়ে ভাল লাগল যে তোমার মাস্টারমশাইরা নবম দশমের প্রশংসা করেছেন।

তুমি এক জায়গায় একটি শব্দ ফেলে গেছিলে। পরে V চিহ্ন দিয়ে তলায় লিখেছ। ওটা লিখবার রীতি হল ∧ চিহ্ন দিয়ে ওপরে লেখা। এর পর থেকে ছাড় শব্দ ∧ চিহ্ন দিয়ে ঐ লাইনের ওপরে লিখবে।

সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সরিষা, ২৪-পরগণা

● 'ভারত-বিলাপ' কবিতার যে দুটি পংক্তি তুলে দিয়েছ, তার ব্যাখ্যা নেই কেন বলেছ? প্রথম সংখ্যার ১৮ পৃ. প্রথম স্তম্ভের মাঝামাঝি নজরুলের কবিতাটির উদ্ধৃতির পরেই ঐ পংক্তির ব্যাখ্যা আছে।

তুমি ত জান, জড়তা জড়তাকেই টেনে আনে। স্থিতিজাড্য কাকে বলে জান ত? এ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জীবনের ক্ষেত্রেও সত্য। অবসাদে হতাশ হয়ে বসে থাকলে ক্রমেই অবসাদে তলিয়ে যেতে হয়। ইংরেজ আমলে কবি ভারতীয়দের মধ্যে উদ্যমের অভাব দেখেছেন। এই উদ্যমহীনতা কি শেষ পর্যন্ত জাতিকে রসাতলে (সর্বনাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে) পৌঁছে দেবে?—এটাই কবির প্রশ্ন।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, পুরুলিয়া

● তোমার পারিবারিক উপাধি মুখার্জি নয় মুখোপাধ্যায়। সাহেবরা মুখোপাধ্যায় বলতে পারত না, বলত মুখার্জি। ইংরেজ রাজত্বে সেই বিকৃত উচ্চারণকেই সাহেবীয়ানা ভেবে ব্যবহার করা হত। তাতে কেউ কেউ গর্ববোধও করতেন। স্বাধীন দেশে আজও কি তুমি তোমার উপাধি বিকৃত করে উচ্চারণ করবে?

অশোককুমার চক্রবর্তী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

● তোমার সহানুভূতিপূর্ণ চিঠিটি কর্ম-ব্যস্ত মুহূর্তে এক টুকরো ঝিরঝিরে হাওয়ার মত মধুর লাগল। সকলের জন্যই কিছু করবার আগ্রহ আমাদের, কিন্তু সুযোগ যে সীমিত। আমরা, এবার যারা নবম শ্রেণীতে উঠল, তাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছি। এর পর থেকে সকল নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে থাকব। তোমাদের জন্য আলাদা কিছু করতে পারলাম না ভাই। আগামী বছরের তিন-চারটি সংখ্যায় দশম শ্রেণীর যেটুকু প্রকাশ হবে, পরীক্ষার আগে পর্যন্ত ঐটুকুই তোমাদের যা কাজে লাগবে।

সাজ্জাদ হোসেন, বাঘড়া

● দুঃখ পেয়ো না। উত্তর না পেলে ভাববে তেমন জরুরী ও অত্যাবশ্যক কথা তুমি লিখতে পারনি।

পার্থ দে ও ঝুমা হালদার, রঘুনাথপুর

● তোমাদের ধন্যবাদ ও ভালবাসা গ্রহণ করলাম।

সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, গোপীনাথপুর

● না, আপনার পত্রে কোন ঔদার্য-হীনতা প্রকাশ পায়নি। আমি যথাস্থানে আপনার বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছি। আপনি আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

রজত দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা

● আমি জানি না, 'ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি', 'নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' ইত্যাদি বিষয়ে কে তোমাকে লিখতে বলেছেন। অথচ, আমাদের সিলেবাসে সপ্তম শ্রেণী থেকে রচনা শুরু হয়েছে। ইতঃমধ্যে কতগুলো প্রবন্ধ তুমি লিখেছ? তুমি কি ঐসব কঠিন প্রবন্ধ লিখতে উপযুক্ত হয়েছ?

আমরা একটা পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে ছাত্রছাত্রীদের রচনা লিখতে শেখাচ্ছি। তাতে রচনার ভঙ্গি ও গুরুত্ব অনুসারে প্রয়োজনীয় সব রচনা লিখতে শেখান হবে। স্পষ্টভাবেই বলি, প্রায় বিদ্যালয়েই এ ব্যাপারটি অপরিকল্পিত ভাবেই চলে। মাস্টারমশাই ক্লাসে এসে অপরিকল্পিত ভাবেই বলে ফেললেন, অমুক রচনা লেখ। তাতে অনুশীলন ঠিক মাত্রা-মাফিক চলে না। আমাদের হিসাবে ওসব রচনা দশম শ্রেণীতে উঠলে আসবে। এবং সেটাই যথাযোগ্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ত্রিদিবকুমার জানা, সালগেড়িয়া সিডিউণ্ড একাডেমি মেদিনীপুর

● 'নবম দশম' তোমার মনে প্রেরণা জাগিয়েছে জেনে খুবই খুশী হলাম। তাই বলে স্কুল বর্জন কর না ভাই। যত বেশি দিক থেকে মন সঞ্চয় করতে পারবে, ততই মঙ্গল। সব সময় চেষ্টা করবে যে যা বলছেন তাকেই বিচার করে গ্রহণ করতে। এতে মন বিচারপটু হবে—নানা যুক্তিতে বোঝাই হবে মন। এতে প্রত্যাশার অতীত ভাল ফল পাওয়া যায়।

না ভাই! 'হাট'কে পরিপূর্ণ রূপক কবিতা বলা যায় না। রূপক কবিতার প্রতিটি অংশ উপমান হবে আর উপমানের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে তার মিল থাকবে। হাট কবিতায় হাটের সঙ্গে পৃথিবীর জীবন-রীতির একটা অস্পষ্ট মিল আছে মাত্র। এটুকু কারণেই একে রূপক কবিতা বলা যায় না। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত কবিতার শেষাংশেরও রূপক ব্যাখ্যা মানতে চান না।

জয়দীপ মিত্র, গড়িয়াহাট

● এই দুষ্টু ছেলেটা! তোমার কি প্রতি সংখ্যা হাতে পেলেই একটা করে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে! দেখছি তোমার জন্যই এবং জবাবের পাতাটা তুলে দিতে হবে। এই হয়, দেখ বাপু, এই নিয়ে আবার চিঠি লিখে বস না।

'পুনরনুশীলন' সংখ্যা নিয়ে মনে মনে নানা সংশয় ছিল। তোমার পত্র তা দূর করল। নাটক কেন বন্ধ হল, তা নিশ্চয় দ্বাদশ সংখ্যার সম্পাদকীয় পড়ে বুঝেছ।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন: ২৪-৫৫২০), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ (ফোন: ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১), থেকে প্রকাশিত।

খেলার আসর

স্পেনের বিভিন্ন শহর থেকে বিশ্ব কাপ ফুটবলের খবর ও ছবি শুধু নয়, কিংবা ইংল্যাণ্ড থেকে টেস্ট ক্রিকেট বা উইম্বলডন টেনিসের রিপোর্ট নয়—সারা ভারতের সব খেলার রিপোর্ট, ছবি প্রভৃতি থাকে সব চাইতে বেশি

খেলার আসর-এ

কলকাতার ফুটবলের খবর ? তাও খেলার আসরই সবার উপরে।

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২

NABAM DASAM 16 July 1982 Registration No. 37807/82 WB/CC 164 Rs. 5·00

ইত্যাদি প্রকাশনীর আরো তিনটি অসাধারণ পত্রিকা